মডেল কাকা

বা

বসন্ত-কুমারী।

বঙ্গীয়

গার্হস্থ্য উপন্যাস।

অজ্ঞান অবোধ নর জ্ঞান কোথা পাই।
ভেলায় সমুদ্র পার অভিলাষী তাই।

কলিকাতা।

১৬৩ নং কালীঘাট রোড, ভবানীপুর

পার্থিব যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৩০০ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

কালীবাবু—

"সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস ও অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ" ইহা জগতে চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ। এ প্রবাদ মিথ্যা হইলে আমি মডেল কাকার চরিত্র জনসমাজে চিত্রিত করিতে কখনই সক্ষম হইতাম না। আমার এই প্রথম উদ্যম তোমার তাদৃশ আন্তরিক উৎসাহ ও ঐকান্তিক যত্নের উজ্জ্বল আদর্শ, তোমার সৎসঙ্গের একমাত্র সুখময় ফল। সাধারণের নিকট সাদরে সম্ভাষিত হইবে এই আশায় মডেল কাকা সোৎসাহে ও সাগ্রহে তোমার করকমলে অর্পিত হইল। কিমধিকমিতি

তোমার চিরসঙ্গী

শ্রী—

মডেল কাকা

বা

বসন্ত কুমারী।

প্রথম খাপ।

মুখুয্যে বাড়ী।

শরৎকাল। বেলা প্রায় ১০ টা বাজিয়াছে। রৌদ্র ক্রমেই প্রখর হইতেছে, মধ্যে মধ্যে মেঘের ডাক শুনা যাইতেছে, কিন্তু মেঘ দেখা যাইতেছে না। আধঘণ্টার মধ্যে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইল, ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। দুই চারি ফোঁটা বৃষ্টিও হইয়া গেল। আবার রৌদ্র হইল। কে বলিবে যে কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দু চারি ফোঁটা বৃষ্টির পর বৃক্ষলতাদি সকলেই নিস্তব্ধ, কোথায়ও একটী শব্দমাত্র শুনা যাইতেছে না। আর পূর্ব্বের ন্যায় মেঘের হুড়্‌হুড়্ গুড়্‌গুড়্ শব্দে কর্ণে তালি লাগিতেছে না। প্রকৃতি নিরবচ্ছিন্ন কোলাহল শূন্যা হইয়াছে। কিন্তু কল্যাণপুরের মুখুয্যেবাড়ী এখনও কোলাহল শূন্য হয় নাই। কোথাও স্ত্রীলোকের কোলাহল, কোথাও

পুরুষের কোলাহল, কোথাও বাজনার শব্দ, কোথাও পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের মধুর শব্দ, এইরূপ নানাবিধ শব্দে মুখুয্যে-বাড়ী আজ কোলাহলে পরিপূর্ণ। সকলেই একটা না একটা কাজে ব্যস্ত। মহা সমারোহ ব্যাপার। চাকরেরা কেহ কেহ বাজারে ছুটিতেছে, কেহ কেহ গৃহাদি পরিষ্কার করিতেছে, কেহবা হুঁকা বৈঠক মাজিয়া বৈঠকখানার সজ্জা করিতেই সমস্ত দিন কাটাইতেছে। দাসীরা কেহবা ঘাটে মাছ ধুইতেছে, আর ঘাট হইতেই তাহাদের নাতি কি নাৎনীর কি পুত্র কিম্বা কন্যার জন্য পরদিনের সঞ্চয় করিতেছে। কেহবা মাছ কুটিতেছে, কেহবা বাট্‌না বাটিতেছে, কেহবা কুট্‌না কুটিতেছে। পুরনারীগণ কেহ ভাঁড়ারি হইয়াছে, কেহ পাতা কাটিতেছে, কেহবা বালক বালিকাদের কিছু জলযোগ করাইয়া তাহাদের ক্ষুধার শান্তি করিতেছে। বাড়ীর গিন্নী অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া একবার এঘর একবার ও ঘর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কেহ চাকরের সহিত বাজারে গিয়াছে, কেহ পাড়ায় নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছে, কেহবা সকলের কার্য্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। বাড়ীর প্রাচীনা যাহারা তাহারা কেবল কার্য্যের ব্যবস্থা প্রদান করিতেছে। পাড়ার প্রাচীনা দু চারিজন রন্ধনশালায় রন্ধন কার্য্যে আপনাদের কার্য্যদক্ষতা দেখাইতেছে আর মাঝে মাঝে ধোঁয়াতে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে কখন অগ্নিদেবের উপর কখন বা বাড়ীর কর্ত্তার উপর নানাপ্রকার গালি বর্ষণ করিতেছে। এইরূপ চারিদিকে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ সকলেই আপন আপন কার্য্য অনু-

সারে মুখুয্যেবাড়ী সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। এই উভয় দলের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। কোন পাড়ায় একটী সমারোহ হইলে সে দিন আর সে পাড়ায় স্ত্রীলোক খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কাজ কর্ম্মের বাড়ীতে যেমন কাক-চিল দিগকে না ডাকিলেও তাহারা আপনারা যে যেখানে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া বাড়ীর চারি দিকে উড়িয়া বেড়ায় সেইরূপ পাড়ার স্ত্রীলোক দিগকেও কাজ কর্ম্মের বাড়ীতে ডাকিতে হয় না তাহারা আপনারাই আসিয়া জুটিয়া যায়। কাহারও সহিত যদি কখন কোনও সম্পর্ক না থাকে সে দিন পরস্পর একটা না একটা সম্পর্ক যেন কোথা হইতে আসিয়া পড়ে। আজ কল্যাণপুরে হরলাল মুখুয্যের বাড়ী পাড়ার প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই শুভাগমন হইয়াছে। আজ আর কল্যাণপুরের বামনপাড়া, কি কায়স্থপাড়া, কি কাওরাপাড়া কোথাও আর একটী স্ত্রীলোক নাই। পাঠক মহাশয়! যদি আজ কোন স্ত্রীলোকের সহিত আপনার দেখা করিবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে তবে আপনাকেও আজ একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া কল্যাণপুরে হরলাল মুখুয্যের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিতে হইবে। যত স্ত্রীলোক আসিয়াছে তাহাদের সকলেই কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্তা আছে। পাঠক মহাশয়! আপনি কি দুইজন স্ত্রীলোককে কখন এক স্থানে একত্রে নীরবে থাকিতে দেখিয়াছেন? তাহা যদি না দেখিয়া থাকেন তবে মুখুয্যেদের সমারোহ বাটীতে এক স্থানে পঁচিশ ত্রিশজন স্ত্রীলোকের মধ্যে কোন্ কার্য্য বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

সুতরাং আমি এখানে উপন্যাসের প্রথমেই মুখবন্ধ লিখিতে পারিলাম না, তজ্জন্য পাঠক মহাশয় আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

সমারোহ বাটীতে কখন একস্থানে সমুদয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। যেখানে মাছ কোটা হইতেছে সেখানে চারি পাঁচ জনে মাছই কুটিতেছে, যেখানে বাট্না বাটা হইতেছে সেখানে চারি পাঁচ জনে বাট্নাই বাটিতেছে, যেখানে কুট্না কোটা চলিতেছে সেখানে চারি পাঁচ জনে কুট্নাই কুটিতেছে। কিন্তু মাছ কোটা, কুট্না কোটা, বাট্না বাটা, পাতা কাটা, পান সাজা, মুখুয্যে বাড়ীর এ সমুদয় কার্য্য প্রায় এক স্থানেই হইতেছিল, পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে অধিক দূরে ছিল না। কার্য্য যত হউক আর না হউক সমালোচনা বিলক্ষণ চলিতেছিল। পুরুষেরা এ বিষয়ে বড়ই অমনোযোগী ছিল, তাহারা বাহিরের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত। সমালোচ্য বিষয় পাড়ার বাঁড়ুয্যে পরিবার। সমালোচনা এইরূপ হইতেছিল :—

একজন কুট্না কুটিতে কুটিতেই বলিল "বাঁড়ুযোদের ছোট বউ হাজার হ'ক ছেলে মানুষ, কিন্তু ভাই কাজ কর্ম্মে খুব পাকা। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে ছোট বউএর গতর ঠিক্ যেন ছ্যাক্‌রা গাড়ীর ঘোড়া। রাত্তির দিন খাট্‌ছিই খাট্‌ছিই, কামাই আর নেই।"

আর একজন বাট্না বাটিতে বাটিতে অমনি বলিল "শুধু গতর হলে ত বাঁচতুম, দেখ্‌তে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। যেমন রূপে, তেমনি গুণে। আহা! কি মুখ, কি নাক, কি চোক,

কি জোড়া ভুরুর গড়ন। তার রূপ দেখলিই যেন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ব'লে কথন কথন ভ্রম হয়।"

আর একজন যে পান সাজিতেছিল সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। পান সাজিতে সাজিতেই বলিল "হ'লে হবে কি বোন্, যা বলো যা কও স্ত্রীর মত সোয়ামী কিন্তু নয় ভাই। সোয়ামীটাকে দেখ্‌লে যেন ছুঁচার গোলাম চামচিকে বলে বোধ হয়। এমন স্ত্রীর এমন সোয়ামী ঠিক যেন চাঁদের আলোর কাছে নক্ষত্রের আলো। যেন দিবাভাগে প্রদীপের আলো। বল্‌লে কি হয় স্ত্রীর সহিত সোয়ামী ঠিক্ মিল খায় নি।"

আর একজন যে পাতা কাটিতে ছিল সে পুরুষের নিন্দা বড় সহ্য করিতে পারিত না, এবার সে পাতা কাটা স্থগিত রাখিয়াই বলিল "তা হ'ক ভাই তবু সে বেটা ছেলে, বেটা ছেলের রূপ নিয়ে কি ধু'যে খাবে? বেটা ছেলে হাজার কুৎসিৎই হ'ক তবু লোকে বলে ওর ছেলেটী যেন কার্ত্তিক।"

যে বাটনা বাটিতেছিল সে আবার বলিল "যা হ'ক ভাই মতিলালের চেয়ে রাম ও কৃষ্ণ দুই ভাই যেন সাক্ষাৎ রাম কৃষ্ণ। অমন ভা'য়ে ভা'য়ে মিল কিন্তু কোথাও দেখি নাই। বলতে গেলে ওদের বাড়ীর তিনটী ভাই যথার্থ সংসারী।"

আর একজন তৎক্ষণাৎ বলিল "শুধু তিনটী ভাই ব'লে নয়, ওদের তিন্ ভাইয়ের তিনটী বউ অত ভাল ব'লে ওদের সংসারে কোন বিষয়ের অনাটন নাই। আমাদের মত বউ কি হ'লে অমন সংসার দু দিনে ছারেখারে যেত।"

আর একজন মাছ ধুইতে যাইতেছিল, সে মাছ ধুইতে যাওয়া বন্ধ রাখিয়াই বলিল "যা বল ভাই বড় বউএর চেয়ে ওদের মেজবউটো আবার কিছু অংখেরে, এত অংখার যে কিসে তাও জানিনে। হ'ক চাক্‌রে ভাতারের মাগ, তাই ব'লে অংখার হয় কিসে গা।"

আর একজন মাছ ধুইয়া সবে আসিয়াছে, ঐ কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি মাছের ঝুড়ি মাটিতে ফেলিয়াই বলিল "যা বল্‌লে ভাই, ওদের মেজবউটো যেন কেমন কেমন এক রকম। আমার মতে ছোট বউটী ওদের সংসারে বউএর্ মত বউ, বউ যাকে বল্‌তে হয়, অমন্ আর হবে না।"

তাহাদের মধ্যে একজন প্রাচীনা বলিল "আমি বড় বউ-টীকে যেন সকলের চেয়ে ভাল দেখি। রূপে যেন ফেটে পড়্‌ছে, এমন কি অমাবস্যার রাত্রিতে দেখিলেও রূপের গুণে তেমন অন্ধকারেও তাহার মুখ দেখা যায়, মুখখানি——

একজন তাহাকে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল "বড়বউ-এর রূপইবা কি এত ভাল। চক্ষু দুটো যেন ড্যাব্ ড্যাব্ ক'চ্ছে, পা দুখানা যেন কুলোর মত, চুল গুলো কটা, নাক যেন ঠিক্ হুতোম পেঁচার মত। পেট্‌টা——

আবার একজন তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "বড় বউটো যেন দেখ্‌তে ঠিক্ তাড়কা রাক্ষসী। অন্ধকার রাত্রিতে তাকে দেখ্‌লে আমার ত ভাই বড় ভয় হয়।

এইরূপে ক্রমশঃ সমালোচনায় বড়বউকে যৎকুৎসিৎ বলিয়া মীমাংসা হইতে হইতে সূর্য্যদেব স্ত্রী নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন তাহাদের মস্তকের উপরিভাগে উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা দুই প্রহর হইল। তাহাদেরও প্রাতঃকালীন পালা শেষ হইল। ব্রাহ্মণদের আহারের স্থান হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ মহলের প্রায় সকলেই আহারের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহ কোলাহলে পরিপূর্ণ করিতেছিল।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন বলিল "আজ কালের ব্রাহ্মণদের আর সে তেজ নাই। থাকবেই বা কি ক'রে, তারা সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতি কিছুই করে না, ব্রাহ্মণের যা ধর্ম্ম তার কিছুই আর এখন নাই। দিনের মধ্যে যতবার পায় ততবারই আহার করে, সুতরাং আজ কালের ব্রাহ্মণ ভোজনের আর কোন ফল নাই।"

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন "আজ কাল যদি কিছু ধর্ম্ম থাকে তবে ভট্টাচার্য্য মহলেই আছে।"

তখন এই কথাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাত মুখ নাড়িয়া বলিলেন "আপনি বুঝি ওপাড়ার বিদ্যাভূষণকে জানেন না? তার গুণাগুণ জানলে বোধ হয় আপনি একথা কখনই বলতেন না।"

বিদ্যাবাগীশ তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন "জানি জানি, আমি তাকে বেশ জানি। আমাদের ভট্টাচার্য্যদের মধ্যে তিনি একটী গণ্ডমূর্খ, বেশ্যা ভিন্ন কেহ তাহার যজমান নাই।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন "তাঁহার একটী বেশ্যা আছে রাত্রিতে পরিবার ত্যাগ করিয়া তাহারই সহিত রাত্রি বাস হয়। সে আবার শুনতে পাই নাকি জেতে মুসলমান।

ধর্ম্ম জানেন, আমরা যখন ঠিক জানি না তখন সে বিষয় লইয়া তর্ক করাই মিছা।

যাহা হউক এইরূপে সমালোচনায় মুখুযো বাড়ীর ব্রাহ্মণ ভোজনের উপসংহার হইল। পাঠক মহাশয়! স্মরণ রাখিবেন আমরা যে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথা বলিলাম, তাঁহার সহিত আমাদের অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

বাহির বাড়ীর ঘড়ি টুং টাং রবে জানাইল যে বেলা তিনটা। এইবার স্ত্রীলোকেরা আহার করিতে বসিল। মেয়ে মহলে বৈকালিক পালাও এইবার আরম্ভ হইল। পাঠক মহাশয় বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে মেয়েদের বৈকালিক পালা কি? যদি না বুঝিয়া থাকেন তবে ক্রমেই বুঝিবেন। স্ত্রীলোকদের আহারের সঙ্গে সঙ্গে গল্প না করিলে তাহাদের হজম করিবার শক্তি তত দূর প্রবল হয় না সুতরাং তাহাদের হজমী গুলি এই প্রকারে বিভক্ত হইতেছিল:——

একজন বলিল "দেখ্ ভাই হেমাঙ্গিনী, তুই ভাই কিন্তু বেশ্ সুখে আছিস্। অমন সোয়ামী আর কারও হবে না। আহা গহনা দিয়ে স্ত্রীকে যদি সাজাতে হয় তবে এই রকমেই সাজান উচিত। তোর সোয়ামী ত নয় যেন সাক্ষাৎ দেবতা।"

স্ত্রীলোক স্বামীর সুখ্যাতি অপরের মুখে শুনিলে, কিম্বা পুরুষেও স্ত্রীর সুখ্যাতি অপরের মুখে শুনিলে নিজে ভাল হইলেও মনে মনে কিছু না কিছু আত্মগরিমা হইবেই হইবে।

স্বামীর সুখ্যাতি শুনিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল "সুখ দুঃখ সকলই আপনাদের আশীর্ব্বাদ। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি চিরকাল এইরূপ সুখেই কাল কাটাইতে পারি।"

স্বর্ণলতা এই কথা শুনিয়া বলিল "আমার ছোট বউটী বাস্তু বকই লক্ষী, রূপে গুণে লক্ষী ও সরস্বতীর জাজ্জ্বল্য প্রতি মূর্ত্তি স্বরূপ।"

এই সকল কথোপকথনের সময় বিরজা হেটমুখে ছিলেন, হাঁ কি না, কোন কথাই বলেন নাই। পাঠক মহাশয়! স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই প্রকারের নানাবিধ কথা বার্ত্তা চলিয়াছিল। সমুদায় বর্ণনা করিতে গেলে পুস্তকের অবয়ব বৃদ্ধি হইতে পারে সেই ভয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম। কেবল পাঠক মহাশয়কে এই বলিয়া রাখি যে হেমাঙ্গিনী আমাদের কথিত বাঁড়ুয্যেদের ছোট বউ, স্বর্ণলতা বড় বউ, আর হেট-বদনা, মৌনাবলম্বিনী বিরজা আমাদের গর্বিনী মেজ বউ। ইহারা কেবল আহারের সময় আসিয়াছিল আহার করিয়াই চলিয়া গেল। যাহা হউক এইরূপ মহা সমারোহের সহিত কল্যাণপুরের বামন পাড়ায় হরলাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী তাঁহার পুত্রের শুভ অন্নপ্রাশন শেষ হইয়া গেল, পুত্রের নাম হইল "বসন্ত বেহারী।"

দ্বিতীয় ধাপ।

সাধারণ ঘাট।

কল্যাণপুরের বামন পাড়ায় একটী মাত্র পুষ্করিণী আছে। পুকুরটী দীর্ঘ প্রস্থে খুব বড়, এমন কি তাহাকে একটী দীঘি বলিলেও বলা যায়। পুকুরটী দীর্ঘ হইলেও তাহার একটী মাত্র ঘাট ছিল। ঘাটটী সান বাঁধান, পুকুরের একটী দিক

জুড়িয়া আছে। কল্যাণপুরে সেটী সাধারণ ঘাট নামেই প্রসিদ্ধ, কারণ পাড়ার সকলেই সেই ঘাট সরিত, বাঁড়ুয্যে বাড়ী হইতে মুখুয্যে বাড়ী প্রায় একপোয়া পথ অন্তর। পুকুরটী ঠিক ইহার মধ্যস্থলে। পুকুরের চারিদিকে ফুলের বাগান ও বাগানের মধ্য দিয়া কাঁকর ফেলা রাস্তা।

সময় প্রাতঃকাল। শরৎকালের প্রাতঃকাল অতি মনোহর। প্রকৃতি দেবী সমস্ত রাত্রি নীহারসিক্তা ছিলেন এখন সূর্য্যদেবের অনুগ্রহে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছেন বলিয়া যেন সেই হিংসাতে পৃথিবীর লোকদিগকে দেখিয়া হাস্য করিতেছেন, কিন্তু আর কিছুক্ষণ পরে যে সূর্য্যদেব অলঙ্কারগুলি সমস্তই কাড়িয়া লইবেন ও তাঁহাকে একটী শূন্যদেহাবশিষ্টা করিয়া ছাড়িয়া দিবেন তাহা স্বপ্নেও একবার ভাবেন নাই। তখন এই হাস্য যে নীরবে শিশির রূপে অশ্রুজলকে স্থান দিবে তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তখন পৃথিবীর লোকেরা তাহাতে তাহাদের কোন হাত নাই এই ভাবিয়াই যেন প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া নয়ন মুদিয়া প্রকৃতির সেই ক্ষণিক ঐশ্বর্য্যের বিষয় চিন্তা করে।

বেলা প্রায় ৭টা বাজিয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালের কার্য্য করিতে প্রায় পাড়ার সকল স্ত্রীলোকেই এখন ঘাটে আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ বা বাসন মাজিতেছে, কেহ বা কাপড় কাচিতেছে, কেহ বা কলসী হস্তে দণ্ডায়মানা আছে, কেহ বা কাপড় কাচিবেন বলিয়া মাটী হস্তে চুপ করিয়া ঘাটের একধারে উপবিষ্টা আছে পুরুষের ভয়ে জলে

নামিতে সাহস হইতেছে না, কেহ বা ছেলে জলে নামিয়াছে বলিয়া তাহার যমের বাড়ীর ব্যবস্থা করিতেছে, সুতরাং ঘাট তখন নীরব থাকা কখনই সম্ভব নহে। প্রাতঃকালের কার্য্য তত হইতেছিল না, কিন্তু কথা বার্ত্তা বিলক্ষণ চলিতেছিল। পরস্পর কথাবার্ত্তা পূর্ব্বদিনের মুখুয্যে বাড়ীর অন্নপ্রাশন লইয়াই হইতেছিল।

স্ত্রীলোকেরা যদি কাহারও বাড়ীর সমারোহে পরিতোষের সহিত উদর পূরণ করে তথাপি অসাক্ষাতে তাহার নামে নিন্দা করিতে গিয়া ইস্তক ব্রাহ্মণ ভোজন নাগাত চণ্ডীপাঠ না করিয়া ছাড়ে না। হবলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের বা বসন্ত বেহারীর অন্নপ্রাশনের তিন চারি দিন পরে কল্যাণপুরের সাধারণ ঘাটে কলসী হস্তে জল লইতে আসিয়া একজন স্ত্রীলোক বলিল "কি লো ভবর মা, বলি সে দিন মুখুয্যে বাড়ী খেয়ে কি ক'দিন পেটে গদ্ ছিল নাকি, তাই ক'দিন আর ঘাটে দেখ্‌তে পাই নি।"

ভবর মা তাড়াতাড়ি থোক্‌নো মাজিতে মাজিতে তুর্কীর ঘটীটি হাতে করিয়াই বলিল, "কি লো শামী যে, বলি ভাল আছিস্ তো?

শামী বলিল "আর বোন্ সে দিন মুখুয্যেদের বাড়ী পরের ভাত পেয়ে কুঁচ্‌কি কণ্ঠা পুরে খেয়ে আমার বড় পেটের অসুখ করেছিলো।"

ভবর মা পূর্ব্বের ন্যায় ঘুটী হস্তে করিয়াই বলিল "তুই কি পরের ভাত পেয়ে এত ক'রে খেয়েছিলি নাকি? আমার ত ভেবে ন্ খেয়ে পেটই ভরে নি। যার বাড়ী খেতে

যাব তার বাড়ী কারও যত্ন না পেলে কি সেখানে খেতে ইচ্ছা করে। আমাদের কি আর কেবল খেতেই যাওয়া রে বোন্? যাব, দুটো পাঁচটা সুখের দুঃখের কথা কব, এক জায়গায় দুদণ্ড বস্‌বো, তা না হয়ে গেলুম, কেউ একবার বস্‌তে পর্য্যন্তও বল্‌লে না, কুটুম্বের মত খেতে গেলুম আর খেয়ে চলে এলুম, বল্ না ভাই সেখানে কি আর খেতে শ্রদ্ধা হয়?"

একস্থানে একটি এরা কাক টাঙ্গাইলে সেইটীকে দেখিয়া যেমন অন্য অন্য কাকেরা একটী, দুইটী করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল গুলিই ডাকিয়া উঠে সেইরূপ যদি একজন স্ত্রীলোক কাহারও নিন্দা করিতে শুনে তবে সেখানকার স্ত্রীলোকেরা ক্রমে ক্রমে সকলেই তাহার নামে নিন্দা করিতে আরম্ভ করে। সাধারণ ঘাটে ভবর মা যেমন হরলাল মুখুয্যের নামে নিন্দা করিয়াছে অমনি সকলেই একে একে তাহার নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল। এমন কি শামী কিছু পূর্ব্বে মুখুয্যে বাড়ীর যে একটু প্রশংসা করিতেছিল সেটুকুও এখন ভুলিয়া গিয়া বলিল——

"যা বলো যা কও মুখুয্যেদের বাড়ীর সেই বুড়ী মাঠাক্‌রুণটীকে দেখ্‌লে আমার বড় রাগ হয়। কাজ কর্ম্মের বাড়ী হ'লে কাউকে কিছু দিতিই চায় না, কেবল আপনার কোলেই ঝোল টানে। ওসব বাড়ীতে বোন্ আপনার লোক হ'লেই যত্ন হয় আর বড়লোক তাঁদের ত আর কথাই নাই। আমাদের ট্যাকা নাই, আমাদের কেন যত্ন করবে বলো।"

তখন রামার মা কাপড় নিংড়াইতে নিংড়াইতে বলিল "বুড়ীর জন্যেই ওদের সংসারটা আজও আছে। বুড়ী একবার চোক্ বুজ্লে ওদের দুঃখে শেয়াল কুকুরও কাঁদ্‌বে না, বুড়ীর টাকাতেই ত ওদের সংসার চল্‌ছে, বুড়ীর দুপয়সা আছে ব'লে ওদের অত জাঁক জমক। বুড়ী হর হর ক'রে মরে কিন্তু হর মুখুয্যে বুড়ীকে বিষনয়নে দেখে। ঐ যে কথায় বলে "যার জন্যে রামের মা, তারে তুমি চেন না" তা বুড়ী ম'রে গেলে তখন বুঝ্‌বে কত ধানে কত চাল। দাঁত থাক্‌তে কি কেউ দাঁতের মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পারে?"

তখন নাপিত বৌ বলিল "হর মুখুয্যের মাগ্‌টো বড় বেহায়া, আব্রু ত একেবারেই নাই, অংখারে ফেটে পড়্‌ছে। তবু যদি নিজের স্বামীর টাকা থাক্‌তো তবে অংখার করা সাজ্‌তো। তোর পরের টাকায় আবার কিসের অংখার, আমরা হলে ত মরণে ম'রে থাকতুম। পরের ধনে পোদ্দারি করিস্ তার আবার অংখার করা কেন গা?"

নবার মা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। নাপিত বৌএর এই কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি বলিল "হবে না কেন, মা কি কখন পর হয়? আপনার ব'লেই এত অংখার করে। মিন্সে যা দুচার পয়সা রোজগার করে তা কেবল মাগের গহনা গড়াতেই খরচ হয়। শাশুড়ীকে কোন দিন একটা খইয়ের নাড় দিয়ে জিজ্ঞাসাও করে না। এই সেদিন ছেলের ভাত দিলে, সে সব খরচ ত বুড়ীই একলা ক'ল্লে। ছেলের গা সাজান গহনা বুড়ীইত সব দিলে। হর মুখুয্যে আর কি ক'ল্লে? আমরা ভিতরের খবর সব জানি বলেইত

আমাদের কাছে চাপা রইলো না। যারা না জানে তাদের কাছে হরলাল মুখুয্যেই নাম কিনলে।"

ভবর মা এতক্ষণ দুটী হস্তে করিয়াই সকলের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, এখনও সেইরূপ দুটী হস্তে করিয়াই বলিল "ইস্ তবু মাগীর যদি সৎমা না হ'ত আর মিন্সের যদি সৎশাশুড়ী না হ'ত তাহ'লে ত মাগীর আর অংখারে মাটীতে পা পড়তো না। এতেই সকলের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে কথা কয় আর আপনার কেউ হ'লে তার মুখের কাছে আর কেউ দাঁড়াতে পাত্তো না।"

নাপিত বৌ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল "দেখ্ বোন্ আমি একদিন মাগীকে আলতা পরিয়ে এসেছিলুম, তিন দিন পরে তার পয়সা চাইতে গিছলুম, তা মাগী দুটো পয়সার জন্যে মুখ ঝঙ্কারটা যে দিলে, তা আর তোমাদের কি বল্‌বো আমি ব'লে তাই সব স'য়ে এলুম আর কেউ হ'লে মাগীকে সেই খানেই ঠিক ক'র্ত্তো। কেনরে বাপু পাওনা পয়সার জন্যে এত মুখ ঝঙ্কার কেন? অমনি দিদিনে, কাজ করিছি তাই দিব, তাও নশো পঞ্চাশ নয়, দুটো পয়সা তাতেই এত, বেশী হ'লে না জানি আমায় কি ক'র্ত্তো।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় হর মুখুয্যের শাশুড়ী ফুলের সাজী হস্তে বাগানে ফুল তুলিতে আসিতেছে দেখিয়া অমনি সকলের চোকে চোকে ইসারায় টেলিগ্রাফ্ হইয়া গেল। তখন যে দুটী হস্তে করিয়াছিল সে লোকনো হাসিতে লাগিল, যে কাপড় নিঙড়াইতেছিল সে এতক্ষণে কাপড় নিঙড়ান শেষ করিল, যে জল লইতে

আসিয়াছিল সে এতক্ষণে জলে নামিল। স্ত্রীলোকের এমনি আকর্ষণী শক্তি যে দূরে এক জন কাহারও সহিত পরস্পর কথা কহিতে শুনিলে আকর্ষণগুণে তাহাকে তাহার নিকটে আসিতেই হইবে, সুতরাং হরলালের শাশুড়ীর ফুল তোলার উপসংহার সেই ঘাটেই হইল।

বুড়ী ক্রমে নিকটে আসিয়া অনেককে একত্রে দেখিয়া বলিল "কিলো তোরা যে ঘাটে চাঁদের হাট বসিয়েছিস্ দেখতে পাই।"

তাহাদের মধ্যে একজন অমনি বলিল "এতক্ষণ তুমি ছিলে না ব'লে আমাদের এ হাটে কিছুই বিক্রী হয় নি, এইবার তোমায় দেখে যদি আমাদের ভাঙ্গা হাটে দুই একটা খদ্দের হয়।"

বুড়ী বলিল "তোদের ও কেটো ইয়ারকি এখন রেখে দে। ওলো, আর শুনিছিস্, বাঁড়ুযোদের মেজবউ নাকি ওদের চাকরের সঙ্গে কথা কয়, কত রস তামাসা করে।"

এই কথা শুনিবামাত্র অমনি সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "অ্যাঁ! বল কি মাঠাকরুণ সত্যি নাকি? কি ঘেন্নার কথা একটু লজ্জা সরম নাই? মেয়ে মানুষ, ঘরের বউ, অমন কার্ত্তিকের মত স্বামী, তুই কিনা চাকরের সঙ্গে কথা কোস্? ওমা, কি ঘেন্না, কি ঘেন্না! তুমি কি ক'রে শুন্‌লে?"

বুড়ী চারিদিকে চাহিয়া কেউ কোথাও নাই দেখিয়া বলিল "আমার তিনকাল গেছে এককালে ঠেকেছে, কারও নামে মিথ্যা কথা ব'লে আমার লাভ কি বলো —

ভবর মা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "তুমি কার কাছে শুন্‌লে ?"

বুড়ী আবার চারিদিক্ চাহিয়া চুপি চুপি বলিল "কেন, আমায় ওদের ছোট বউ হেমাঙ্গিনী বলেছে।"

এই সকল কথা হইতেছে এমন সময় রাধানাথ বাঁড়ুযোর ছোট বউ ঘাটে আসিতেছে দেখিয়া বুড়ী বলিল "ইস্ মেঘ চাইতে জল যে দেখ্‌ছি, ছোট বউ, তুমি অনেক দিন বাঁচ্‌বে। এই আমরা তোমার নাম কচ্ছিলুম, নাম ক'ত্তে ক'ত্তেই অমনি হাজীর।"

তখন ছোট বউ বলিল "আমি আপনাদের কাছে এমন কি পুণ্য করিছি যে আপনারা এ অভাগিনীর নাম কচ্ছিলেন ?"

নাপিত বৌ তখন হাত নাড়িয়া বলিল "ষাট্ ষাট্, এমন অমঙ্গলের কথা কি বল্‌তে আছে ? তুমি অভাগিনী হবে কেন ? তোমার অমন দেবতার মত স্বামী বেঁচে থাক্ তোমার ভাবনা কি ? সেই সুখেই তোমার সকল সুখ। হ্যাগা, তোমার স্বামী কি তোমায় কিছু খবর দেয় নি ? অনেক দিন বিদেশে চাকরী ক'ত্তে গেছে, এই সাম্‌নে পূজো গেল, ছুটীর সময়েও কি আসে নি ? ভাল আছে ত ?

ছোট বউ অনেক ক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া কিছু মৃদুস্বরে বলিল "শুনিছি ভাল আছে। এই পূজোর সময় বোসেদের গোপাল বল্লে যে ভাল আছে।"

ভবর মা তখন সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল "আহা থাক্ থাক্, শুনেও আমরা সুখী হলেম। তোমার বড় ভাশুরও

তো বিদেশে চাকরী করেন, তিনি পূজোর ছুটীতে বাড়ী এসেছিলেন ? ”

ছোট বউ বলিল “ হ্যাঁ, তিনি পূজোর সময় এসেছিলেন। ”

এই সকল কথা হইতেছে এমন সময় বুড়ী হঠাৎ ছোট বউকে জিজ্ঞাসা করিল “ হাঁগা ছোট বউ তোমার মেজদিদি যে তোমাদের চাকরের সঙ্গে কথা কয়, তোমার বড়দিদি তাকে কিছু শাসন করে না ? ”

ছোট বউ বলিল “ আর ও সব কথা কেন ? আবার শোনে ত একখানা কোরে বল্‌বে, জানইত সে কেমন মেয়ে বাছা। ”

বুড়ী বলিল “ ছি, ছি আমরা কি আর বলতে যাব, না এই এরাই কারো কাছে বল্‌তে যাবে ? আপনার লোকের অখ্যাতির কথা কি আর আমরা ঢ্যাড়া পিটে বেড়াব ? (সকলের দিকে চাহিয়া) সাবধান, এ কথা যেন কোন মতে প্রকাশ না হয়। ”

সকলে বুড়ীর কথা শুনিয়া জিব্‌ কাটিয়া বলিল “ ছি, ছি, ছি একি আবার একটা বলবার কথা ? আমাদের কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে এই একটা সামান্য কথা মনে ক'রে রাখ্‌বো ? মনে থাকলেও আমাদের পেটের কথা পেটেই থাকে। ”

কেউ কোথাও নাই দেখিয়া ছোট বউ তখন চুপি চুপি বলিল “ আমার শ্বশুর শাশুড়ী মরে যাবার পর আমার বড়ঠাকুর বিদেশে চাকরী ক'ত্তে গেলেন। মেজদিদি নিজে

গিন্নেপনা ক'রে এক সুন্দর ছোক্‌রা দেখে চাকর রাখ্‌লেন। সেটা আবার হাবা গোবা, কিছুই বুঝ্‌তে শুঝ্‌তে পারে না, কিন্তু মেজ্‌দিদি ক্রমেই তাকে রসিক ক'রে তুল্‌ছেন। তার সঙ্গে কথা কওয়া, ঠাট্টা তামাসা করা সবই এখন চলে। বড়্‌দিদি রাত্‌দিন খিট্‌ খিট্‌ করেন ব'লে তাঁর ছেলে তিনটীকে পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পারেন না।"

রামার মা এতক্ষণ চুপ্‌ করিয়াছিল, কোন কথাই বলে নাই, ছোট বউএর এই কথা শুনিয়া সে বলিল "কেন তার স্বামী কি তাকে কিছু বলে না?"

ছোট বউ বলিল "মেজ্‌ঠাকুর দশেও নাই, পাঁচেও নাই, মেজ্‌দিদি তাঁকে ভেড়া ক'রে রেখেছে, যা বলে তাই শোনে। মেজ্‌দিদির মন্ত্রণায় তিনিও বড়্‌দিদির ছেলে তিনটীকে দেখ্‌তে পারেন না।"

এইরূপ সমালোচনায় বেলা প্রায় নয়টা বাজিল। হর লালের শাশুড়ীর সে দিন আর ফুল তোলা হইল না। মেজ বউ ঘাটে আসিতেছে দেখিয়া ঘাটের সভা সে দিনের মত ভঙ্গ হইল। সকলেই তখন যে যার কাজ সারিয়া চলিয়া গেল। সে দিন আর কিছুই হইল না।

তৃতীয় ধাপ।

বীজ রোপণ।

মৃত রাধা নাথ বাঁড়ুয্যের পরিবারের মধ্যে তাঁহার তিনটী পুত্র। বড় রামলাল, মধ্যম কৃষ্ণলাল, ছোট মতিলাল। দ্বিতীয় পক্ষের এক বিধবা কন্যা কেতকিনী, বিধবা হইলেও কেতকিনী প্রায়ই শ্বশুর বাড়ী থাকিত। তিন পুত্রের তিন বউ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বড় বউ স্বর্ণলতার নাবালক তিন পুত্র, বড় হেম মোহন, মধ্যম কিশোরী মোহন ও ছোট ললিত মোহন। মেজ বউ বিরজার কৃষ্ণা বলিয়া চারি বৎসরের এক কন্যা। ছোট বউএর্ বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। রামলাল পশ্চিমে চাকরী করিত বেতন পঞ্চাশ টাকা, কৃষ্ণলাল কল্যাণপুরে জমিদার সরকারে দশ টাকা বেতনে চাকরী করিত বটে কিন্তু উপরি পাওনা তাঁহার বিলক্ষণ ছিল। মতিলাল নারাণপুরে শ্বশুর বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন একটী গবর্ণমেন্ট আফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে চাকরী করিত। বাড়ীতে স্বর্ণময়ী বলিয়া এক চাকরাণী ছিল ও আমাদের পূর্ব্ব কথিত মডেল চাকরটীর নাম "জনার্দ্দন"। রাধা নাথ ও তাহার স্ত্রীর অনেক দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে সুতরাং বড় বউ স্বর্ণলতাই এখন সংসারের গৃহিণী।

রাধানাথ বাঁড়ুয্যের বিষয় আশয় যাহা ছিল তাহা অতি সামান্য, তিনি মরিবার সময় বিষয়ের কিছুই উইল করিয়া যাইতে পারেন নাই সুতরাং আইনানুসারে বিষয়ের দলিলাদি

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলালের হস্তেই ন্যস্ত হইল ; এখানে অন্য কোন পরিচয় দিবার তত প্রয়োজন নাই বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

পাড়ায় বাঁড়ুয্যে মুখুয্যে ভিন্ন আরও অনেক ভাল ভাল ব্রাহ্মণের বাস ছিল সেই জন্য তাহাকে "বামুন-পাড়া" বলিত। কল্যাণপুরের বামুন-পাড়া বলিলেই সকলে চিনিয়া যাইতে পারিত ; বামুন-পাড়ার ন্যায় আবার কায়স্থ-পাড়া, কাওরা-পাড়া, মুসলমান-পাড়া প্রভৃতি অনেক পাড়া ছিল। মোট কথায় বলিতে গেলে পাড়াটীতে অনেক ঘেঁস্ ঘেঁস্ ভাল ভাল সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। এক বাড়ী হইতে আর এক বাড়ী ঘরের বউ ঝিও বেড়াইতে যাইতে পারিত। কাহারও কোন বিপদ হইলে সাহায্যেরও কোন অভাব হইত না। জগদম্বাঠাকুরুণ (এখন আমরা হরলালের শাশুড়ীকে তাহার নাম ধরিয়াই বলিব) সর্ব্বদাই বাঁড়ুয্যে বাড়ী বেড়াইতে যাইত, সে এক প্রকার "পাড়াবেড়ানী" বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। পাড়ার অন্য সকলের অপেক্ষা বাঁড়ুযোদের সহিতই তাহার বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। কোন কাজ কর্ম্ম, কি কোন পরামর্শাদি, সৎ হউক আর অসৎ হউক, জগদম্বা ঠাকুরুণ না থাকিলে কোন কাজই হইত না। তিনিই তাহাদের সংসারের বিধাতা বলিলেও চলিত। একদিন জগদম্বা ঠাকুরুণ বাঁড়ুযোদের বাড়ী বড় বউএর নিকট বসিয়া আছে, কথায় কথায় সংসারের কথা উঠিল।

স্ত্রীলোকে যদি কখনও কাহারও নামে কোন অপবাদ শোনে, মিথ্যা হউক আর সত্য হউক সে কথা যতক্ষণ পেটে

থাকিবে, ততক্ষণ তাহাদের পেট যেন ক্রমশঃই স্ফীত হইয়া উঠে। আর একজনের নিকট প্রকাশ করিলে তবে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে। "অমুক কথা যেন প্রকাশ না হয়" একথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেও যদি সামান্য কথাও হয় তবে তাহাকে অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া বলিতে স্ত্রীলোকেরা যেমন পারে তেমন আর কেহই পারে না।

সে দিনকার মেজবউএর চাকরের সহিত ঠাট্টা তামাসা করিবার অপবাদ পাড়ায় ঢি ঢি হইয়া গিয়াছে। পাড়ার সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে ওপাড়ার বাঁড়ুয্যে-দের মেজবউ চাকরের সহিত নষ্টা। মেজবউএরও আর পাড়ায় বাহির হইবার পথ রহিল না। মেজবউও জানিল যে পাড়ায় তাহার নামে এক মিথ্যা অপবাদ রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। অপবাদ, চাকরের সহিত কথা কওয়া, কিন্তু কোথা হইতে হইল, কে করিল তাহার কিছু বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। কিন্তু মেজবউ জানে না যে ধর্ম্মের কল বাতাসে বাজে, মেজবউ এখন সর্ব্বদাই সতর্ক, কে কোথায় কি কথা কয় কেবল তাহাই শুনিয়া বেড়ায়। হঠাৎ জগদম্বার সহিত বড়বউএর কথা মেজবউএর কর্ণে গরলে অমৃতের ন্যায় বোধ হইল। এতদিনে সে অতলস্পর্শী সমুদ্রের তল পাইল, এতদিনে তাহার হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিল, এতদিনে তাহার চক্ষু ফুটিল। মেজবউ শুনিতে পাইল জগদম্বা বলিতেছে:—

"বড়বউ! তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না যে এতে অখ্যাতি কার? তুমি গিন্নী, তুমি বউঝিকে নিজের এক্তারে রাখ্‌তে পার না? এই যে কল্যাণপুরময় একেবারে ঢি ঢি হয়ে গেছে

এতে কি তোমার কিছু মানের বৃদ্ধি হয়েছে? ছি, ছি, ছি দড়ি কি জোড়ে না? আহা! রাধানাথ আমার যতদিন বেঁচে ছিল এই সংসার কি সুখের সংসার ছিল! কেউ একটা টুঁ শব্দ ক'ত্তে পাত্তো না। আমি তার নাকি অনেক খেয়ে মানুষ হয়েছি, সেও আমায় নাকি বড় ভাল বাস্তো তাই আজ তার সংসারের দুর্দ্দশা দেখলে বলতে আস্তে হয় নইলে আমার বো'য়ে গেছে আস্‌বার জন্যে। তোমরা উৎসন্নেই যাও আর তোমাদের সংসার যাক আর থাক্ তাতে আমার কি? ভাগ্যে ছোট বউএর্ সঙ্গে আমার সেদিন আড়ালে দেখা হয়েছিলো তাই আমি তার কাছে শুনলেম্ নইলে তুমি ত এর বাষ্পও আমার কাছে বলোনি বাছা? তুমি ঘরের গিন্নী হ'য়ে এ কথা চেপে রাখ্‌তে চাও। আরে একি চেপে রাখবার কথা? একি নর্দ্দামার জল যে বাঁধ দিয়ে আট্‌কে রাখ্‌বে? এযে ধর্ম্মের ঢোল, এযে বিধাতা আপনিই বাজাবেন তাকি জাননা?”

জগদম্বার এইরূপ কর্কশ বাক্য শুনিয়াও বড়বউ মৃদুস্বরে বলিল “দিদি! আমাকে যাই বলো, সবই আমি সইতে পারি, সবই আমি মানি, সবই আমি বুঝ্‌তে পারি কিন্তু আমার ছেলে তিনটীকে গাল দিলে আমার প্রাণে বড়ই বাজে। আমি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, তাদের মঙ্গল নিয়েই আমার মঙ্গল, তাদের সুখেই আমার সুখ। তুমিই বল দেখি তাদের শাপ মন্যি দিলে আমার সেখানে কি আর কোন কথা কওয়া উচিত? তোমাকে আমি সেই জন্যই বলি নাই, কেননা আমি তাহার চরিত্র সম্বন্ধে দোষ সকলের

নিকট প্রকাশ করিছি এ কথা জানতে পারলে কি আর আমার নিস্তার থাকবে দিদি? তাহ'লেই আমি মাঝখান থেকে মারা যাব। কর্ত্তা এখানে নাই, ছোটঠাকুরপোও নাই, আর মেজঠাকুরপো, তিনি ত মাগ উঠতে বল্লে ওঠেন আর বসতে বল্লে বসেন সুতরাং ধর্ম্মের কল বাতাসেই বাজবে এই ভেবেই আমি নিশ্চিন্তা আছি। তুমি মনে ক'চ্ছো যে আমি তোমায় বলি নাই, কিন্তু কেন যে বলি নাই তাহা ত তুমি জান না? কেন, আমাকে কি তুমি জান না? আজ কি নূতন জানলে? কি কর্ব্বো বোন্ নেউল সাপের কাছে গেলে সাপ সর্ব্বদাই তাহার নিকট মাথা নীচু করিই থাকে আমিও কাজে কাজেই তার নিকট সাপের ন্যায় মাথা নীচু করিই থাকি। আমি খিট্ খিট্ করি ব'লে আমার ছেলে তিনটীকে কতই শাপ মন্নি দেয়, এমন কি, মেজঠাকুরপো পর্য্যন্তও তাদের দেখতে পারেন না। আমি কি দিদি সাধে চেপে রাখতে চাই? পেয়দায় বলায় বাপ, তা না হলে কি আর আমি আপনি বাপ বলি? ছোট বউ বলেছে আর পাড়ায় ঢি ঢি হ'য়ে গেছে একথা শুনলে কত খানা করেন একবার দেখে নিও, তুমি ত আর মরবে না?"

জগদম্বা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "তোমাদের ছাগল তোমরা লেজের দিকে কাট তাতে আর আমার কি? তবে একবার বলতে হয় তাই বল্লুম। আর সত্যিই ত বটে ছার' সংসারের জন্যে কেন তুমি তোমার ছেলে তিনটীর অমঙ্গল কিনবে বলো? এখন বেলা গেল আমি চল্লেম।"

এই বলিয়া জগদম্বা যাইতে উদ্যতা হইলে বড় বউ হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল "বোসো না দিদি এখুনি যাবে কেন? এমন নয় যে তোমার ঘরে পাঁচটা ছেলে মেয়ে কাঁদ্‌ছে এখুনি না গেলেই নয়, ঘরেও গিয়ে বসে থাক্‌বে না হয় এখানে বোসে দুটো সুখের দুঃখের কথাই কইলে।"

জগদম্বা বলিল "না বোন্ যাই অনেক কাজ রয়েছে, কচি ছেলেটা কে একবার ধরে তার ঠিক নেই। বউটো একলা রয়েছে, সে সংসারের পাট কর্‌বে না ছেলে ধর্‌বে? হর দেখে এসেছি কোথায় বেরিয়েছে। যাই আবার এখুনি একটা ক'রে বস্‌বে?"

বড় বউ বলিল "এখনও ত বেলা আছে তার কি? আমাদের কি কাজ কর্ম্ম নেই? আমার ছেলে তিন্‌টে যে কে কোথায় গেছে তাও জানিনে" বলিতে বলিতে ললিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ললিতকে দেখিয়া বড় বউ বলিল "এই যে আমার ললিতমণি আস্‌ছে, কিরে এরা দুটো কোথায় গেল?"

ললিত আধ কান্না স্বরে বলিল "আমি জানিনা। আগে আমার সঙ্গে মেজখুড়ীমার কাছে ছিল, তার পর, তার পর কোথায় গেল তা আমি জানিনে ঝ্যাঁ।"

ললিতের মা বলিল "তোর মেজখুড়ী কোথায় কি ক'চ্ছে রে?" অনেকক্ষণ পরে ছেলেদের মার সহিত দেখা হইলে প্রথমে কথা কহিতে ভয় হয়, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর তত থাকে না।

এবার ললিত পূর্ব্বাপেক্ষা সাহসের সহিত বলিল "মেজ খুড়ীমা ঐ পাশের ঘরে বোসে আছেন।"

ললিতের মা বলিল "হেম আর কিশোরী কি সেখানে আছে না কোথাও গেছে?"

এবার মা কিছু বলিল না দেখিয়া ললিত আরও সাহসের সহিত বলিল "না আমি আস্‌বার সময় তাদের সেখানে দেখ্‌তে পাইনি, তারা কোথায় গেছে।"

ললিতের মা বলিল 'তোর মেজখুড়ী ঐ পাশের ঘরে বোসে কোথায় কি কোচ্ছে দেখে এলি?"

ললিত এবারে আরও সাহসের সহিত, বলিল "এই জানালার কাছে বোসে আছেন।" এই কথা বলিতে ললিতের সাহস হইল বটে কিন্তু তার মার মনে ঠিক তাহার বিপরীত হইল। কারণ তাহারা যেখানে কথা কহিতেছিল, ললিতের বর্ণিত জানালার কাছে বসিলে সকল কথাই ঘর হইতে শোনা যাইত।

ললিতের মা তখন তাড়াতাড়ি ললিতকে বলিল 'বাবা ললিত, এরা কে কোথায় গেছে খুঁজে আনত বাবা।"

ললিত আধ কান্না স্বরে বলিল "আমি পার্‌বো না, আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে।"

ললিতের মা এই কথা শুনিয়া বলিল "যাও বাবা যাও তোমায় একটা পয়সা দেবো।" ছেলেদের পয়সার লোভ দেখাইলে তারা আর কোথায় আছে, যা বলো তাই কর্‌তে পারে সুতরাং ললিত তাহার ভাইদের খুঁজিতে গেল।

ললিত চলিয়া গেলে বড় বউ আবার জগ মা'কে বলিল "দিদি! দেখ্‌লে, যা বলিছি তাই হয়েছে। আমাদের কপাল বুঝি পুড়েছে। যেখানে বাঘের ভয় সেই খানেই

সন্ধ্যা হয়। মেজবউ বোধ হয় আমাদের সব কথাই শুনতে পেয়েছে। তাহ'লেই সর্ব্বনাশ হবে আর কি। জগদম্বাও দেখিল যে এক যাত্রায় সুফল কুফল দুইই হইয়াছে। তাহারও কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া ফলবান্ সংসার-ক্ষেত্রে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে পথে নাপিত বউএর সহিত দেখা হইল।

নাপিত বউ জগদম্বাকে দেখিয়া বলিল "কিগো মাসী যে?" একটু বয়সে বড় হইলেই স্ত্রীলোকদের পরস্পর সম্পর্কের অভাব থাকে না।

জগদম্বা নাপিত বউএর্ এইরূপ সম্বোধনে সন্তুষ্টা হইয়া বলিল "এইত বাছা, বলি ভাল আছিস্ তো?"

নাপিত বউ। তার পর মাসী কোথা যাওয়া হইছিল?

জগদম্বা। এই বাছা বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী পর্য্যন্ত গিছলুম।

নাপিত বউ। তার পর মাসী সেদিনকার ঘাটের কথা কিছু হ'লো নাকি?

জগদম্বা। হবে আর কি? আজ আর কিছু হ'লো না তবে বড় বউকে দু একটা শক্ত শক্ত কথা বলে এলেম।

নাপিত বউ জগদম্বার মনের কুটিলভাব কিছুই জানিত না, সুতরাং জগদম্বার মুখে ঐ কথা শুনিয়াই আর কিছু না বলিয়া তাহার নিজের কাজে চলিয়া গেল। জগদম্বা তাহার বাড়ী গেল, আর নাপিত বউ যে কোথা গেল তাহা আমরা জানি না। জানিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না কারণ নাপিত বউএর সহিত আমাদের এ উপন্যাসের আর কোন সম্বন্ধ নাই, যাহাহউক জগদম্বারও কুটিলতার বিষয় আমরা

এখানে বিশেষ কিছু বলিলাম না কারণ জগদম্বা নামেও জগদম্বা আর কাজেও জগদম্বা। সে বরের ঘরের মাসি আর ক'নের ঘরের পিসি তাহা পাঠক মহাশয় বোধ হয় এক আঁচড়েই জানিতে পারিয়াছেন, না পারিয়া থাকেন তবে ক্রমেই জানিবেন, জগদম্বার কুটিলতার পরিচয় ক্রমেই প্রকাশ পাইবে। এখন বেলা গেল এরা যে যার কাজে গেল আমরাও আমাদের নিজের কাজে চলিলাম।

চতুর্থ ধাপ।

কুটিলেকুটিলে।

আজ মেজবউএর হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িল, সকল কথাই মেজবউএর হৃদয়ে বিষম বাজিল। এখন মেজবউ আর সে মেজবউ নাই। এখন চিন্তাই তাহার বিপদের কাণ্ডারী, চিন্তাই তাহার অসময়ের বন্ধু, চিন্তাই তাহার অকূল সমুদ্রের দিগ্দর্শন। চিন্তা তাহাকে যে দিক্ দেখাইবে সেই দিক্ই তাহার গম্য দিক্ হইবে। চিন্তা বন্ধুভাবে তাহাকে যে পরামর্শ দিবে তাহাই তাহার সৎপরামর্শ হইবে। এ পাপ সংসার তাহার নিকট শ্মশান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার হৃদয় ক্রোধ এবং হিংসার আবাসস্থান হইল। দয়া, স্নেহ, মমতা চিরদিনের মত তাহার হৃদয় হইতে পলায়ন করিল। ক্রূর প্রকৃতি ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় ক্রমেই সতেজ হইতে লাগিল, ক্রমেই নিজ মূর্ত্তিতে হৃদয়ের সর্ব্ব স্থানে

সঞ্চারিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক শিরায়, প্রত্যেক ধমনীতে মূর্ত্তিমান ক্রোধ চিন্তাসহচরীর সহিত নিজ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহাকে ক্ষণেকের জন্যও আপনার বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল, ক্ষণেকের জন্যও আপনার স্নেহের ও ভালবাসার অংশী করিয়াছিল, যাহাকে কখন না কখন মনে মনে ভক্তির সহিত পূজা করিত, যাহাকে কদাচ জীবনের হিতৈষী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল, এখন তাহার সেই কুটিল প্রকৃতি পূর্ব্বের সেই ক্ষণিক সততাকে কণামাত্র স্থানও দিতে কুণ্ঠিত হইল। এক সময়ে যাহাদিগকে চন্দনতরু ভ্রমে অতি যত্নপূর্ব্বক সংসার-ক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছিল, এখন তাহাদিগকে বিষবৃক্ষ জ্ঞানে সংসার ক্ষেত্র হইতে ছেদন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মন একবার কোন কারণে ভাঙ্গিলে আর জোড়া লাগে না। মেজ-বউএর মন ভাঙ্গিল তাহা আর বোধ হয় ইহজগতে জোড়া লাগিবে না। সে আর সংসারের কাহারও সহিত পূর্ব্বের ন্যায় সরল ভাবে কথা বার্ত্তা কয় না, কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না, কাহারও কোন সংস্রবে থাকে না। ঘৃণাই তাহার এখন সদ্ব্যবহার, ক্রোধই তাহার এখন সৎ-প্রকৃতি, অনিষ্ট চিন্তাই তাহার এখন জীবনের সারচিন্তা।

সে ভাবিল যে স্বামী ভিন্ন আমার এসংসারে আর কেহই নাই, এ পাপ সংসারে আমার অদৃষ্টে বিধাতা সুখ লিখেন নাই। জন্ম বধি আমি দুঃখ ভোগ করিতে আসিয়াছিলাম দুঃখ ভোগ করিয়াই চলিলাম। আমার অদৃষ্ট সুখের পথ কণ্টকাবৃত, আমার ভাগ্য নিতান্তই মন্দ নতুবা মিথ্যা কলঙ্ক

আজ আমায় কেন এত কলঙ্কিনী হইতে হইবে? পিতা মাতার এত আদরের কন্যা হইয়াও আজ আমায় অরণ্যে বসিয়া ক্রন্দন করিতে হইল ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এই সকল ভাবিয়া মেজবউএর হৃদয়তন্ত্রী ক্রমশঃ ছিন্ন হইতে লাগিল সে পৃথিবী শূন্য, দেহ অসার বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। সকলের অজ্ঞাতসারে মেজবউএর হৃদয়ে কতকগুলি নীচপ্রবৃত্তি আসিয়া আশ্রয় লইল, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। আপাততঃ মেজবউ কি করিবে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার মনে ভাবিল সে সম্মুখ সমরই ইহার প্রধান ঔষধ। আবার ভাবিল, না একেবারে উন্মত্ত হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কোন কার্য্য করা উচিত নয়। আমি কি এতই হীন বল? আমার স্বামী কি আমার প্রতি এতই নিষ্ঠুর হইবেন যে ইহার কোন প্রতীকার তাঁহার দ্বারা হইবে না? এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে মেজবউএর হঠাৎ জগদম্বাঠাকুরুণকে মনে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ জগদম্বাঠাকুরুণকে ডাকাইয়া পাঠাইল।

জগদম্বা আসিয়া দূর হইতেই মেজবউকে বলিল "কিগো এ বুড়ীকে আজ আবার তলব হ'য়েছে কেন?"

স্বার্থ থাকিলেই লোকে লোকের প্রতি মিষ্ট কথা কহিয়া থাকে, যদিও মেজবউ জানিত যে জগদম্বাই বড় বউএর নিকট তাহার সম্বন্ধে তিরস্কার করিয়া গিয়াছে তথাপি তাহার অন্তরে কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য এবং নিজেরও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিষ্ট কথায় মেজবউ বলিল "ক'দিন যে আর দেখিনি? এ

গরিবের বাড়ী পায়ের ধুলাই যে আর পড়ে না ? তাই বলি, বলি দিদিকে একবার দেখ্‌বো দিদি আমার কেমন আছে। তা দিদি ভাল আছ ত ?"

জগদম্বা। আর বো'ন্ আমার ভাল আর মন্দ, এখন যম অনুগ্রহ ক'ল্লেই আমি বাঁচি। কেন যে করে না তাও ব'ল্‌তে পারি না।

মেজ বউ। সে কি ! তোমার আবার মরবার ইচ্ছে কেন ? তোমার এখন কিসের বয়স ? এমন সোণার সংসার যার তার আবার দুঃখ কিসের ?

জগদম্বা। আমার সোণার সংসার আর তোমার কি পিতলের সংসার নাকি ? তোমরা কি সর্ব্বদাই দুঃখ ভোগ ক'চ্ছো নাকি ?

মেজবউ। আমার সংসার সোণার সংসারও নয় আর পিতলের সংসারও নয়। এ লোহার সংসার। এ সংসার সহজে ভাঙ্গে না।

জগদম্বা তখন জিব্ কাটিয়া বলিল "বালাই, এমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে ? এমন অমঙ্গলের কথা কি মুখে আন্‌তে আছে ? এতে যে লক্ষ্মী রাগ করেন। সংসার আবার ভাঙ্গবে কি ? এমন অমঙ্গল কি কেউ ইচ্ছে ক'রে ডেকে আনে ? এমন সুখের সংসার ভাঙ্গলে আর তোমাদের দুর্দ্দশা রাখ্‌বার ঠাঁই হবে না।

এই কথ শুনিয়া মেজবউ অতি মৃদুস্বরে বলিল "দিদি ! তা আমি জানি, জেনেও আমি নির্ব্বোধ, আমি আশামরীচিকার মত এই সংসারে দূর হইতে জল পাবার আশায়

ক্রমশঃই অগ্রসর হ'চ্ছি কিন্তু জল পাচ্ছিনা, শেষে নিজের প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি। কি ক'র্ব্বো বলো উপায় নাই। দিদি! কেন তুমি কি আমার পোড়া অদৃষ্টের বিষয় কিছু জান না, তুমি কি কিছুই শোন নি?'

মেজবউ ও কৃষ্ণলালের প্রতি জগদম্বার কিছু আন্তরিক টান ছিল, কেন ছিল তাহা আমরা জানি না। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে সে টানটুকু স্বাভাবিক, সেই টানটুকুর জন্যই সামান্য চাকরের সহিত কথা কওয়া লইয়া এত বড় একটা সোণার সংসার অনায়াসেই ছারেখারে দিতে বসিয়াছে। জগদম্বার মত লোকই বা তাহা না পারিবে কেন? সে একজন পোড়্খেকো লোক। সে বাঁড়ুয্যেদের প্রত্যেকেরই মনের ভিতর ডুবুরি নামাইত, বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীর কে কেমন লোক তাহা সে এতাবৎকাল জানিয়া আসিয়াছে সুতরাং তাহার পক্ষে ইহা বড় কঠিন কার্য্য নহে।

পাঠক মহাশয়! জগদম্বা বড় বউএর্ নিকটে মেজবউএর সম্বন্ধে যে তিরস্কার করিয়া আসিয়াছে জানিবেন তাহা আন্তরিক নহে। অতএব জগদম্বা মেজবউএর্ দিকে স্নেহের টান টানিয়া বলিল "আমিত সবই জা'ন। আমি কি জানিনা যে চাকরের সঙ্গে সকলেই কথা ক'য়ে থাকে, এই সংসারে চাকরের সঙ্গে বউঝির না কথা কইলে কি চলে? এই যে বড় বউ, সে চাকরের সঙ্গে কথা কয় না? কথা কইলেই কি আর দোষ হয়? তবে আমি যে কেন ব'লেছিলাম তাকিতুমি জান না? তুমি কি এটাও বুঝ্তে পারনি যে তোমারই ভালর জন্যে আমি এতখানা সাজিয়ে তুলেছি? আমার

কৃষ্ণলাল যাতে সুখে থাকে আমি যে রাত্রিদিন খেয়ে না খেয়ে কেবল তারই চেষ্টা ক'রে বেড়াচ্ছি তা ত তুমি কিছুই ভাব নি। তবে যদি বলো যে পাড়ার আর সকলেই জানতে পেরেছে, তা সে পথ না রেখেই কি আর আমি এ কাজে হাত দিয়েছি? এটা কি জাননা যে সকল লোকে না জানতে পারলে কি কোন কার্য্য সিদ্ধি হয়? নিজে চ'কের জল ফেলছি এটা সকলে না জানতে পারলে কি কেউ আমার দুঃখে চ'কের জল ফেলে?"

মেজবউও জগদম্বার মন পূর্ব্বে কতক কতক জানিত, তথাপি মানুষের মন ত মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল এই ভাবিয়া প্রথমে কিছু বলিতে সাহস করে নাই এখন তাহার মনের গতি পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে জানিতে পারিয়া বলিল "তবে দিদি আমি এখন কি ক'র্ব্বো আমায় বল সেই জন্যেই আমি তোমায় ডেকেছি?"

তখন জগদম্বা একবার বাহিরে গিয়া এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া কেহ কোথাও নাই দেখিয়া মেজবউকে আসিয়া বলিল "তোমার ভাশুর ত এখানে নাই, তোমার ছোট-ঠাকুরপোও নাই সুতরাং আমার কেষ্টই ত এখন কর্ত্তা আর তারই হাতে ত সংসারের সমস্ত ভারই পড়েছে। তা'কেই ত সংসারের সব খরচই চালাতে হ'চ্ছে এটা ত জান? মনে কর এর মধ্যে যদি রামলালের কোন ভাল মন্দ হয়, যদি রামলালের চাকরীই না থাকে, হ'তেও ত পারে পরের চাকরীর কথা ত আর বলা যায় না, এইরূপ কোন গতিকে যদি রামলাল এখানে এসেই আবার সংসারের ভার নিয়ে সংসার

চালায় তা'হলে কেষ্টর উপায় তখন কি হবে? এখন যদি কেষ্ট তার রোজগারের যা কিছু টাকা কড়ি এত বড় সংসারটায় খরচ ক'রে ফেলে তবে শেষে রামলাল এলে কেষ্টর উপায় কি হবে ভাব দেখি কারণ ভাই ভা'য়ের কথা ত বলা যায় না, তখন রামলাল যদি কেষ্টকে ভিন্ন ক'রেই দিলে। এই সকল ভেবে ত কাজ ক'ত্তে হবে? সংসার ত চালালেই হয় না? কর্ত্তাত হ'লেই হয় না? তাই বলি কি যদি আমার পরামর্শ শোন তবে আর আর সকলকে পৃথক্ ক'রে দিয়ে তুমি আর কেষ্ট এই দু জন থাকলিই কেষ্টর আমার অনেক পয়সার সাশ্রয় হবে। মিছামিছি এত গুলার খরচ জোগাবার দরকার কি,—আর তাতে লাভই বা কি? আর বিষয়ের যে দলিল তা ত কেষ্ট অনায়াসেই হাত ক'ত্তে পার্ব্বে কারণ তা ত আর রামলাল সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় নি সুতরাং সে ত এক রকম কেষ্টর হাতেই আছে। সেইটে হাত ক'রে নিয়ে নিজের নামে কি তোমার নামে রেজেষ্টারি ক'রে নিলেই হবে। এই জন্যই আমার এত ক'রে চেষ্টা করা আর এই জন্যেই তোমার নামে এত ক'রে সাজিয়ে বলা, তা না হ'লে আমার বল্‌বার দরকার কি? এখন সব বুঝ্‌তে পাল্লে? কিন্তু এক কথা বলি, কেষ্টর কাছে কিন্তু প্রথমে এ সব কথা কিছু ব'লো না।"

এই সকল কথা শুনিয়া মেজবউ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল এবং ভাবিয়া দেখিল যে জগদম্বা যাহা বলিল তাহা বড় মন্দ পরামর্শ নহে। তাহার মনের মত পরামর্শই আজ জগদম্বা তাহাকে দিয়াছে। আর মেজবউও সে বিষয়ে বিশেষ

পাকা সুতরাং মেজবউএর ন্যায় কুটিল প্রকৃতির স্ত্রীর, স্বামীর নিকট অন্য ছলের অভাব হইবে না ইহাও জগদম্বা বিলক্ষণ জানিত। কুটিলার নিকট কুটিলার পরামর্শ সৎপরামর্শ বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইল।

অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া মেজবউ জগদম্বাকে বলিল "দিদি তবে আমি তাহাই করিব। দেখো যেন তুমি আমায় অবশেষে ভুলে থেকো না। দেখো যেন গাছে তুলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থেকো না"।

জগদম্বা বলিল "তা'হলেই বা আমি এমন সৎপরামর্শ দিতে আস্‌বো কেন? আমি ভুলে থাক্‌বো এও কি তোমার বিশ্বাস হয়? যাহ'ক এখন আমি চল্লেম, বেলাও গেল আবার কেউ কিছু শুন্‌বে শেষে কি হ'তে কি হবে কারণ শুভ কার্য্যের অনেক বাধা পড়ে। এই বলিয়া জগদম্বা চলিয়া গেল।

জগদম্বা চলিয়া গেলে মেজবউ ভাবিতে লাগিল যে কি ছলে তাহার স্বামীকে বশ করিতে পারে। এখন্ তাহার এই চিন্তাই বিশেষ প্রবল হইল। কিন্তু পিশাচী মেজবউ-এর তাহা অধিকক্ষণ ভাবিতে হয় নাই। পাঠক মহাশয় পরে জানিবেন মেজবউ তাহার কুটিলা বুদ্ধিতে কিরূপ কুটিল ছল ঘটনাক্রমে আনিয়াছিল সুতরাং আপাততঃ মেজবউ পূর্ব্বাপেক্ষা মনে অনেক শান্তিলাভ করিয়াছিল।

পঞ্চম ধাপ।

"সোণায় সোহাগা।"

মেজবউএর এইরূপে কিছু দিন কাটিল। কৃষ্ণলাল জমিদার সরকারের কোন' কার্য্যের জন্য মফঃস্বলে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইল সুতরাং মেজবউএর কার্য্যসিদ্ধিরও কিছুদিন বিলম্ব পড়িয়া গেল। প্রায় এক মাস পরে কৃষ্ণলাল মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মফঃস্বল হইতে আসিবার দুই তিন দিন পরে একদিন কৃষ্ণলাল বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, ডাকহরকরা তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রের মোহরে দেখিলেন নারাণপুর হইতে আসিয়াছে। পত্র পড়িয়া যাহা দেখিলেন তাহা অত্যন্ত ভয়ানক। আজ পাঁচ দিন হইল অকস্মাৎ ওলাউঠা রোগে মতিলালের মৃত্যু হইয়াছে। এ অশুভ সংবাদ তাঁহার সরল হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত করিল। মেজবউএর হৃদয় বড়ই ক্রুর ছিল, কিন্তু কৃষ্ণলালের হৃদয় আমরা এখন ক্রুর বলিতে পারিলাম না কারণ মতিলালের শোকে তাঁহার হৃদয়কে অতিশয় ব্যথিত করিয়াছিল। কিন্তু মেজবউ তাঁহার জন্য যে ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে সেই ফাঁদে পড়িয়া স্ত্রৈণ কৃষ্ণলালের এরূপ সরল মন যে তৎকালপর্য্যন্তও সরল থাকিবে তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। যাহাহউক মতিলালের অকালমৃত্যু তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিল। তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক-

ক্ষণ নীরবে বসিয়া রোদন করিলেন, কিন্তু আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না। মনের দুঃখ মনে মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

হায়! বিধাতার আজ এ কি বিপরীত বিধি হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না। ঘরের লক্ষ্মী আজ বিধবা হইল, বিধাতার কি বিড়ম্বনা! দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন আমরা ত ইহাই চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু পতি-সোহাগিনী ছোট বউএর উপর বিধাতার আজ এরূপ বিপরীত বিধি হইল কেন? ছোটবউ শুনিলে সে কি আজ জীবিত থাকিবে? না, তাহার এখন বিধবা হইবার সময়? চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকা বিবাহ কি তাহা জানিল না, স্বামী কে তাহা আজিও চিনিল না, স্বামীর সহিত একদিনের জন্যও সাক্ষাৎ করিতে অবসর পাইল না, কিন্তু হায়! বিধাতা তাহার বর্দ্ধিত মুকুল আজ অকালে অকস্মাৎ কেন ছিন্ন করিলেন? অনাথা পতিব্রতা বালিকা আজ বিধবা হইয়া দ্বারে দ্বারে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে ইহা চক্ষে দেখা যায় না। পাষাণ হৃদয়ও এ দুঃখে গলিয়া যায়।

আহা! ছোট বউ! তুমি আজ পথের কাঙ্গালিনী অপেক্ষাও দরিদ্রা, তুমি আজ মস্তকের প্রধান মণি হারাইলে, তোমার অনেক যতনের ধন আজ তোমার অজ্ঞাতসারে জলে বিসর্জ্জিত হইল তুমি কোন মতে ধরিয়া রাখিতে পারিলে না। তোমার পোড়া কপাল পুড়িল, তোমার প্রাণের পাখী, তোমার অনেক সাধের পড়াপাখী আজ তোমার হৃদয় পিঞ্জর অন্ধকার করিয়া উড়িয়া গেল তুমি কিছুই জানিতে

পারিলে না, ধরিবার জন্য একবার চেষ্টাও করিতে পারিলে না! তোমার অসাক্ষাতে দুষ্ট শমন তোমার ভালবাসার ধন হরণ করিল, তোমার স্নেহের পুত্তলিকে মৃত্তিকাসাৎ করিল, তোমায় জনমের মত দুঃখসাগরে ভাসাইল, তুমি ত তাহার কিছুই জানিলে না, তোমার যে আজ বিজয়াদশমী তুমি ত তাহা বুঝিতে পারিলে না? তুমি কোন্ প্রাণে আজ তোমার হৃদয়ধনকে জনমের মত বিদায় দিলে? তোমার কি কিছুই স্নেহ মমতা হইল না? যাহাহউক আমরা বলি তুমি এ অশুভ সংবাদ শুনিও না, তুমি তোমার নির্ম্মল পবিত্র দেহকে অপার যন্ত্রণার আধারস্থল করিও না, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখকে আদরের সহিত গ্রহণ করিও না। কিন্তু ছোট বউএর নিকট এই হৃদয়-বিদারক অশুভ সংবাদ আর অধিক দিন গোপন রহিল না। বড় বউ শুনিল, শুনিয়া শোকে অত্যন্ত অধীরা হইল। কৃষ্ণলালের জানিবার প্রায় পনর দিন পরে এক দিবস ছোট বউ তাহার মেজ্‌ঠাকুরের বিছানা গোছাইতে গোছাইতে বিছানার নীচে একখানি কাগজ পাইল, দেখিল সেখানি পত্র। পত্র দেখিলেই খুলিয়া পড়িতে ছোট বউএর বড়ই অভ্যাস ছিল সুতরাং ছোট বউ পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে আর বিলম্ব করিল না, কিন্তু এযে তাহার হৃদয়ঘাতী মর্ম্মা-ন্তিক পত্র, এযে তাহার মর্ম্মস্থানকে শক্তিশেলের ন্যায় বিদ্ধ করিবে তাহা সে জানিত না। পত্রখানি ছোট বউ খুলিয়া পড়িল। একি! এ যে ভীষণ দৃশ্য! এ দৃশ্য যে আর চক্ষে দেখা যায় না। অলঙ্কারাদি সমুদায় দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, দাঁতকপাটী ও মূর্চ্ছা, বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায়

ধূলায় পতিতা। সকলেই আসিয়া চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা পাইল। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য হইল। তাহার এই মূর্চ্ছা যদি চিরমূর্চ্ছা হইত তবে তাহার পক্ষে আজ বড়ই মঙ্গলের বিষয় হইত, কিন্তু তাহা হইল কৈ? তাহার অদৃষ্টে সে সুখ নাই আমরা কি করিব? যাহা হউক পতিসোহাগিনী, পতিরতা ছোটবউ পতির শোকে নিতান্ত অভিভূতা হইল। আজ তাহার শোক দুর্দ্দমনীয় হইল। তাই বলিতেছিলাম যদি আজ তাহার চৈতন্য না হইত তবে তাহাকে আর এই কঠিন বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু যাহা অদৃষ্টে আছে তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য? সকলই ঈশ্বরের হাত, তুমি আমি ভাবিয়া কি করিব? সকলেই ছোট বউকে বিস্তর বুঝাইল, বালিকার মন কিছুতেই বুঝিল না। সকলের প্রবোধ বাক্যই ভস্মে ঘৃত দেওয়ার ন্যায় বৃথা হইল। তাহার সেই শোকসন্তপ্ত হৃদয় প্রবোধ মানিল না, বালিকার শোকসাগর ক্রমশঃই উথলিয়া উঠিতে লাগিল, শরীর ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে লাগিল কেবল দেহ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। মনুষ্যের চিরদিন কখনই সমান যায় না! মানব-হৃদয় যদি জন্মাবচ্ছিন্নই শোকের বশীভূত থাকিত তাহা হইলে মনুষ্যকে ইহজনমে আর কখন সুখের মুখ দেখিতে হইত না।

ছোট বউ ক্রমেই শোক ভুলিতে লাগিল। ঈশ্বর সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য করেন এই ভাবিয়া ছোট বউ মনকে প্রবোধ দিতে পারিল। মেজবউও অবশ্য এ. বিপদ শুনিল শুনিয়া কেবল বাহিক শোকের চিহ্ন দেখাইল। তাহার অন্তরে আনন্দ-লহরী উথলিয়া উঠিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য!

কুটিলের কি সকলই কুটিল! মনের সঙ্গে সঙ্গে কি স্নেহ, মমতা সমুদায়ই কুটিলতার চিহ্ন প্রকাশ করে? ক্রূরমতী মেজবউএর পাষাণ-হৃদয় শোক কাহাকে বলে তাহা কি জানে না, তাহার মন কি পরের দুঃখে কাতর হয় না, তাহার অন্তরে কি অমৃত নাই? যাহাহউক এরূপ সাংঘাতিক অশুভ সংবাদেও মেজবউএর পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হৃদয় গলিল না। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও এক জনের মন পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন ধাতুতে নির্ম্মিত ছিল। পাঠক মহাশয় কি বুঝিলেন সে কে? সে আর কেহই নয় আমাদের পাষাণময়ী কুচক্রী জগদম্বা। প্রতিবাসী ও অপরাপর সকলেই শোকে অভিভূত হইল কিন্তু মেজবউএর স্বার্থের দিকে টানিতে গিয়া, মেজবউএর কিসে ভাল হয় তাহাই নিরন্তর ভাবিয়া জগদম্বার মন এমন নিদারুণ ঘটনায়ও অচল অটল রহিল।

এইরূপে একদিকে শোক, দুঃখে ও অপরদিকে আহ্লাদ, আমোদে বাঁড়ুয্যে সংসারের কিছু দিন অতীত হইল। বিপদ কখন একাকী আসে না, একটী বিপদ আসিলে অন্য প্রকারের নানা বিপদ তাহার অনুগামী হইয়া থাকে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিবস কৃষ্ণলাল বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন এমন সময় একখানি পাল্কি আসিয়া দরজায় থামিল। পাল্কির সঙ্গে একজন লোক বোধ হইল চাকর হইবে, আর ৪ জন বেহারা ও ভিতরে একজন মাত্র সওয়ার ছিল। পাল্কি দরজার সম্মুখে থামিতে দেখিয়া কৃষ্ণলাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি?"

চাকর অতি মৃদুস্বরে বলিল "বড় বাবু আজ ছয়দিন একেজ্বরী হইয়া আছেন। অজ্ঞান, অচৈতন্য উঠিতে পারেন না। আমরা অতি কষ্টে তাঁহাকে এখানে অনিয়াছি।"

মেজবাবু তৎক্ষণাৎ পাল্কির দরজা খুলিয়া দেখিলেন তাঁহার বড়দাদা বাস্তবিকই অজ্ঞানাবস্থায় পতিত, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, সংজ্ঞাহীন, চক্ষু মুদ্রিত, গাত্র অতিশয় উষ্ণ, শরীর শীর্ণ। তৎক্ষণাৎ বেহারাদিগকে বিদায় দিয়া দাদাকে তুলিয়া আনিতে চাকরকে বলিলেন। তখন সে তাঁহাকে তুলিয়া একটী বিছানার উপর শোয়াইয়া রাখিল। সকলেই ব্যস্ত, সকলেরই মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা হইল।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন "জ্বর অত্যন্ত কঠিন। বাতশ্লেষ্মা বিকার। একচল্লিশ দিন না গেলে এ রোগের বিশ্বাস নাই। ঔষধাদির যথাবিধি ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। রোগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া দুবেলা দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পনর দিন অতীত হইল, রোগের কিছুমাত্র উপশম হইতে দেখা গেল না। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ-বাক্যেরও সংযোগ হইল। রামলাল এখন আর লোক দেখিলে চিনিতে পারেন না। বড় বউ সর্ব্বদাই নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রুষা করেন, কৃষ্ণলাল ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা এবং বড়দাদার নিকটে থাকিয়া কিসে তাঁহার জ্বরের উপশম হয় তাহারই চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। হেম, কিশোরী তাহারা নাবালক সুতরাং তাহারা কেবল পিতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। মেজবউ একবার করিয়া কেবল বাহ্যিক দেখা দেখিয়া যাইত।

আজ ২০ দিন। হঠাৎ আজ সমস্ত অঙ্গ শীতল হইয়া গেল। নিশ্বাস অতি ক্ষীণ, নাড়ী ভয়ানক বলবতী, বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না। তৎক্ষণাৎ চাকরকে ডাক্তার আনিতে বলা হইল। ডাক্তার আসিলেন। মেজবউ, বড়বউ, সেথানে ছিল, জগদম্বা ছিল, প্রতিবাসীরাও অনেকে নিকটে ছিল, কৃষ্ণলাল নীরবে একস্থানে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, ছোট বউ এক-ধারে বসিয়া চক্ষের জলে পৃথিবী সিক্তো করিতেছেন, এমন সময় ডাক্তার কৃষ্ণলালকে ডাকিয়া বলিলেন "রোগীর অবস্থা এখন যেরূপ দেখ্ছি তাহাতে এযাত্রা রক্ষা পাওয়া কঠিন স্থতরাং আমি এই ঔষধ দিয়া যাই, যদি এই ঔষধ ধরে তবে জানিবেন যে এযাত্রা রক্ষা পাইলেন নতুবা সাক্ষাৎ শিব আসিলেও রক্ষা পাইবেন না। যদি ঔষধ ধরে তবে আমায় আবার ডাকিতে পাঠাইবেন।" এই বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ঔষধ দেওয়া হইল, ঔষধ ধরিল না। ক্রমেই শ্বাসরোধ হইয়া আসিল, জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হইল, আর কথা কহিতে পারেন না, প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল। রামলাল জনমের মত এপৃথিবী ত্যাগ করিয়া গেলেন। কেবল মরিবার সময় একবার জ্ঞান হইয়াছিল। সেই সময় এই কয়েকটী কথা বলিয়া গিয়াছিলেন;—

"দেখ ভাই কৃষ্ণ, সংসারের ভার তোমার উপর রহিল। আমার নাবালক ছেলে তিনটাকে তোমার ভরসায় রাথিয়া গেলেম দেখো তাহাদের যেন কোন কষ্ট না হয়। ছোট বউ বিধবা (মতিলালের মৃত্যুর বিষয় রামলালকে পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল) তাহাকে তাহার বাপের বাড়ীতেই

পাঠাইয়া দিও। তাহার যদি কোন কষ্ট না হয় তবে তাহাকে এইখানেই রাখিও। কেতকিনী বিধবা, সে যেন শ্বশুর বাড়ীতেই থাকে। আর কৃষ্ণা অবিবাহিতা, তাহাকে ভাল পাত্রে বিবাহ দিও। বিষয়ের যে দলিলাদি তাহা তোমারই হস্তে রহিল কারণ আমার পুত্রেরা নাবালক তাহারা কিছুই বুঝিয়া চলিতে পারিবে না। আর আমি কিছু বলিতে পারি না।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রামলালের মরিবার সময় সেখানে অনেকেই ছিল সুতরাং আর বলিতে হইবে না যে কৃষ্ণলালের প্রতি রামলালের উপদেশগুলি পাড়ার অনেকেরই সম্মুখে হইয়াছিল।

আজ মেজবউ ও জগদম্বা ভিন্ন অন্য সকলকেই শোক-সাগরে ভাসাইয়া রামলাল অনন্তলীলায় মাতিলেন। রাম-লালের মৃত্যুতে আজ সংসার ভিত্তিশূন্য হইল। নাবালক পুত্রগণ এতদিনে অল্পবয়সেই পিতৃহীন হইল। ছোট বউএর শোকের উপর শোক শেলসম বিদ্ধ হইতে লাগিল; কৃষ্ণ-লালের সরল মনে ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। সংসারে বিপদের উপর বিপদ হইল। বড় বউ এতদিনে মণিহারা ফণিনীর ন্যায় হইল, তাহার ভবিষ্যতের সুখের আশা জন্মের মত ফুরাইল। জগদম্বার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবার পথ পরিষ্কৃত হইল, আর কুটিলা, কলঙ্কিনী, পিশাচী, পাষাণহৃদয়া মেজ-বউএর "সোণায় সোহাগা" পড়িল।

ষষ্ঠ ধাপ।

সম্মুখ-সমর।

রামলালের মৃত্যুর পর কিছুদিন নানা গোলমালে কাটিল। তাঁহার পুত্রেরাও ক্রমে সাবালক হইয়া উঠিল। এখন হেমমোহনের বয়স ২৫ বৎসর, কিশোরীমোহনের বয়স ২২ বৎসর আর ললিতমোহনের বয়স ৮ বৎসর মাত্র। হেমমোহনকে তাঁহার খুড়া কল্যাণপুরের একটী গবর্ণমেণ্ট আফিসে ৩০৲ টাকা বেতনে চাকুরী করিয়া দিয়াছেন। কিশোরী ও ললিত আজিও স্কুলে পড়িতেছে। তিনজনের চরিত্রে কোন দোষ ছিল না। স্বর্ণময়ীকে এই সময়ে বাড়ীর চাকরাণী রাখা হইল। রামলালের সহিত যে চাকরটী আসিয়াছিল সে তাঁহার মৃত্যুর পরেই চলিয়া গেল। ছেলে তিনটীর উপর স্বর্ণময়ীর কিছু আন্তরিক স্নেহ জন্মিল। মেজ বউএর কন্যা কৃষ্ণার বয়স এখন ছয় বৎসর মাত্র। ললিতমোহন ও কৃষ্ণা প্রায় সমবয়স্ক ছিল সুতরাং প্রায়ই পরস্পর একত্রে থাকিত, একত্রেই খেলা করিত। মেজবউ তাহাদিগকে পরস্পর পৃথক্ রাখিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা পাইত কিন্তু তাহার সে চেষ্টা বিফল হইল। শিশুদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল না। শিশুরা একত্রে খেলা করিতে গেলে প্রায়ই ঝগড়া মারামারি করিয়া থাকে। একদিবস ললিতমোহন ও কৃষ্ণা খেলা করিতে করিতে কৃষ্ণা হঠাৎ দৌড়িয়া যাইতে পড়িয়া গেল। স্বর্ণময়ী দেখিতে পাইয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া তাহার মাতার

কোলে দিল। তাহার মনে কোনও পাপ ছিল না সুতরাং স্বর্ণময়ী কৃষ্ণাকে তাহার মাতার ক্রোড়ে বসাইয়া দিল। পড়িয়া গিয়া কৃষ্ণার এত অধিক আঘাত লাগিয়াছিল যে তাহার নাক ও মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, সে কাঁদিতে লাগিল।

মেজবউ কৃষ্ণাকে কোলে বসাইয়া বলিল "বলত মা তুমি কি প'ড়ে গিয়েছিলে? আহা বাছার আমার কি লাগাই লেগেছে, বাছা আমার আর কথা কইতে পারে না।"

তখন কৃষ্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দেখ্ মা এ—ই খেলা ক'ত্তে ক'ত্তে ন'লে আমায় ফেলে দিলে।"

পাঠক মহাশয়! কৃষ্ণা ললিতের নামে মিথ্যা কথা কহিবে ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়। মার পেটের মেয়ে ত বটে, মায়ের অপেক্ষা মেয়ের স্বভাব ভাল হওয়া কদাচ ঘটে সুতরাং মাতার নাম রাখিবার জন্য কৃষ্ণাও ললিতের নামে আজ মিথ্যা কথা কহিল। ছয় বৎসর বালিকার মুখনিঃসৃত সেই মিথ্যা কথা মেজবউ দৈববাণীর ন্যায় বিশ্বাস করিল। নিরপরাধী ললিত মেজবউএর নিকট আজ বিনাদোষে দোষী হইল। সংসারে বিষবৃক্ষের অঙ্কুর হইল। মেজবউ রাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বিষ-বৃক্ষও বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল।

মেজবউ বলিল "দেখ্ স্বর্ণময়ী এসব কি ভাল? যে যা'র ছেলেকে শাসন ক'ত্তে পারে না? আমার মেয়ে ত আর কা'রও কিছু করে নি যে সাতগতরখাকীদের ছেলে আমার মেয়েকে মেরে ফেল্‌বে?"

মেজবউএর এই কথা শুনিয়া স্বর্ণময়ী বলিল "দিদি! ছেলেয় ছেলেয় খেলা ক'ত্তে গেলে অমন ঝগড়া মারামারি

হ'য়েই থাকে, তার জন্য পইতিকে কি গাল্ দিতে আছে, পইতি কি ক'ল্লে? সে ত আর তোমার মেয়েকে মাত্তে শিখিয়ে দেয় নি? আর আমি ত সেখানে ছিলুম ন'লে ত ওকে মারে নি? ও ত আপনিই প'ড়ে গেছে, আমি এই স্বচক্ষে দেখিছি।"

স্বর্ণময়ীর কথাতে মেজবউ আরও রাগিল। রাগান্বিত স্বরে বলিল "নে, নে তোকে সাক্ষী দিতে আমি ডাকি নি। তোর মতন অমন ঢের ঢের স্বর্ণময়ী আমি দেখিছি, তুই যা নিজের চরকায় তেল দিগে যা।" এই বলিয়া যেখানে বড় বউ ও ছোট বউ বসিয়াছিল সেইখানে রায়বাঘিনীর মত গিয়া পড়িল। পাঠক মহাশয়কে বলিতে হইবে না যে জগদম্বাঠাক্রুণও সেইখানে সৌভাগ্য ক্রমেই বলুন আর দুর্ভাগ্য ক্রমেই বলুন উপস্থিত ছিল। মেজবউএর তৎকালীন মুখের ভাব দেখিয়া বড় বউএর অত্যন্ত ভয় হইল। বড় বউএর মনে কোন কোর্-কাপ ছিল না। ঝগ্ড়ার নামে তাঁহার গা কাঁপিত, যেখানে ঝগ্ড়া হইতেছে দেখিতেন তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতেন। তিনি কাহাকেও কখন একটী উচ্চকথা বলিতেন না মেজবউ অত্যন্ত কলহপ্রিয়া তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানিতেন ও কলহের পূর্ব্বে মেজবউএর প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্যও বুঝিতে পারিতেন সুতরাং মেজবউএর তখনকার ভাব গতিক দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইল।

মেজবউ কর্কশস্বরে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল "তোমরা যারই খাও তারই বুকে ব'সে দাড়ি ছেঁড়? যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙ্গ দাঁতের গোড়া! তোমাদের কি একটুও আক্কেল

নাই, একরত্তি বিবেচনা নাই! এমন বেআক্কিলে মানুষও ত কোথাও দেখি নাই গা! এমন সংসারে এসে আমি পড়িছিলুম যে আমার হাড়টা জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খেলে, মরণ হ'লেই বাঁচি, হাড়ে বাতাস লাগে। এত লোককে যমে নিতে পারে আর আমায় কি একেবারেই ভুলে রয়েছে নাকি? এমন অসইরোণ সওয়া যায় না। গতরখাকীদের ছেলেগুলো যেন বয়ারের পাঁড়। ভালখাকী ভালর মাথা খাও, অমন ছেলেদের মাথা খেয়ে আঁটকুড়ো হ'য়ে থাক সেও ভাল। আসুক বাড়ী এর যা বিহিত হয় ক'র্ব্বো।'

জগদম্বা যেন আগাগোড়া কিছুই বুঝিতে পারে নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া অতি ত্রস্তভাবে বলিল "কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে? এর মধ্যে ব্যাপারটা কি হ'লো যে তুমি এত মহাভারত পাঠ ক'চ্ছো?"

মেজবউ বলিল "কি আর বল্‌বো বলো, ব'ল্লেই বল্‌বে যে মেজবউই মন্দ। আরে মেজবউ মন্দ কি কে মন্দ তা সেই ওপরওয়ালা যিনি তিনিই সব জানেন। দেখ দিদি, ঐ গতরখাকীর বয়ারের মত ছোট ছেলেটা, ওগো ছেলেটার গায়ে যে জোর গো দুটো বাঘে খেতে পারে না। সেইটে আমার মেয়েটাকে এমনি ফেলে দিয়েছে যে মেয়েটা আমার মারা যাবার যো হ'য়েছিলো আর কি! মেয়েটার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিলো, অনেক কষ্টে মুখে চ'কে জল দিতে দিতে অনেকক্ষণ পরে তবে তার জ্ঞান হয়। আর ঐ ভালখাকী ওর ভালর মাথা খেয়ে একটা চাকরাণী রেখেছে সেটাও আবার তারে বাড়া, বাঁশের চেয়ে

আবার কোষ্ঠী টন্‌কো। সেটা আবার বলে কিনা আমার মেয়ে নাকি আপনি প'ড়ে গেছে। দিদি! তুমিই বলো দেখি এতে কা'কে কি বল্‌তে ইচ্ছে করে? যা'ক্ আমি আর ব'লে কি ক'র্ব্বো, আসুক বাড়ী তাকে ব'লে যা সুপরামর্শ হয় তাই ক'র্ব্বো।"

জগদম্বা বলিল "আমি আর কি বল্‌বো বলো। তোমাদের কথায় আমি থাক্‌বো না। পরের কথায় থেকে কেন মিছা-মিছি নিমিত্তের ভাগী হবো বলো। আমাকে বল্‌তে গেলে দুইপক্ষ হ'য়ে কথা কইতে হয়। আমার ত আর কেউই পর নয়? তোমরা তিনজনই আমার কাছে সমান, তাই বল্‌ছি যে আমি আর এতে কি বল্‌বো বলো। যা হ'ক এখন দুপুর-বেলা চুপ্ কর। আবার এখুনি একখানা হ'য়ে বস্‌বে, গেরোর ফের বলা ত যায় না, হ'তে কতক্ষণ যায় বলো?"

মেজবউ তখন মায়াকান্না কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দিদি! চুপ্ ক'র্ব্বো কি বলো, চুপ্ ক'ল্লে আমার মান থাকে না। কি জান, কথাতেই কথা বাড়ে, বল্‌তে গেলে অনেক কথা এসে পড়ে। কেন দিদি, তুমি কি জান না? শুনেছ ত? ঐ ছোট্-ঠাকরুণটী যে দেখ্‌ছো, উনিও বড় কম নন্, উনিই আমার নামে সে দিন পাড়াময় কলঙ্কের ঢোল বাজিয়ে বেড়িয়েছেন, কি, না আমি চাকরের সঙ্গে কথা কয়েছিলুম। আরে, কয়েছিলুম তা তোদের কি? তোদের এক-চালায় আমি ঘর করি? না তোদের খাই, না তোদের প'রি? আমি ত তোদের কিছুতেই নেই, তবে তোরা কেন আমার সর্ব্বনাশ ক'ত্তে বসেছিস্? আবার তা'ই নিয়ে কতখানা ক'রে

সাজিয়ে তিল্‌কে তাল ক'রে সকলের কাছে লাগিয়েছেন। আরে, লাগিয়ে আমার কি ক'র্ব্বি? আমায় কি ভয় দেখাস্? মনে করিছিস্ আমি তোদের ভয়ে যুযু হ'য়ে ব'সে থাক্‌বো তা মনেও করিস্‌নি। এই ত কলঙ্ক র'টিয়ে কি আমার কিছু ক'ত্তে পেরেছিস্ বল্‌তে পারিস্? আর বড়্‌ঠাকরুণ তাইতে বলেন কি, না আমি ওঁর ছেলেদের দেখ্‌তে পারি না, শাপ দি, মন্বি দ্দি, মেরে ফেল্‌তে যাই, আর ওঁর ছেলেগুলি সব ভাল, তারা কিছুই জানে না, ভাজা মাছটা উল্‌টে খেতেও জানে না। যা'ক এখন দুপুর বেলা আর মিছা অরণ্যে রোদন ক'রে কি হবে, বাড়ী এলে এর্ যা হ'ক একটা বিহিত ক'রে তবে আমি জল খাব।”

বড় বউ এতক্ষণ চুপ্ করিয়াই ছিল, আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল “দেখ মেজবউ, বিহিত আর কি ক'র্ব্বে বাছা, না হয় তাড়িয়ে দেবে, তা যার জীব তিনিই তাদের আহার দেবেন, তার জন্য আমরা ভাবি নে। আমাদের যদি এমন অদৃষ্টই না হবে তবে তেমন স্বামীই বা আমার যাবে কেন, ছোট্-ঠাকুর্‌পোই বা আমাদের ফাঁকি দেবে কেন? যা হ'ক যা বল্‌বার হয় আমাকেই বলো, আমার গুঁড়ো তিন্‌টীকে কেন গাল্ দেও বল দেখি বাছা? তাদের গাল দিয়ে কি তোমার পরকালের কিছু ভাল হবে? আর ছেলেয় ছেলেয় মারামারি এ তো হয়েই থাকে তাতে রাগ ক'রে আমাদের যা মুখে এলো তাই ব'লে গাল দেওয়া কি তোমার ভাল হ'ল না এতে তোমার কিছু পৌরুষ বাড়্‌লো? বলো, ঈশ্বর তোমায় বল্‌তে দিন দিয়েছেন বল্‌বে না কেন বলো। যে

দিন আমার তেমন দেবতুল্য স্বামী গেছে সেইদিন থেকেই আমি জেনেছি যে আমার জীবনের সুখ, আমার আশা ভরসা সেই সঙ্গেই ইহজনমের মত বিদায় নিয়েছে।" এই বলিয়া বড় বউ আর কিছু বলিতে পারিল না ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঝগড়া শুনিয়া পাড়ার যাহারা সেখানে আসিয়াছিল সকলেই বড় বউএর কান্নায় কাঁদিল। কেবল নিষ্ঠুরা জগদম্বা কাঁদিল না, আর কলহপ্রিয়া মেজবউও বড় বউএর কান্না দেখিয়া চুপ্ করিল না বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক স্বর বাড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া কলহে প্রবৃত্তা হইল।

পাড়ার কেহ কেহ মেজবউএর এইরূপ হাত মুখ নাড়া দেখিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল "মেজবউ তুমিই বা কেমন মেয়ে বাছা, তোমার কি একটু চুপ্ ক'ত্তে নাই? তুমিই কি এই পির্থিবীতে এত ভাতারের সো হয়েছ যে কেউ তোমায় কিছু বল্‌তে পার্‌বে না, আর তুমি একটা অনাথা বিধবাকে যা ইচ্ছে তাই বল্‌বে? যাকে বল্‌ছো সে ত কৈ তোমায় একটী উচ্চকথাও কয় নি। তাই আমরা তোমায় যোড়হাত ক'রে বল্‌ছি, তোমায় ব্যাগেত্তা করিছি তুমিই না হয় আমাদের দশ জনের খাতিরে একটু চুপ্ ক্'রে যাও, আর বাড়াবাড়ি ক'রো না।"

এই কথা বলিয়া সকলেই সেখান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় কৃষ্ণলাল আসিলেন। ব্যাপারখানা সকলই আগাগোড়া শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। তিনি আজিও যে কৃষ্ণ-

লাল সেই কৃষ্ণলালই আছেন, সুতরাং ঝগড়ার আগাগোড়া শুনিয়া তাঁহার আর কথা সরিল না। মেজবউও অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া বলিতে কসুর করেন নাই কিন্তু কৃষ্ণলালের সরল মনকে এক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না। কৃষ্ণ-লাল উভয় পক্ষকে সমভাবে তিরস্কার করিয়া কলহের যবনিকা ফেলিলেন, বেশীর মধ্যে মেজবউকে গুটিকত শক্ত কথা বলিয়াছিলেন, সেই শক্ত কথা গুলি মেজবউএর গাঁটে গাঁটে শেলসম বিদ্ধ করিয়াছিল। মেজ বউ অভিমানে ও দুঃখে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল, আর জগদম্বা তাহার মনস্কামনা সিদ্ধির সুত্রপাত হইয়াছে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সপ্তম খাপ।

স্বামী ও স্ত্রী।

রাত্রি আটটার সময় কৃষ্ণলাল অতি ত্রস্তভাবে ডাকি-লেন, "মেজ বউ, মেজ বউ, বিরজা দরজাটা খোলো।"

মেজ বউ তখন আগাগোড়া লেপমুড়ি দিয়া চুপ করিয়া শয়ন করিয়া আছে, নিদ্রা নাই। কৃষ্ণা নিকটে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। বড় বউ, ছোট বউ সকলেই যে যার ঘরে নিদ্রিতা। মেজ বউ, মেজ বউ করিয়া কৃষ্ণলাল অনেক ডাকিলেন কোন উত্তর পাইলেন না। দরজায় ধাক্কা দিলেন দরজা খুলিল না। আবার ডাকিলেন ' মেজ বউ, মেজ বউ ও মেজ বউ, কেউ কি ঘরে নাই নাকি? কি আশ্চর্য্য!

বাহিরে হিমে আমার প্রাণ যায় যে, দরজাটা খোলো, দেখি ব্যাপারটা কি ?" তথাপি কোন উত্তর নাই। কে বা উত্তর দিবে আর কেনই বা দিবে ? আজ মেজবউএর্ মান-ভঞ্জনের পালা, পায়ে ধরা ভিন্ন তাঁহার আর গতি নাই।

দরজায় দাঁড়াইয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিল, কিন্তু ক্রূরা মেজবউএর্ মনে কোন কষ্টই হইল না। তাহার স্নেহ, মমতা স্বামীভক্তি লজ্জা পাইয়া বিদায় লইয়াছে সুতরাং মেজ-বউএর্ মনে কষ্ট হইবে কেন ? কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য আস্তে আস্তে দরজাটী খুলিয়াই আবার লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। দরজা যে খোলা হইল কৃষ্ণলাল জানিতেও পারিলেন না। তিনি আবার সজোরে দরজায় ধাক্কা মারিলেন, দরজা খুলিয়া গেল। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর দরজা খোলার শব্দে ছয় বৎসরের বালিকা কৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল, কিন্তু মেজ বউ জাগিল না। কপট নিদ্রা হইতে জাগরিত করা কাহারও সাধ্য নাই। কৃষ্ণলাল মেজবউএর কপট নিদ্রা সহজে ভাঙ্গাইতে পারিলেন না। মেজ বউ আপাদ মস্তক লেপমুড়ি দিয়া সমভাবেই আছে দেখিয়া কৃষ্ণ-লালের মনে অত্যন্ত ভয় হইল। হঠাৎ নিকটে যাইতে শীঘ্র সাহস হইল না। পূর্ব্বদিনের ঝগড়ার কথা আগাগোড়া মনে হইতে লাগিল। মেজবউএর্ প্রতি কর্কশবাক্য প্রয়োগ স্ত্রৈণ স্বামীকে বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যন্ত ব্যথিত করিল। মনে মনে ভাবিলেন মেজ বউ বুঝি আত্মহত্যা করিয়াছে। সেই ভয়ে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল ! তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

কৃষ্ণলাল অনেকক্ষণ নীরবে সেই স্থানে মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। আপাততঃ কি করিলে ভাল হইবে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পাষাণী মেজ বউ জাগিয়া জাগিয়া সকলই দেখিল, স্বামীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা সকলই বুঝিতে পারিল, স্বামীর তখনকার শোচনীয় অবস্থার কারণ সকলই জানিতে পারিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহার হৃদয়, সেই নিষ্ঠুরা, পতিঘাতিনী, সংসারনাশিনী মেজবউএর হৃদয় আসন্ন বিপদগ্রস্ত স্বামীর প্রতি ভ্রমেও একবার চাহিল না।

কৃষ্ণলাল তখন অনন্যোপায় হইয়া ধীরে ধীরে শয্যার পার্শ্বে গেলেন, তাহার মুখের লেপ খুলিলেন, দেখিলেন বাচিয়া আছে কিন্তু মৃতার ন্যায় নীরবে নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে। কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে দুই হস্তে মেজবউএর পদযুগল ধারণ করিলেন। মেজ বউ তাহার হস্ত হইতে পা ছাড়াইতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই ছাড়াইতে পারিল না। কৃষ্ণলাল কর্ত্তৃক আজ মেজবউএর মানভঞ্জন হইল। এবার অনেকক্ষণ পরে মেজ বউ মুখ খুলিল, স্বামীর সহিত অনেকক্ষণ পরে কথা কহিল।

বিরজা কপট ক্রন্দনস্বরে বলিল "এখন গোড়া কেটে আগায় জল দিতে এসেছ কেন? আমি কারও খেতে চাই না, কারও প'ত্তে চাই না কারও সংসারে থেকে এমন ক'রে জ্বালা যন্ত্রণা সইতেও চাই না। আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও, সেখানে তারা অবশ্য আমায় দুটী ভাত দিতে

পার্‌বে, তারা গরিব দুঃখী নয়। আর তারা না দিতে পারে এখানে থেকে অপমান সহ্য করার চেয়ে আমি পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াই সেও ভাল, তাতেও আমার দিন সুখে কাট্‌বে। এত মুখ নাড়ার ভাত খাওয়া অপেক্ষা গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল। তুমি তোমার ভাইপো আর ভাজেদের নিয়ে সুখে ঘর সংসার কর। আমি মন্দ, আমি কুঁদুলে, কুঁদুলে লোকের সংসর্গে থেকে তোমরা কেন দোষের ভাগী হবে বল। আমার মত লোকের পৃথিবীতে থাকা কেবল পাপের বোঝা বওয়া বৈত নয়। আমি বেঁচে থাক্‌লিই কিম্বা তোমার নিষ্পাপ সংসারে থাক্‌লিই সকলের সঙ্গে ঝগড়া ক'র্ব্বো আর সকলকে জ্বালাতন ক'র্ব্বো সুতরাং এমন অবস্থায় আমার স'রে যাওয়াই ভাল। সংসারের আর সকলেই ভাল তাদের নিয়ে তুমি সুখে আছ একথা শুনেও আমি যেখানে থাকি সেই খানেই সুখে থাক্‌তে পার্‌বো। আমার একটা মেয়ে তাকেও কেউ দেখ্‌তে পারে না। সেটা ম'লে তুমি বাঁচ, সেটাও বাঁচে আর এ পোড়া সংসারের সকলেই বাঁচে। এই সংসারে থেকে তার কেবল ঘাড় পেতে অমঙ্গল নেওয়া বৈত নয়। এই সেদিন খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়ে মেয়েটাকে আমার মেরেই ফেলেছিলো আর কি! ভাগ্যে একটু গুঁড়া কাকে খেয়েছিলো, খেয়ে সেটা যখন ম'রে গেল তাই আমি তখন জান্‌তে পাল্লুম নইলে আমি কি আর আমার মেয়েটাকে পেতুম। আমি মানে মানে এই বেলা মেয়েটাকে তার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পাল্লে বাঁচি। আর আমি, আমার আত্মহত্যাই আমার পক্ষে এ

সময় প্রধান ঔষধ। আমার স্বামী যে তুমি, তুমিও আমার দুঃখে দুঃখী নও। এমনি অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলাম যে স্ত্রীলোকের জীবনের একমাত্র অবলম্বন যে স্বামী সেও আমার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল না, সেও আমার কষ্ট দেখিয়া অনায়াসেই নিশ্চিন্ত থাকিল। বল দেখি তবে আর আমার বেঁচে থেকে লাভ কি ?"

কথাগুলি কৃষ্ণলাল একমনে বসিয়া শুনিলেন। শুনিয়া কি বলিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া রহিলেন। আত্মহত্যা !!! স্ত্রৈণ কৃষ্ণলালের প্রাণে আত্মহত্যা কথা নিদারুণ আঘাত করিল। তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। কৃষ্ণাকে বিষপ্রদান এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও সত্য ভাবিয়া তখন কিছুক্ষণের নিমিত্ত ক্রোধকে হৃদয়ে স্থান দিলেন। তাঁহার সরল হৃদয়ে তৎকালে ক্রোধ এবং চিন্তা যুগপৎ আসিয়া তাঁহাকে যার পর নাই অস্থির করিল।

কৃষ্ণলাল অনেকক্ষণ পরে তখনকার সে ভাব অতি কষ্টে গোপন করিয়া বলিলেন "বিরজা! ব্যাপারখানাটা কি ? আমি ত সেদিনের ঝগড়ার কারণ আগাগোড়া কিছুই শুনি নাই, সেদিন ঝগ্ড়া হ'লো কেন বল দেখি।" কৃষ্ণলাল সেই দিনেই ঝগ্ড়ার আগাগোড়া সমস্তই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আবার মেজবউএর্ মুখ হইতে শুনিবার জন্য উপরিউক্ত প্রশ্ন মেজবউএর্ প্রতি করিলেন।

বিরজা তাহার স্বামীর মন তাহারই উপরে ঝুঁকিয়াছে তাহা অনুমানে কতকটা বুঝিতে পারিয়া বলিল "কেন,

তুমি কি কিছুই জান না? না, জেনে ন্যাকামো করা স্বভাব তাই একটু ন্যাকামো ক'রে দেখ্‌ছো? আমি ত আর মিথ্যা কথা বল্‌ছি নি যে আমার মন জান্‌তে এসেছ? যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তবে জগদম্বা দিদি ত সেখানে ছিল তা'কে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেই ত পার্‌বে সে ত আর মরে নি! তার তিনকাল গেছে এককালে ঠেকেছে সে ত আর কারও নামে মিথ্যা কথা বল্‌বে না।"

কৃষ্ণলাল এই কথা শুনিয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন "হয়েছে কি ছাই বল না, এত ভূমিকার প্রয়োজন কি? আমি তোমার কথা অবিশ্বাস ক'র্ব্বো একথা ত আর বলি নি, তবে আর অনর্থক কেন আমায় দোষী ক'চ্ছো?"

মেজ বউ কিছু বিরক্তস্বরে বলিল "হবে আর কি? সেদিন ন'লেতে আর কৃষ্ণাতে খেলা ক'চ্ছিল, খেলা ক'ত্তে ক'ত্তে ন'লে আমার কৃষ্ণাকে এমনি ফেলে দিছ্‌লো যে তার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত বেরুতে লাগ্‌লো। সে রক্ত কি আর থামে, রক্ত দেখে আমার প্রাণ শুকিয়ে গিছ্‌লো, মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে মারা যাবার যো হয়েছিল আর কি; অনেকক্ষণ মুখে চ'খে জল দিতে দিতে তবে মেয়েটার জ্ঞান হ'লো। সেই কথা বলিছিলুম ব'লে, ওমা ওরা কিনা সকলে প'ড়ে যা'র যা মুখে এলো তাই বলে আমাকে গাল্ দিতে লাগ্‌লো। অপরাধের মধ্যে আমি বলিছিলুম যে ন'লে আমার মেয়েটাকে মেরে ফেল্‌তে গিছ্‌লো। ওদের সেই স্বর্ণময়ী নামে চাক্‌রাণীটে, সেটা আবার তাদের হ'য়ে কত ঝগড়া ক'ল্লে? কেন গা আমার

কি দড়ি জোড়ে না? আমাকে চাকর চাকরাণীতে পর্য্যন্ত অপমান ক'র্ব্বে আর আমি চুপ্ ক'রে স'য়ে থাক্‌বো? কেন আমার কি কেউ নেই? এমন ক'রে চাকরাণীর কাছে অপমান হওয়ার চেয়ে আমার মরাই ভাল। আবার সেদিন আমার মেয়েটাকে বিষ থাইয়ে মেরে ফেল্‌তে গিছ্‌লো। কেন আমার মেয়ে কি তাদের সংসারের কণ্টক নাকি?"

প্রখরা মেজ বউ নানাপ্রকার অলঙ্কার দিয়া তিলকে তাল করিয়া, বড় বউএর্ উপর নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া স্ত্রৈণ স্বামীকে বশে আনিলেন। কৃষ্ণলাল আজ স্ত্রীর অলঙ্কার দিয়া সাজান কথায় বিশ্বাস করিয়া তৎসমুদায়কে গুরুমন্ত্র জ্ঞান করিয়া সংসারের বন্ধন ছেদন করিতে বসিলেন। আজ কৃষ্ণলাল আর সে কৃষ্ণলাল নাই। দু মিনিট পূর্ব্বে যে হৃদয় অমৃতময় ছিল এখন রমণীর ছলনায় ভুলিয়া তাঁহার সেই অমৃতময় হৃদয়কে গরলে পরিপূর্ণ করিলেন।

কৃষ্ণলাল অনেকক্ষণ মনে মনে কি ভাবিয়া বলিলেন "বিরজা! তুমি যা বলিলে আমি সকলই বিশ্বাস করিলাম। এখন বল দেখি কি করিলে তুমি সুখী হও?"

এইবার কুটিলা মেজ বউ কুড় পাইয়াছে আর যায় কোথা? সিংহকে আজ অনায়াসেই ফাঁদে ফেলিল, নদীর স্রোতকে আজ সামান্য বায়ুবেগে ফিরাইল। তেমন পবিত্র বিশুদ্ধ হৃদয়কে আজ এক ফোঁটা গোমূত্রে নষ্ট করিল। মেজ বউ দেখিল তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবার পথ হইয়াছে।

তখন চুপে চুপে ধীরে ধীরে মেজ বউ বলিল "দেখ সংসারের সকলকে পৃথক্ করিয়া দেও। তাহ'লে আমায়ও আর এত জ্বালা যন্ত্রণা সইতে হবে না, তুমিও সুখী হবে, সুখে সচ্ছন্দে সংসার চালাতে পার্‌বে। সংসারের আর কোন কষ্টই থাক্‌বে না। কা'রও সঙ্গে ঝগড়া কিচ্‌কিচিও আর তাহ'লে ক'ত্তে হবে না। বড়্‌ঠাকুর ত মর্‌বার সময় সকলের সুমুখেই ব'লে গেছেন যে তুমিই সকল বিষয়ের অধিকারী সুতরাং দলিলখানি কোনরূপে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে নিজের নামে রেজেষ্টারি ক'রে ন্যাও তা হ'লেই তুমি সকল বিষয়ের অধিকারী হ'তে পার্‌বে, সংসারেও সুখের সীমা থাক্‌বে না।" ইহা ছাড়া জগদম্বা যে যে কথা বলিয়া গিয়াছিল সেই সমুদায় কথা একটী একটী করিয়া বলিয়া কৃষ্ণলালকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিল।

কৃষ্ণলাল সকলই শুনিলেন। এরূপ নিদারুণ কথা শুনিয়া কৃষ্ণলাল প্রথমতঃ শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। একদিকে তাঁহার স্ত্রীর বিষণ্ণভাব, আত্মহত্যা ও কন্যাকে বিষপ্রদান ও অন্যদিকে বড় বউএর অমায়িকতা, ভাইপোদের সদ্‌গুণ ও রামলালের অন্তিমকালের সদুপদেশ তাঁহার মনকে কিছুক্ষণের জন্য আন্দোলিত করিতে লাগিল। তিনি উভয়সঙ্কটে পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে নিষ্ঠুরা চিন্তা তাঁহাকে নিষ্ঠুরতার দিকেই লইয়া গেল। স্ত্রীর বিষণ্ণভাবই তাঁহার তৎকালীন স্ত্রীদুঃখকাতর হৃদয়কে জয় করিল। মেজবউএর্‌ কুটিল পরামর্শকেই সৎপরামর্শ

বলিয়া স্থির করিলেন। ভাইপোদের সদ্গুণ, বড় বউএর্ অমায়িকতা, রামলালের সদুপদেশ কিছুকালের জন্য হৃদয় হইতে বিদায় দিয়া পরদিন মেজবউএর্ নিদারুণ পরামর্শ হেমের কর্ণগোচর করিলেন। কলঙ্কিনী মেজবউএর্ কুহকে পড়িয়া স্বার্থের দিকে টানিলেন কিন্তু নিরাশ্রয় পিতৃহীন ভাইপোদের যে অবস্থা কি হইবে তাহা একবারও ভাবিলেন না।

অষ্টম খাপ।

মায়ে পোয়ে।

সন্ধ্যার পর কাঁদিতে কাঁদিতে হেমমোহন বলিল "মা এখন উপায় কি? কাকা ত ভিন্ন হবেন বল্‌ছেন, আমাদেরও ত এখন অবস্থা এই, বাবা মর্‌বার সময় ঠাকুরদাদার বিষয়ের এক পয়সাও দিয়া যাইতে পারেন নাই। আমার ত্রিশটী টাকার উপর ভরসা ছিল, মনে ক'রেছিলাম আপাততঃ তা'ইতেই কষ্টে সৃষ্টে এক রকম ক'রে চল্‌বে কিন্তু তা'তেও কাকা বাদ সাধ্‌তে ব'সেছেন, তা'ও কাকার প্রাণে সইল না। কাকা সাহেবের নিকট আমার সম্বন্ধে নানাপ্রকার দোষ দেখাইয়া আমার চাকরীটি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইবার চেষ্টা দেখিতেছেন। বিষয়ের কিছুই আমরা পাইলাম না। উকীল মোক্তার সকলেই বলিল যে আমাদের এমন কোন উপায় নাই যে আমরা দলিল পাইতে পারি। বাবা মর্‌বার সময় পাঁচ জনের সম্মুখে আমাদিগকে কাকার ভরসায়

রাখিয়া গিয়াছেন ও সেই অবধি কাকাই খরচ পত্রাদি চালাইঁতেছেন। বিষয়ের দলিল দস্তখত সমুদায়ই তিনি লইয়াছেন সুতরাং তাহা পাইবার আমাদের আর কোন উপায় নাই কারণ কাকা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আমাদের সিকি পয়সাও দিবেন না, নিঃসম্বল হইয়া আমাদিগকে এখান হইতে যাইতে হইবে। আর বাবারই বা দোষ কি? তিনি ত জানিতেন না যে কাকা আমাদের এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া অকূলপাথারে ভাসাইবেন, আমাদের পথের ভিখারী করিবেন, জনমের মত আমাদের উন্নতির সোপান ভগ্ন করিবেন। আমরাও স্বপ্নে কখন ভাবি নাই যে তেমন মাটীর মানুষ কাকা কুচক্রীর চক্রে পড়িয়া আপনকে পর ভাবিয়া এমন সোণার সংসারকে শ্মশানের ন্যায় করিবেন, এমন স্বর্গের প্রতিমা গুলিকে সমুদ্রজলে বিসর্জ্জন দিবেন, এমন রামরাজত্বকে রাক্ষসের আবাসস্থান করিবেন। কাকারই বা দোষ কি? মেয়েমানুষই সংসার ভাঙ্গিবার মূল, তা না হ'লে কৈকেয়ীর পরামর্শে রামচন্দ্র রাজা হইবার উপক্রমে কেন চৌদ্দবৎসরের জন্য বনে যাবেন?"

বড়ীমা! বিনাদোষে আজ কাকার মনে এমন অসৎ-বুদ্ধির পরামর্শ কেন দিলে! কেন আজ সংসার-ক্ষেত্রে বিষ-বৃক্ষের বীজ রোপণ করিলে! কেন আজ কাকার তেমন নির্ম্মল এবং সর্ব্বপ্রশংসিত চরিত্রকে অপবিত্র ও ঘৃণার আধার-স্থানীয় করিতে উদ্যত হইলে? এই বলিতে বলিতে হেমমোহন আর কথা কহিতে পারিল না, দুই চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

হেমের মাতা তাহার পুত্রের ক্রন্দন দেখিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পুত্রের ক্রন্দন পুত্রবৎসল মাতার প্রাণে অসহ্য হইল। কোথায় তিনি হেমকে সান্ত্বনা করিবেন, না হেমের ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয়বন্ধন আরও শিথিল হইতে লাগিল। তিনি দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন। মাতৃবৎসল এবং ভ্রাতৃস্নেহের আদর্শস্বরূপ কিশোরীর প্রাণও থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় ছিল ললিত তাড়াতাড়ি আসিয়া মায়ের ক্রোড়ে বসিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল "মা 'তুমি এমন ক'রে কাঁদ্‌ছো কেন? মা, আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে আমায় কিছু খেতে দেও না। তুমি অমন ক'রে কাদছো কেন মা? তোমার কি হয়েছে? আমরা এমন সোণার চাঁদেরা থাক্‌তে তোমার আবার কষ্ট কি মা? অমন ক'রে কাঁদ ত এই আমি চল্লুম।"

আট নয় বৎসর বয়স্ক বালক ললিতের মুখে এরূপ মধু-মাখা প্রবোধবাক্য শুনিয়া মায়ের প্রাণ তত দুঃখের সময়েও কথঞ্চিৎ সুখবোধ করিল। ললিতের হাতে একটী পয়সা দিয়া বলিলেন "যাও বাবা খেলা করগে, দেখো বাবা যেন কৃষ্ণার কাছে যেও না।"

ললিত বলিল "না মা আমি তার কাছে আর যাব না" বলিয়া ললিত চলিয়া গেল।

হেমের মাতা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে হেমকে বলিলেন "বাবা এ সংসারে টাকা বড় মহিমার জিনিস। ছার টাকার জন্য কেহ বা কাঙ্গালের ন্যায় পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে আবার সেই টাকার প্রভাবে কেহ কেহ এই পৃথিবীকে শরার

ন্যায় দেখিতেছে, দীন দুঃখীদের প্রতি একবার ভ্রমেও চাহিয়া দেখিতেছে না। এই টাকার জন্যই জেনো আপনার লোক পর হয়। পৃথিবীর যেখানে যাও সেই খানেই কেবল শুনিবে টাকা, টাকা, টাকা। কাহারও মুখে টাকা ভিন্ন আর কোন কথাই নাই। এই ছার টাকার জন্যই তোমার কাকা আমাদের পর ভাবিল, টাকার জন্যই আমাদের অবস্থার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিল না। কিন্তু বাবা এটা নিশ্চয়ই জেনো যে অদৃষ্ট লোকের সঙ্গে সঙ্গেই যায়। আমাদের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা খণ্ডন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। আর আমাদের পথের ভিখারী ক'রে তোমার কাকার অদৃষ্টও কত ভাল হয় তাহাও আমরা দেখিব। যাহাহউক বাবা, পরমেশ্বর অবশ্য আমাদের মঙ্গল করিবেন। পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্টবস্তুর প্রতি যাহা কিছু করেন সকলই মঙ্গলের জন্যই করেন অতএব অবশ্যই তিনি আমাদের ভবিষ্যতে মঙ্গলের জন্যই তোমার খুড়ীর হৃদয়ে এরূপ নীচপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি কি আমাদিগকে অনাথা দুঃখী বলিয়া আমাদের প্রতি দয়া করিবেন না? আমাদের প্রতি একবারও তাকাইবেন না? এই বিপদের সময়ে তিনিই আমাদের একমাত্র সহায়।" এই বলিতে বলিতে হেমের মাতা আবার দুই চক্ষের জলে পৃথিবী সিক্তা করিলেন।

স্বর্ণময়ী এমন সময়ে আসিয়া দেখিল সকলেই কাঁদিতেছে, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "ব্যাপারখানা কি? তোমরা কাঁদ্‌ছো কেন? সকলেই যে একেবারে কেঁদেই আকুল, কাজ

কর্ম্ম সব গেল, কেবল ব'সে ব'সে কাঁদ্‌ছো আর চক্ষের জল ফেল্‌ছো? এমন বৎসরকার দিন চ'কের জল ফেল্‌লে যে অমঙ্গল হয়। তোমার এই তিনটী গুঁড়ো বেঁচে থাক্‌তে তোমার আবার দুঃখ কিসের যে কেবল ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ছেলে তিনটের অমঙ্গল ডাক্‌ছো। সারাদিন কেবল কান্না, কান্না, কান্না। খেয়ে দেয়ে কি আর কোন কাজ নাই কেবল কেঁদেই দিন কাটাবে? এই যে আবার তোমার কান্নায় দাদা-ঠাকুর পর্য্যন্ত কাঁদ্‌ছেন। লোকের উপযুক্ত ছেলে ম'লেও ত লোক এমন ক'রে ব'সে ব'সে রাত্‌দিন কাঁদে না। কাকা ভিন্ন ক'রে দেবেন তাতে আবার এত কান্না আসে কেন? তোমার এই তিনটে গুঁড়ো নিয়ে তুমি যেখানে যাবে সেখানেই আদর পাবে। এ রত্ন যার আছে তার আবার কান্না আসে? ধন্নি তোমার কান্না যা হ'ক, ভ্যালা কাঁদ্‌তে শিখেছিলে? মা! আমি তোমার পর নই আমার যা আছে তাইতে কি এই তিনটে গুঁড়োর দিন কাট্‌বে না? আমি তোমাদের নিয়ে বসে থাকি তাই আমার স্বর্গ। আমার আর সংসারে সুখের জিনিস কি আছে, এরাই আমার সর্ব্বস্ব।"

ছোট বউ এতক্ষণ নীরবে একধারে বসিয়া কাঁদিতেছিল, স্বর্ণময়ীর মায়া দেখিয়া দয়ার্দ্রা ছোট বউএর হৃদয় আরও গলিয়া গেল। ছোট বউ বলিল "দিদি, দেখ পর আপনার হয় কিন্তু আপন কখন আপনার হয় না। এ জগতের কি আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক মায়া! নতুবা দেখ আপনার লোক হইলেই সে মায়াবলে আপনা হইতেই অনিষ্ট পথে গিয়া কেবল অনিষ্টের দিকেই ধাবিত হয়, তা না হ'লে মেজঠাকুর

তেমন মাটীর মানুষ হইয়াও কেন আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন ?"

এই সকল কথা হইতেছে এমন সময় হঠাৎ কৃষ্ণলাল আসিয়া কিছু বিরক্তস্বরে বলিলেন "হেম তোমায় যা বলেছিলাম তার কি ক'ল্লে ?"

কাকার এইরূপ বিরক্তজনক কথা শুনিয়া হেম ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে বলিল "ক'র্ব্বো কি, কালই আমরা অন্য স্থানে যাব। এ বাটীতে পৃথক্ হইয়া থাকিয়া আপনাদিগকে জ্বালাতন করা অপেক্ষা অন্য স্থানে থাকাই আমাদের সুখ, বনও আমাদের স্বর্গ।"

"যা ভাল হয় তাই ক'রো কিন্তু বিষয়ের কিছুই পাবে না, কারণ তোমার বাপ মরবার সময় আমাকেই সব দিয়ে গিয়েছেন তার সাক্ষী অনেকে আছে। আমিও সেই সকল সাক্ষীর সই করিয়া দলিল আমার নামে রেজেষ্টারি করিয়াছি।" কৃষ্ণলাল এই বলিয়া একখানি কাগজ হেমকে দেখাইলেন। হেম দেখিল তাহার মেজখুড়ীর নামে দলিল রেজেষ্টারি হইয়াছে। হেম আর কিছু না বলিয়াই কাগজখানি কাকার হস্তে প্রত্যর্পণ করিল। পরে কৃষ্ণলাল আর একখানি কাগজ বাহির করিয়া হেমের হস্তে দিয়া অতি এস্তভাবে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

হেম কাগজখানি দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিল "মা আমাদের গুণের কাকা আমাদের রাঁধা ভাতে ছাই দিয়াছেন। সাহেব আমায় অসচ্চরিত্র দোষে চাকরী হইতে জবাব দিয়াছে, তাহারই সংবাদপত্র কাকা দিয়া গেলেন।"

মা শুনিয়া হাপুসনয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। স্বর্ণময়ী, ছোট বউ, কিশোরী ইহারা সকলেই মাকে সান্ত্বনা করিল।

হেমমোহন গালে হস্ত দিয়া আপনার অবস্থার বিষয় ও কি করিলে কি হইবে সেই বিষয় মনে মনে অকূলপাথার ভাবিতেছে এমন সময়ে বাড়ীর আহ্লাদে চাকর জনার্দ্দন আসিয়া সংবাদ দিল "দাদাঠাকুর আপনারে কে বেইরে ডেকতি নেগেছে।" হেম তাড়াতাড়ি সেস্থান হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

নবম খাপ।

হেম ও শ্যাম।

রাত্রি আটটার সময় হেমমোহন বাহিরে আসিয়া দেখিল শ্যাম আসিয়াছে। এইখানে শ্যামের কিছু পরিচয় দিব। শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় কল্যাণপুরের একজন জমীদারের সন্তান। তাঁহার পিতা কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় একমাত্র শ্যামসুন্দরকে তাঁহার অপর্য্যাপ্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়া আজ দুই বৎসর হইল পরলোকগত হইয়াছেন। এখন শ্যামের বয়স ২৪ বৎসর। শ্যামের পিতৃদত্ত স্থাবর অস্থাবর অনেক সম্পত্তি ছিল। কয়েকখানি ভাল ভাল বাড়ীও ছিল। বিষয়ের আয় বাৎসরিক খরচ খরচা বাদে পাঁচ হাজার টাকা। পরিবারের মধ্যে শ্যামের মাতা, তাঁহার স্ত্রী ও কুণ্ডলিনী নাম্নী তিন বৎসরের এক ভগ্নী। বাড়ীতে চাকর চাকরাণীও ছিল। নায়েব গোমস্তা ইহারা বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিত। শ্যাম

বৎসর বৎসর হিসাব নিকাষ লইতেন। শ্যামসুন্দরের বাড়ী কল্যাণপুরের বাঁড়ুয্যে বাড়ী হইতে প্রায় একপোয়া পথ অন্তর।

শ্যামসুন্দর হেমমোহনের একজন অকপট বন্ধু। শ্যাম হেমকে অত্যন্ত ভাল বাসিত এমন কি হেমের জন্য শ্যাম প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। হেমও আবার সেইরূপ শ্যামকে না দেখিলে কষ্টবোধ করিত। বলিতে কি হেম ও শ্যামকে পরস্পর এক আত্মা বলিলেও বলা যাইত। হেমের মাতাও শ্যামকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। হেম ও শ্যাম বন্ধুত্ব-প্রণয়ের একমাত্র আদর্শস্থল। বড় লোক বলিয়া শ্যামের কিছুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। দরিদ্রের প্রতি দয়া করা তাহার প্রধান ধর্ম্ম ছিল, পরোপকারই তাহার এক মাত্র ব্রত ছিল। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি পার্ব্বণও ফাঁক যাইত না। মোট কথায় রূপে, গুণে, কুলে, শীলে শ্যামকে দেবচরিত্রের লোক বলিলেও বলা যাইত।

হেমকে দেখিয়াই শ্যাম বলিল "ভাই! আজ তোমায় এত বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন? মুখখানি শুকিয়ে গেছে, চক্ষু জবাফুলের মত লাল হয়েছে, যেন কিছু ভাব্‌ছো ভাব্‌ছো ব'লে বোধ হচ্ছে। এই মাত্র যেন অনেক কেঁদেছো ব'লে বোধ হচ্ছে, তাই বুঝি চোক লাল হয়ে ফুলে রয়েছে? কেন ভাই তুমি কি ভাব্‌ছো বল দেখি? ভাবে বোধ হচ্ছে তোমার কোন অসুখ করেনি কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি কি ভাব্‌ছো; অন্য দিন তোমার কাছে এলে হেসে হেসে আমাকে কত আদর যত্ন ক'ত্তে, কিন্তু ভাই আজ যে গরিব শ্যাম ব'লে আমাকে

তোমার মনেই পড়্ছে না। কাছে থাক্তে দেখেও যেন দেখ্তে পাচ্ছো না।”

যে যাকে ভালবাসে তার যদি কোন অনিষ্ট কি কোন বিপদ হয় তবে তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে। শ্যামও হেমের মুখের ভাব দেখিয়া সকলই বুঝিতে পারিল। বুঝিল যে হেমের আজ নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটিয়াছে তাই মনে মনে কি ভাব্ছে।

হেম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল “ভাই আজ বড় বিপদে পড়েছি ব'লেই তোমাকে কাছে দেখ্তে পেয়েও যেন তুমি এখানে নাই বলে বোধ হচ্ছে। ভাই! দুঃখের কথা কি বল্বো, বল্তেও কষ্ট বোধ হয়। বাবা ম'রে গেছেন, ছোট কাকাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন, তাতেও কোন কষ্ট ছিল না, কাকাই আমাদের অভিভাবক ছিলেন এই ভেবে আমরা সে সকল শোকই ভুলিতে পারিয়াছিলাম। বাবাও মরিবার সময় তাঁহার নাবালক সন্তানদের কাকার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে বলে গিয়েছিলেন দেখো এদের যেন কোন কষ্ট না হয়। আজ সেই কাকা, সংসার-তরির একমাত্র কর্ণধার সেই কাকা আমাদিগকে সমুদ্র মধ্যে আনিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন, আমাদের গভীর সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন। ভাই! কাকা আজ খুড়ীর পরামর্শে পিতার সমুদায় সদুপদেশ জন-মের মত জলাঞ্জলি দিয়া আমাদের বনবাসী হইতে অনুমতি দিয়াছেন, কাকা আমাদিগকে পৃথক্ সংসার করিতে বলি-য়াছেন। কাকা এবং খুড়িমা মাকে কুঁহুলে অপবাদ দিয়া

সোণার সংসার আজ উৎসন্ন দিতে বসিয়াছেন। আমরা কাল যে কোথায় যাইব, কি খাইব তাহার কিছুই সংস্থান নাই। যদি আমি একাকী হইতাম তাহা হইলে কিছুই ভাবিতাম না। পথে পথে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলেও আমার দিন সুখে সচ্ছন্দে যাইত। আমার পুত্রবৎসল মা, সরলা ছোট খুড়িমা, সৎগুণের আধারস্থানীয় আমার ভাই দুটী, এদের জন্যই আমার অধিক ভাবনা, এরা কাল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার কিছুই ঠিক নাই। দেখ কিশোরী এইবার হলেই বি, এ, পাশ হবে। তারপর মনে করেছিলাম যে তাকে "ল" পড়াব, কিন্তু ভাই সে সকল আশা ভরসার মূল একেবারেই ছিন্ন হইল। এ ছাড়া আমার বিধবা পিসিমা আছেন তিনি যদিও এখন শ্বশুরবাড়ীতেই আছেন তবুও তাঁহার জন্য আমাদেরই ভাবিতে হইবে। আবার চাকরাণীটী আমাদের যথেষ্ট ভাল বাসে, সে আমাদের না দেখ্‌লে মণিহারা ফণিণীর ন্যায় অস্থিরা হয়, আমার মা অপেক্ষাও সে আমাদের অধিক যত্ন ও স্নেহ করে সুতরাং তাহার জন্য আরও ভাবনা। আমাদের দুই ভা'য়ের দুই স্ত্রী, তাহারা যদিও এখন বাপের বাড়ীতেই আছে, কিন্তু তারা ত আর চিরকাল বাপের বাড়ী থাক্‌বে না, যখন হ'ক আন্‌তেই ত হবে। এতগুলি পরিবার যে কাল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার কিছুই সংস্থান নাই। আবার আমার চাকরীটি ছিল তাও কাকা ক'রে দিছ্‌লেন ব'লে তিনিই আবার সাহেবকে ব'লে ছাড়িয়ে দিয়েছেন।" এই কথা বলিতে বলিতে হেম কাঁদিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। হেমের

কান্নায় সমদুঃখভাগী, হেম-সোহাগী শ্যামের হৃদয় ব্যথিত হইল, বন্ধু-প্রণয়ের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, দুই হৃদয় এক হইল।

শ্যাম বলিল "ভাই হেম, কেঁদে আর কি করবে বলো। স্ত্রীলোকে না ক'ত্তে পারে এমন কাজই নাই। যারা আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে একটুও কাতর হয় না, তারা আবার অপরের দুঃখে দুঃখী হইবে, অপরকে ভাল বাসিবে, অপরকে আপনার ন্যায় দেখিবে ইহা মনেও ভাবিতে পারা যায় না। অতএব তাহার জন্য দুঃখ করাও ন্যায়সঙ্গত নয়। তোমার কাকা স্ত্রীর কথায় উঠেন স্ত্রীর কথায় বসেন, খুড়ীর পরামর্শে তেমন কাকা যে তোমাদের ভিন্ন ক'রে দিয়ে চিরজনমের মত দুঃখসাগরে ভাসাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আরও দেখ এ জগতে সুখ চিরকাল থাকে না কিম্বা দুঃখভোগও লোকের চিরকাল হয় না, সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ এ কথা শাস্ত্রসিদ্ধ, কারণ দেখ জ্যোৎস্না যদি চিরকাল থাকিত তাহা হইলে লোকে জ্যোৎস্নার এত আদর করিত না। অন্ধকারটুকু আছে বলিয়াই ত জ্যোৎস্নার এত আদর। আবার জ্যোৎস্নাটুকু আছে বলিয়াই অন্ধকারের জন্য যে কষ্ট তাহাকে কষ্ট বলিয়াই বোধ হয় না। সেই জন্য বলিতেছি যে তোমাদেরও দুঃখভোগ চিরকালের জন্য নয়, অবশ্য আবার তোমরা সুখের মুখ দেখিতে পাইবে। ঈশ্বরের দয়া পক্ষপাতী নয়, সকলের প্রতিই সমান, সুতরাং তাই ভাবিয়াও অন্ততঃ মনকে প্রবোধ দেওয়া তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত। কাকা ভিন্ন ক'রে দেবেন তার জন্য দুঃখ করার কোন কারণ

নাই, কারণ জগতে প্রায় কাকা মাত্রই ভাইপোদের পর ভাবিয়া থাকেন, কেবল তোমরা ব'লে নয় প্রায় সকল স্থানেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও কাকা ভাল হইতে কদাচ দেখা যায় কিন্তু খুড়ী কাহারও এ জগতে ভাল হইতে দেখা যায় না সুতরাং কাকাও সেরূপ খুড়ীর বশ হইলে কাকা আর কতকাল ভাল থাকিবে? তবে দৈবাৎ যাহারা স্ত্রীর বশ না হয় তাহারাই জগতে কাকা নামে গণ্য হয় নতুবা তোমার কাকার ন্যায় কাকাকে এ জগতে পশু ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। ভাই! এক কার্য্য কর, আমার মতে সেইরূপ করাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। কালই ত তোমাদের অন্য স্থানে যাইতে হইবে?"

হেম অতি কষ্টে দুঃখবেগ সংবরণ করিয়া বলিল "হাঁ ভাই কালই যাইতে হইবে। কাকা বলেছিলেন যে তোমরা আমার বাড়ীতেই থাকিয়া পৃথক্ সংসার কর। কিন্তু আমার তাহা বড় ভাল বলিয়া বোধ হইল না। কারণ খুড়ী সে রকমের লোক নন, তাঁহার জিনিস পত্রে হাত দিতে গেলেও তিনি মরিয়া হইয়া উঠিবেন। একস্থানে থাকিতে গেলে সে রূপ না করিলেও চলিবে না সুতরাং সেই জন্যই অন্যস্থানে যাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছি। শ্মশানে গিয়া থাকি সেও ভাল তবু অমন কাকার নিকট থাকা কি তুমি পরামর্শ দিতে পার? আমি তোমার কাছেই যাইতেছিলাম, তুমি ভিন্ন আমার সৎপরামর্শ দেয় এ জগতে এমন কে আছে? আর কার কাছেই বা যাইব? তুমি আপনি এসেছ ভালই হয়েছে, এখন কি করা উচিত আমায় বল।"

তখন শ্যাম বলিল "কাকা ভিন্ন ক'রে দেছেন ব'লে কি আর তোমাদের থাকিবার স্থান হইবে না? কাকা ভিন্ন কি আর জগতে কেহ নাই? আমি যতদিন থাকিব ততদিন তোমাকে কথনই দুঃখ পাইতে হইবে না। তোমরা কষ্ট পাইবে আর আমি স্বচক্ষে দেখিব তাহা আমার দ্বারা হইবে না। তোমার পায়ে একটী কাঁটা ফুটিলে আমার প্রাণ বড়ই কাতর হয়, আর সেই আমি তোমার কষ্ট সম্মুখে থাকিয়া দেখিব তাহা কথনই হইবে না। ভাই! আমার একটী বাগান-বাড়ী আছে, কাল সেইখানে তোমাদের লইয়া যাইব, পরে যাহা হয় করা যাইবে। খরচ পত্র সকলই আমি দিব, আমার উপর তোমার সকল ভারই রহিল, পর মনে ক'রে আমার নিকট কোন কথা বলিতে লজ্জিত না হও এই আমার ভিক্ষা। আমি তোমার নিকট আর কিছুই চাই না। আমি তোমার উপকার করিলাম এরূপ যেন তুমি মনে না কর তাহা হইলে আমি বড়ই দুঃখ পাইব। তবে এই জানিয়া রাখিবে যে আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিলাম। ভাই! এ জগতে কেহ কাহারও আত্মীয় বা পর নয়; যে যাহাকে ভাল বাসে, যে যাহার দুঃখে দুঃখী হয়, যার প্রাণ যার জন্য কাঁদে সেই তার আত্মীয়, সেই তার বন্ধু, সে জগতে ধন্য হয়, সে নরলোকে পূজ্য হয়, দেবলোকে আদরণীয় হয়। সেরূপ লোক জগতে কয়জন আছে? আমি তোমায় ভাল বাসি, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার দুঃখ হইল, তোমার জন্য আমার প্রাণ কাঁদিল, আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিলাম। কেন করিলাম তাহা আমি জানি না। আমায়

কেউ শিখায় নাই, আমার কেউ পরামর্শদাতাও নাই। আমার মনই আমার মন্ত্রী, আমার মনই আমার গুরু। আমায় লোকে ভাল বলিবে বলিয়া এ আশায়ও আমি করি নাই। আমি বড় লোক বটে, আমি জমীদারের সন্তান বটে কিন্তু আমি সে অহঙ্কার করি না। যদি আমার কিছুই না থাকিত, যদি আমি দীন দরিদ্র হইতাম তথাপি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত তোমার জন্য দিতে আমি কাতর হইতাম না, কেন তাহার উত্তর এ জগতে পাওয়া যায় না।"

এই সকল কথা শুনিয়া হেমমোহন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিল "ভাই তুমি যাহা সৎপরামর্শ বলিয়া আমার জন্য করিতে প্রস্তুত আছ আমি তাহাই করিব। তোমার কথা, তোমার পরামর্শ আমি কখনই উপেক্ষা করি নাই আজিও করিব না। আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে, আর কেন বৃথা বসিয়া বসিয়া আমার জন্য কষ্ট পাও, চল বাড়ী যাওয়া যা'ক।" এই বলিয়া হেম শ্যামের সঙ্গে কিছু দূর গিয়া দুই বন্ধু পৃথক্ হইল।

দশম ধাপ।

জুটো দুঠাই।

শ্যাম তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া তাহার মাকে বলিল "মা আজ আমাদের কি সুখের দিন, আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম তা বল্‌তে পারি না।

রোজ রোজ উঠে তার মুখ আগে দেখ্‌বো তা হ'লেই আমার দিন রোজ এইরূপ সুখের দিন হইবে।” শ্যামের এইরূপ আহ্লাদ দেখিয়া মাতার আর আহ্লাদ ধরিল না। শ্যাম যে কেন এত আহ্লাদে আট্‌খানা হয়েছেন মাতা আহ্লাদে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেও অবসর পাইলেন না। পুত্রস্নেহে পুত্রবৎসল মাতাই পুত্রের সুখে সুখী আর পুত্রের দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকেন। শ্যামের মাতা আজ পুত্রের সুখে সুখী হইয়া পুত্রস্নেহের আদর্শ হইলেন।

আহ্লাদের আশা মিটিলে শ্যামের মাতা উৎকণ্ঠার সহিত শ্যামকে বলিলেন “বাবা আজ কি আনন্দের কাজ ক'রে তোমার হৃদয়পুরে এনে দরিদ্রা মাতাকে ভাগ দিয়ে বড়মানুষ ক'ত্তে এসেছ? আমি ত বাবা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, আমার শুন্‌তে বড়ই ইচ্ছা হচ্ছে। তোমার ভাব গতিক দেখে স্পষ্টই বোধ হচ্ছে তুমি অবশ্য আজ কোন মহৎ কাজ ক'রে এসেছ কি কারও কিছু উপকার ক'রে এসেছ নইলে তোমার মন এত প্রফুল্ল হচ্ছে কেন?”.

শ্যাম মাতার কথা শুনিয়া বলিল “মা, মহৎ কাজ এমন কি, আর উপকারই বা কাকে বলে? তবে আজ আমি আমার একটী কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি। আমার জীবনে আমি সে রকম কাজ ক'ত্তে পেরেছি কি না তা আমার মনে পড়ে না। এখনও বলিতে পারি না যে সে কাজ আমার ক্ষমতায় হবে কি না; আশা করি, ঈশ্বর যদি দিন দেন, যদি কোন বাধা না পড়ে, যদি তোমার আশীর্ব্বাদের তেমন জোর থাকে তবে আমি অবাধে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য

সাধন ক'রে আমার অসার জীবনকে সার্থক করিতে পারিব। মা! কি বল্‌বো, ও পাড়ার কৃষ্ণলাল বাঁড়ুয্যে কি নিষ্ঠুর! তার কথা মনে কল্লেও পাপ, তার নাম ক'ল্লে সে দিন অন্ন হওয়া ভার। অমন স্ত্রৈণ, মেয়ে মানুষ ঘেঁসা, কামুক পুরুষ আমি এ পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাই না, তা না হ'লে স্ত্রীর কথা শুনে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট কর্‌বার জন্য অমন সোণার চাঁদ তিন ভাইপো, যাদের মুখ দেখ্‌লে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, যারা ঘরে থাক্‌লে কিছুরই অভাব থাকে না, যাদের মা সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না, কারও সঙ্গে বিবাদ নাহি, বিসম্বাদ নাই অমন সব রত্নদের তিনি চিন্‌তে পাল্লেন না, তাদের তিনি সামান্য কাচ মনে ভেবে জলে বিসর্জ্জন দিলেন, তাদের বিষয় আশয় সমস্তই হস্তগত ক'রে, হেমের চাকরীটী তিনি ক'রে দিয়েছিলেন ব'লে সাহেবকে ব'লে ছাড়িয়ে নিয়ে তাদের পথের ভিখারী ক'রে জনমের মত পৃথক্ করিয়া দিলেন। তারা কাল কোথায় দাঁড়ায় তাহার কোন ঠিকানা নাই। মা! হেম আমার কাছে তাই বলে আর ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদে, কোন কথাই কইতে পারে না। আমি তাকে অনেক উপদেশ দিয়ে, অনেক কষ্টে সান্ত্বনা ক'রে আমার বাগান-বাড়ী এসে আপাততঃ থাক্‌তে ব'লে এসেছি, আমার ইচ্ছা আছে তাদের জন্য পৃথক্ একটী বাড়ী পরে তৈয়ারি ক'রে দেব। হাঁ মা আমার কি কিছু মন্দ কাজ করা হয়েছে?"

শ্যামের মার মনও উন্নত ছিল। পরোপকারব্রতে তাঁহার মনও নাচিয়া উঠিত। তিনি পুত্রের মুখে অলৌকিক

কথা শুনিয়া পুত্রকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন "বাবা এর্ চেয়ে কর্ত্তব্য কার্য্য জগতে আর কি আছে, এ কার্য্য ক'টা লোকে ক'ত্তে পারে? আহা! মেজবউ কৃষ্ণলালকে এমন ভেড়া করেছে যে তার কথা শুনে একটা সংসার ছারেখারে দিতে বসেছে, একবারও ভাব্‌লে না যে কাদের সর্ব্বনাশ ক'ত্তে বসেছে? একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষের কথায় আগা পাস্তলা না ভেবে ক্যদের পথে ভিক্ষা কর্‌বার জন্য ছেড়ে দিচ্ছে? আপনার ভাইপো পর নয়, তাদের ভিন্ন ক'রে দেওয়া একি মানুষ হ'য়ে পারে, তাও আবার বিনা দোষে! ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা একটু মনে ঘেন্না পিত্তি হ'লোনা, একটু লজ্জা সরমও হ'লো না? যাহ'ক বাবা তুমি কালই নিজে গিয়ে তাদের যত্ন ক'রে এইখানে নিয়ে এস।"

এদিকে হেমমোহনও বাড়ী গিয়া তার মার নিকট শ্যামের গুণের কথা সমুদায় বলিল। হেমের মাতাও কৃষ্ণলাল ও মেজবউএর্ উদ্দেশে অনেক কথা বলিলেন সে সমুদায় এখানে বলিতে ইচ্ছা করিলাম না, আর বলিবারও কোন প্রয়োজন বোধ করিলাম না। ক্রমেই রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া হেম শয়ন করিতে গেল, কিন্তু নিদ্রা হইল না, কেবল শ্যামের বিষয়ই মনে আসিতে লাগিল। ভাবিল "আহা! কি উন্নত মন, কি ত্যাগ-স্বীকার! আমার জন্য সে সকলই করিতে পারে। আমি তার কে? পর বৈ আপনার কেউ নই, আমায় ভালবাসে এইমাত্র, কিন্তু আমায় সে সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত। কাকা! তুমি একবার এসে দেখ তোমার সহোদর ভাইএর সন্তান আমরা, আমাদের প্রতি রক্তের টান্‌টাও

তোমার থাকা উচিত, কিন্তু খুড়িমা একজন পরের মেয়ে, সে তোমার আপনার হলো, আর আমরা কেহই হইলাম না। আমরা তোমার নিকট পর অপেক্ষাও পর হইলাম। এক জন পর, তাকে পর বলিব বৈকি, সে ত আর আমার সহোদর ভাই নয়, সে আজ তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া আমাদের আপনার করিল; ইহা তোমার ন্যায় কাকার পক্ষে বড়ই দুঃখের বিষয়!" এই সকল ভাবিতে ভাবিতে হেম নিদ্রিত হইল। সুখে ও দুঃখে, হরিষে ও বিষাদে এক প্রকারে হেমের সে রাত্রি কাটিল।

পরদিন প্রাতঃকালে শ্যাম নিজে হেমের নিকট গেল; গিয়া দেখিল হেম বাহিরেই বসিয়া আছে। হেমকে দেখিয়া শ্যাম জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কাকা কোথায়?"

হেম বলিল "কাকা বাড়ীতেই আছেন।"

তখন শ্যাম এই কথা শুনিয়া বলিল "চল, আমি তোমাদের সঙ্গে করিয়া আমাদের বাগান-বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। আর তোমাদের যাইবার দেরি কি?"

হেম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "কাকা প্রাতঃকালে উঠিয়াই পৃথক্ স্থানে যাইবার জন্য আবার আমায় জেদ করিয়াছেন। তুমি এলে, না আমিও বাঁচলুম।" এই বলিয়া নিজের যে যে জিনিস পত্র ছিল সমুদায় লইয়া হেম, কিশোরী, ললিত, তাহাদের মাতা, তাহাদের ছোটখুড়ী ও স্বর্ণময়ী ইহারা সকলেই একত্রে শ্যামের বাগান-বাড়ী গিয়া আশ্রয় লইল। যাইবার সময় নিষ্ঠুর কাকা কি উগ্রচণ্ডা খুড়ী একবারও তাহাদের প্রতি ফিরিয়া চাহিল না।

বাগান-বাড়ীটী অতি চমৎকার স্থান। বাড়ীটী চক্‌মিলান, বাগানের ঠিক্ মধ্যস্থলে বিরাজিত। চারিদিকে নানাপ্রকার ফলের গাছ, ফুলের গাছ ও হরেক রকমের শাক সব্‌জির গাছ বাগানের অবিরত শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। বাগানের মধ্যে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার চারিদিকে কাঁকর ফেলা রাস্তা। পূর্ব্ব হইতেই হেমের এ বাড়ীটী একপ্রকার জানা ছিল সুতরাং তাহার নিকট এ স্থান নূতন বলিয়া বোধ হইল না।

শ্যামের হৃদয় এতক্ষণে সার্থক বোধ করিল, শ্যাম এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল। শ্যামের মাতাও আজ আপনাকে উপযুক্ত পুত্রের মাতা বলিয়া জ্ঞান করিল। শ্যাম ও শ্যামের মাতা সর্ব্বদাই তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

এতদিনে বাঁড়ুয্যে সংসার দুই ভাগ হইল, দুটো দুঠাঁই হইল। জগদম্বার ঘাটের পরামর্শ এতদিন পরে আজ সিদ্ধ হইল। মেজবউ সংসারের গৃহিণী হইল, সকল বিষয়ের অধিকারিণী হইল, কৃষ্ণলালের অধিক ভালবাসার পাত্রী হইল। আর হেমের আর একটী নূতন সংসার হইল। তাহারা সুখে সচ্ছন্দে শ্যামের বাগান-বাড়ীতে থাকিয়া নির্ভাবনায় দিন কাটাইতে লাগিল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে এ ধাপের শেষ প্রান্তে উঠিলাম।

একাদশ প্রাপ।

মেজবউএর্ আব্দার।

বাঁড়ুয্যে সংসার পৃথক্ হইবার পর কিছুদিন নির্ব্বিবাদে কাটিল। এখন বাড়ীর পরিবারের মধ্যে কৃষ্ণলাল, মেজবউ আর জনার্দ্দন চাকর। আর কেহই ছিল না। মেজবউকে সংসারের সমুদায় কাজ কর্ম্মই করিতে হইত।

একদিন সংসারের কাজ করিতে করিতে বিরক্তা হইয়া বকিতে বকিতে কৃষ্ণলালকে শুনাইয়া মেজবউ বলিল "ভ্যালা সংসার হয়েছে যা হ'ক্ আর পারা যায় না। একলা খেটে খেটে শরীলটে মাটী হ'য়ে যাবার যো হ'লো। আমি কি তোমার বাড়ীর চাকরাণী যে সংসারের সকল কাজই আমি ক'র্ব্বো? চাকর সে ত আহ্লাদে, তাকে বল্তে গেলে দশ কথা শুনিয়ে দেয়; গরু রে. বাছুর রে, জল তোলা রে, ঘর গোবর দেওয়া রে, বাট্না বাটা রে, কুট্না কোটা রে, উনকুটী চৌষট্টির পাট্ আমায় ক'ত্তে হবে। কেন রে বাপু আমি কি চোর দায় ধরা পড়িছি নাকি? আমার কি মা বাপ কেউ নাই নাকি? চাকর ত রাত্তির দিন টেরি কেটে বাবু হয়েই ব'সে থাকে; ব'ল্লে আবার রাগ কত, বলে আমি থাক্বো না; আরে, না থাকিস্ আমাদের কাজ কি আর চ'ল্বে না; ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি? এই রৈল সব কাজ পড়ে, দেখি আজ ভাত হয় কোথা থেকে? সমস্ত সংসারের পাট্ ক'রে কি আর হাঁড়ি ঠেলা যায়? মানুষের শরীর্ ত

বটে, খেটে খেটে আমার তেমন শরীর্ দেখ দেখি একেবারে আধখানা হ'য়ে গেছে ? ”

কৃষ্ণলাল শুনিয়া ভয়ে বিরক্ত না হইয়া বলিলেন “ কি ক'র্ব্বো তাই বলো না ছাই, কি ক'ল্লে ভাল হয় তাই ব'ল্লেই ত হয়, তার জন্য এত বকাবকি আর মুখ বাঁকাবাঁকি কেন ? আমায় ব'ল্লেই ত আমি তা'ই এতদিন ক'ত্তুম । ”

মেজ বউ আরও অধিক বিরক্ত হইয়া বলিল “ বল্‌বে আবার কি ? কেন দেখ্‌তে কি পাচ্ছো না, চোক্ কি নেই ? কপালের নীচে এত বড় দুটো রয়েছে কি জন্যে ? বল্‌তে হবে তবে উনি কর্ব্বেন ; ওরে আমার কর্ত্তা রে, সংসারের কাজ ত আর কলে হয় না ? ”

কৃষ্ণলাল এবার কিছু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “ দেখ্‌তে পাব না কেন ? দেখ্‌তে সবই পাই, বুঝ্‌তে সবই পারি, কিন্তু সংসারের কাজ কর্ম্ম তোমরাই বেশী বুঝ্‌তে পার, আমরা ত আর সব বিষয় বুঝ্‌তে পারি না ? তোমরা যেমন যেমন বল্‌বে আমরা তেমন তেমনই ক'র্ব্বো । সংসার পোরা লোক ত ছিল, তাদের তাড়িয়ে দিলে ; এখন পারিনে ব'ল্লে চল্‌বে কেন ? ”

মেজবউ এবার আরও রাগিয়া উঠিল, পূর্ব্বাপেক্ষা কর্কশস্বরে বলিল “ ভাইপোদের জন্যে কি মন কেমন ক'চ্ছে নাকি ? ক'রে থাকে, তাদের নিয়ে এসো না কেন ? আমার কি, আমি ভিক্ষা ক'রে খেলেও আমার দিন যাবে, বাপের বাড়ী গেলেও আমায় তারা চাড্ডি না খেতে দিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না । তাদের তাড়িয়ে দিয়ে পয়সা বাঁচিয়ে

আমার বাপের পিণ্ডি দেওয়া হ'চ্ছে কিনা? তোমারই ভাল হ'চ্ছে, আমার কি সুখ বাড়ছে বলো? এটাও বুঝতে পার না? সংসারের কাজ ত বুঝতিই পার না, আপনার স্বার্থও কি বুঝতে পার না নাকি? আহা হা! ন্যাকা, ন্যাকামো ক'চ্ছেন, কচি খোকা আর কি, আজও কুলোর শুয়ে দুধ খান কিছুই বোঝেন না! ঐযে কথায় বলে "অবুঝকে বোঝাব কত বুঝ্ নাহি মানে, আর ঢেঁকিকে শিখাব কত নিত্য ধান ভানে;" তা বুঝবো না ব'ল্লে কে কারে বোঝাতে পারে বলো? এইরূপ রাগারাগি হ'চ্ছে এমন সময় জগদম্বা আসিল। জগদম্বাকে দেখিয়া মেজবউ যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

হাত নাড়িতে নাড়িতে হাকিমের এজলাসে উকীলের বক্তৃতা করার ন্যায় মেজবউ জগদম্বাকে বলিল "আচ্ছা, দিদি! তুমিই বল দেখি, তোমারও ত সংসারে থেকে থেকে হাড় পেকে গেছে, আমাদের সংসারও ত তুমি জান, বল দেখি এই সংসারের পাট্ কি একলা পেরে ওঠা যায় না আমার মত লোক এত বড় একটা সংসার নেড়ে নে বেড়াতে পারে? তবু যা হ'ক মেয়েটা ছিল তাই রক্ষে, সেও আমারি সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা করে তাই; হাজার হ'ক সে ছেলে মানুষ, সে আর কত খাটবে? তাই বল্‌ছি কি দিদি, যে তোমার সংসার তুমিই কর, আমি দেশে দেশে ভিক্ষা ক'রে খাই সেও ভাল। তোমরাই দিদি পাঁচ জনে বলো যে আমার কি দোষের কথাটা বলা হয়েছে, যদি তোমাদের দশ জনের বিচারে আমায় দোষী বলে সাব্যস্ত কর তবে

আমায় না হয় দশ ঘা জুতো মেরে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেও। দুদিন নয় দশ দিন নয়, বার মাস কি নাকের জলে চ'কের জলে হ'য়ে এত বড় একটা সংসার ঠেলা যায়?"

কৃষ্ণলালও এই কথা শুনিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন "দিদি! আমি ত কিছু বলি নি; কেবল বলিছি কি ক'ত্তে হবে তাই আমাকে ব'ল্লেই ত হয়, আমি ত আর তা ক'ত্তে নারাজ নই। যদি অস্বীকার কত্তুম তা হ'লে বল্‌তে পাত্তে।"

মেজবউ আবার পূর্ব্বের ন্যায় হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে নথ দোলাইতে দোলাইতে বলিল "না, উনি কিছু বলেন নি, রেত করেছেন, আবার বল্‌বে কি, যদি কিছু বল্‌তে বাকী থাকে ত না হয় এইবার বলো, দিদি আছে শুনে যা'ক।"

জগদম্বা উভয়ের দিকে চাহিয়া বলিল "সে সব শুনে আমি আর কি ক'র্ব্বো, তবে আমি এই কথা বলি যে এখন ত সংসারটা এক রকম সচ্ছল হয়েছে, আর কোন গোলমাল ত এখন সংসারে নাই, লোক জনও আর সংসারে বেশী নাই, এখন দুপয়সা খরচ না ক'ল্লে চল্‌বে কেন? খরচ না ক'ল্লে সাত্যিইত ও একলা পেরে উঠ্‌বে কেন? সব দিক্ দেখে ত আমায় বল্‌তে হবে? সংসারটা ত আর কম নয়, ওরও ত মানুষের শরীর বটে, দেখে শুনে, বুঝে শুঝে ঘরাঘরি ঝগড়া ক'ল্লে হবে কেন? তোমার সংসার তুমি গোছগাছ না ক'রে দিলে ও ত আর বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও থেকে কিছু এনে নিয়ে সংসার চালাতে পার্‌বে না? তাই আমি বলি কি, একটা চাকরাণী রাখ; সে সংসারের সব পাট্ কর্ব্বে আর কেতকিনী ত শ্বশুর বাড়ীতেই

আছে, তাকে গিয়ে কালই নিয়ে এস। সে রান্না বান্না সবই ক'ত্তে পার্‌বে। কালই তুমি নিজেই কলিকাতায় যাও বা জনার্দ্দনকেই পাঠাও ; আমার মতে জনার্দ্দনকে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। কেতকিনী এলে আর একটা চাকরাণী থাক্‌লে ওর আর কোন কষ্টই হবে না।"

কৃষ্ণলাল জগদম্বার প্রস্তাব শুনিয়া মুখ কিছু বিকৃত করিয়া বলিলেন "সে কথা আবার ওঁর মত্ হয় তবে ত, তোমার মতে কি আমার মতে ত আর হবে না, হাকিমের কি রায় হয় দেখ।

জগদম্বা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলিল "আরে আমার হাকিম রে, আমি যা বল্‌বো তার উপর আবার ও টেক্কা দেবে, আমার হুকুমের উপর ও আবার হুকুম চালাবে ওর লজ্জা কর্ব্বে না ? অমত করুক দিকি দেখি ওর কত বড় ক্ষমতা" বলিয়া জগদম্বা মেজ বউএর্ দিকে ফিরিয়া বলিল "কেমন রে কোন অমত কর্‌বি নাকি ?"

মেজ্‌বউ তখন মৃদুস্বরে বলিল "দিদি ! তুমি যা ব'ল্লে তাতে আর আমার অমত কি। তুমি ত আর আমার মন্দর জন্যে বল্‌ছো না।"

জগদম্বা এইরূপে বাঁড়ুয্যে সংসারের মধ্যস্থা হইয়া গৃহ-বিবাদের একপ্রকার মীমাংসা করিয়া চলিয়া গেল। চাকরাণী রাখা আর কেতকিনীকে আনাই স্থির হইল।

দ্বাদশ ধাপ।

জনার্দ্দন।

কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে কেতকিনীর শ্বশুর বাড়ী। জনার্দ্দন তাহার বয়সে কখন কলিকাতা দেখে নাই, কলিকাতার নামও কখন শুনে নাই, কলিকাতার রাস্তা ঘাটও কিছুই জানে না। কল্যাণপুরে থাকিয়া কল্যাণপুরেরই অধিকাংশ স্থান একাকী যাইতে পারিত না। সাহস কিছুমাত্র ছিল না। রাত্রে সে কখন একাকী বাহির হইত না, পাছে পশ্চাৎদিক্ থেকে কেউ চেপে ধরে এই ভয় তাহার অত্যন্ত ছিল; একটু পাগ্‌লামীর ছিট্‌ও তাহার ছিল। বোকামীর পরিচয় তাহার নিকট হইতে বিশেষরূপ পাওয়া যাইত, কিন্তু এদিকে বাবুগিরি বিলক্ষণ ছিল। সর্ব্বদা টেরি কাটা, পান খাওয়া, ছড়ি হাতে, ফুলবাবু সাজিয়া বাহিরে যাইত, কাহারও সহিত কথা কহিত না; বিশেষতঃ চেনা লোক দেখিলে পাছে তাহার বোকামীটুকু ধরা পড়ে এই ভয়ে চুপ করিয়া থাকিত। বাবু দেখিয়া লোকে মনে করিত বাবু বলিয়া বুঝি কথা কয় না। কৃষ্ণলাল জনার্দ্দন বা বোকারামকে (কৃষ্ণলাল তাহাকে বোকারাম বলিয়াই ডাকিতেন) ডাকিয়া কলিকাতায় যাইতে বলিলেন। জনার্দ্দন কৃষ্ণলালের মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল, এইরূপে পাঁচ মিনিট চাহিয়াই আছে, কোন কথাই নাই। কৃষ্ণলাল সুতরাং তাহাকে আবার কলিকাতায় যাইবার জন্য বলিলেন।

এবার জনার্দ্দন অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিল " আজ্ঞে অ্যাঁ, আ—পু—নি কি বল্‌তে নেগেছ ? "

কৃষ্ণলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন " দূর্ বেটা, এতক্ষণের পর ব'ল্লে কিনা কি বল্‌তে নেগেছ। তোর মুণ্ডু বল্‌তে নেগেছে। বলি কল্‌কাতায় যেতে পার্‌বি ? "

জনার্দ্দন পূর্ব্ববৎ হাঁ করিয়াই বলিল " আপুনি কি ব'ল্লে ক'ল্‌কে আর তাওয়া আন্‌বো ? ক্যান তমাক খাবেন নাকি ? তা আমি আখুনি যাচ্ছি। "

কৃষ্ণলাল আরও বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিলেন "বেটা ভাল আলান জ্বালালে যা হ'ক্; কি ক'রেই বা বেটাকে বুঝিয়ে দি তাও কিছু ঠিক্ ক'ত্তে পাচ্ছি না, আর ও না গেলেও ত আর কেউ পার্‌বে না, আর কাকেই বা পাঠাই ? এমন সময় মেজবউ সেখানে আসিল। মেজ বউএর্ তার সহিত সর্ব্বদাই কথা কওয়া অভ্যাস ছিল।

মেজবউ বলিল " ন্যাও তোমার কর্ম্ম নয় ; ছাগল দিয়ে কি আর্ যব মাড়া হয় ? বোকা বোঝান তোমার কর্ম্ম নয়। এই দেখ আমি বুঝিয়ে দি। "

জনার্দ্দনের " গড়ের মাঠ " এই কথাটী বিলক্ষণ জানা ছিল। কিন্তু গড়ের মাঠ কখন দেখে নাই। জনার্দ্দন কেবল শুনিয়াছিল যে কলিকাতার ভিতর গড়ের মাঠ আছে। মেজবউও জানিত যে জনার্দ্দনকে গড়ের মাঠের কথা বলিলেই সমুদায় বুঝিতে পারিবে।

মেজবউ তখন ইসারায় জনার্দ্দনকে বলিল "সেই গড়ের মাঠে তোর পিসিমাকে আন্‌তে যেতে পার্‌বি ? "

এই কথা শুনিয়া জনার্দ্দন তাড়াতাড়ি বলিল "পার্‌বো পার্‌বো, পার্‌বো। তা আমায় রাস্তাটা বুঝিয়ে পড়িয়ে দেও, আমি আখুনি চল্লুম।" তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দেওয়া হইল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ষ্টেসনের দিকে যাইতে হইবে তাহাও বলিয়া দেওয়া হইল। যখন যে যে কার্য্য করিতে হইবে, যখন যে উপায়ে যেখানে যাইতে হইবে সকলই বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

মেজবউ তাহাকে যাইবার সময় বলিল "দেখ্ রাস্তায় জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে যাবি যে কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে অশোক মুখুয্যের বাড়ী যাব কোথা, তা হ'লেই সকলে বলে দেবে। এই রাস্তা ধ'রে বরাবর যাবি। কেমন নাম আর ঠিকানা ভুল্‌বিনে ত?"

সে বলিল "আমি ওতো বোড়ো অ্যাট্টা নাম মনে ক'রে রাখ্‌ছি পার্ব্বো না।"

কৃষ্ণলাল তখন কি করিবেন কাজে কাজেই তাহাকে একখানি কাগজে ঠিকানা লিখিয়া দিয়া কাগজখানি যত্ন করিয়া রাখিতে বলিয়া দিলেন। সে কাগজখানি আদালতের দলিলের ন্যায় যত্ন করিয়া রাখিল।

কল্যাণপুর হইতে বাহির হইয়া ক্রমে সে রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে রাস্তা সে একপ্রকার জানিয়াই লইয়াছিল। জনার্দ্দন শুনিয়াছিল যে রেলের গাড়ীতে উঠিতে গেলেই টিকিট কিনিতে হয়। কিন্তু কোথায় কিনিতে হয় কি করিয়া কিনিতে হয় তাহার কিছুই সে জানিত না। কি করে, চারিদিক্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে

ষ্টেসনে ষ্টেসন মাষ্টারের যে ঘর ছিল সেই ঘরের ভিতর যাইতেই উদ্যত। তৎক্ষণাৎ একজন লাল পাগড়ীওয়ালা কনষ্টেবল আসিয়া ধাক্কা দিয়া বলিল "হট্টো, মৎ যাও।"

জনার্দ্দন রাগিয়া বলিল "হাট কোথায় যে হাটে যাব? এটা কি হাট যে আমায় হাটে যেতে বল্‌ছো? যদি এটা হাট হয় তবে আনাজ তরকারী কোথায়, টিকিটই বা কোথায় বিক্রী হয়? কেবল যে বইই দেখ্‌তে পাচ্ছি" বলিয়া হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাগিলে কিম্বা তাড়াতাড়ি কথা কহিতে গেলে, কিম্বা ঝগড়া করিতে গেলে জনার্দ্দনের কথার কোন মারপ্যাঁচ থাকিত না। টিকিটের কথা বলিতেই কনষ্টেবল বুঝিতে পারিল যে সে কোথায় যাইবে বলিয়া টিকিট কিনিবে, টিকিটের ঘর মনে করিয়া এই ঘরে যাইতেছিল। এই ভাবিয়া কনষ্টেবল তাহাকে বলিল "তোম্ কাঁহা যাওগে?"

জনার্দ্দন হিন্দী কথা বুঝিতে পারিত না। তাহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াই বলিল "তুমি কি বলতে লেগেছ, আমি যে সম্‌জুতি পারিছি নে।" তখন কনষ্টেবল বুঝিল সে হিন্দী কথা বুঝিতে পারে না।

কনষ্টেবল তখন বাঙ্গালায় জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করিল "তুই কোথায় যাবি?" তাহার বাবুর মত পোষাক দেখিয়া কনষ্টেবল সন্দেহযুক্ত হইয়া তাহাকে তাহার নাম, ধাম চাকরী বাকরীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মুখে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া কনষ্টেবলের "বাবু

বোকা” এ সন্দেহ দূর হইল। কনষ্টেবল আবার জিজ্ঞাসা করিল “তুই কোথায় যাবি?”

জনার্দ্দন সেই ঠিকানার কাগজখানি দেখাইয়া বলিল “মুই এই এইখানে যাব।” কনষ্টেবল বাঙ্গালা লেখা পড়া জানিত। সে কাগজখানি দেখিয়া বুঝিল যে সে কলিকাতায় যাইবে। তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া টিকিট কিনিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিয়া দিল যে যেখানে গাড়ী গিয়া একেবারে থামিবে সেইখানে নাববি. দেখিস্ যেন মধ্যে আর কোথাও নাবিস্ না। বরং গাড়ীতে কাউকে টিকিট দেখিয়ে যেখানে নাবতে বলে সেইখানে নাবিস্। এই বলিতে বলিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ষ্টেসনে ষ্টেসনে থামিয়া ক্রমে গাড়ী শিয়ালদহে আসিয়া একেবারেই থামিল। জনার্দ্দন প্রত্যেক ষ্টেসনে গাড়ী থামিবার সময় সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে কোথায় নামিতে হইবে। সন্ধ্যার পর জনার্দ্দনকে শিয়ালদহ ষ্টেসনে নামাইয়া দিল। নামিবামাত্র একজন সাহেব আসিয়া জনার্দ্দনের নিকট টিকিট চাহিল। হাবড়া ষ্টেসনের মত শিয়ালদহে সকল সময়ে গাড়ীর চাবি বন্ধ করিয়া টিকিট আদায় করা হইত না।

টিকিট দিবার কথা শুনিয়া জনার্দ্দন রাগান্বিত হইয়া বলিল “আবার টিকিট কোথা পাব? বাহারে! একবার গাড়ীতে চাপ্‌বার সময় টিকিট কিনেছি আবার কি টিকিট কিন্‌তে হবে নাকি?”

জনার্দ্দনের এই কথা শুনিয়া সাহেব বলিল “যে টিকিট কিনেছ সেই টিকিটই আমায় দিতে হবে।”

জনার্দ্দন এবারে আরও রাগিয়া বলিল "বাঃ! আ—মি যে টিকিট পয়সা খরচ ক'রে কিনে এনেছি তা তোমায় দেব কেন? সে টিকিট আমি অনেক কষ্টে হাতে পেয়েছিলুম। আচ্ছা সাহেব, তুমি যে জিনিস পয়সা দিয়ে কিনে আন, যার কাছ থেকে কিনে আন তাকে কি আবার সেই জিনিস ফিরিয়ে দেও নাকি? তবে আমি পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে তোমায় দিতে যাব কেন?"

সাহেব দেখিল যে লোকটা বড়ই হাবা। তখন সাহেব ভাবিল যে হাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কি হবে। কত হাবা, কত বোকা, কত প্রকারের লোক এই ষ্টেসনে প্রতি ঘণ্টায় আসে কিন্তু এমন নূতন কথা তো কাহারও নিকট কখন শুনি নাই। আবার দেখ্‌ছি এ লোকটা কিছু বাবুও বটে; বাবু এত বোকা হয় তাহা তো আমি কখন দেখিও নাই শুনিও নাই। এ কি কিছুই লেখা পড়া জানে না? লেখা পড়া জান্‌লে কিম্বা পেটে কিছু বিদ্যে থাক্‌লে এমন অসম্ভব কথাই বা বল্‌বে কেন? তখন সাহেবও কনষ্টেবলের মত সন্দেহযুক্ত হইয়া পরিচয়াদি লইয়া তাহার সন্দেহ মিটাইল।

সাহেব বলিল "সকলেই টিকিট দিচ্ছে, তুই কি তা দেখতে পাচ্ছিস্ না? তুই যদি টিকিট না দিস্ তবে তোকে এখনি পুলিসে দেব।"

পুলিসের নাম শুনিয়া জনার্দ্দনের ভয় হইল সুতরাং সাহেবকে টিকিট দিয়া বলিল "বাবা আর কেউ তো আবার আমার কাছে টিকিট চাইবে না? হে বাবা, দোহাই তোমার,,

বাবা আমি যেন বিদেশে এসে আর কোন বিপদে না পড়ি। আমি কখনও ইদিকে এসিনি।”

তখন সাহেব বলিল “না তোর আর কোন ভয় নাই, আর কেউ তোর কাছে টিকিট চাবে না।”

এই ঘটনার সময় অনেকেই সেখানে তামাসা দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া ছিল, সকলেই জনার্দ্দন সম্বন্ধে এক একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। জনার্দ্দনও ষ্টেসন হইতে বাহির হইল।

ত্রয়োদশ ধাপ।

আশ্রয়—আশায় নিরাশা।

জনার্দ্দন যখন ষ্টেসন হইতে বাহির হইল তখন রাত্রি হইয়াছে। পূর্ণিমার রাত্রি হইলেও অজানা রাস্তা বলিয়া কোন্ দিকে যাইবে জনার্দ্দন তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। শিয়ালদহ হইতে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে যাইতে হইলে কোন্ রাস্তায় যাইতে হইবে তাহার কিছুই সে জানিত না। ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়াই জনার্দ্দন একটী দোকান দেখিতে পাইল, সে সেই দোকানে গিয়াই বসিল। দোকানে আরও অনেক প্রকারের লোক ছিল। কেহ বা গাড়ীতে উঠিবে বলিয়া বসিয়া আছে, কেহ বা গাড়ী হইতে নামিয়া কলিকাতার দিকে যাইবে বলিয়া বসিয়া আছে। সকল প্রকারের লোকই প্রায় ষ্টেসনের পার্শ্বে যে দোকান থাকে

সেইখানে বসিয়া নানাপ্রকারের গল্প করে ও কে কোথায় যাইবে পরস্পর তাহার পরিচয় লয়।

সন্ধ্যার পর জনার্দ্দন কোথায় যাইবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সেই দোকানে গিয়া আশ্রয় লইল। একটী নবাগত বাবু আসিল দেখিয়া দোকানী আসুন, বসুন, বলিয়া যত্নপূর্ব্বক জনার্দ্দনকে বসিতে বলিল। জনার্দ্দনও বসিয়া সেইখানে পনর মিনিটের মধ্যে প্রায় দুই চারি ছিলিম তামাকু পোড়াইল। দোকানে আর আর পথিক যাহারা ছিল তাহারা ক্রমে জনার্দ্দনকে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক জন তাহাকে বাবু মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবু আপনার নাম ?"

জনার্দ্দন লেখা পড়া জানিত না বটে কিন্তু কেহ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গোটাকত ভাল কথা শিখিয়া রাখিয়াছিল, সেই কথা গুলি আওড়াইয়া সকল স্থানে নিজের পরিচয় দিত। নাম জিজ্ঞাসা করাতে জনার্দ্দন বলিল "আমার নাম শ্রীল শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন, আমার বাপের নাম শ্রীঠাকুর কার্ত্তিক, কল্যাণপুরের কাকা মহাশয়ের চাকর আমি, আমাকে পাঠিয়েছেন নিতে।" এইরূপ পরিচয়ে সাহেব ও কনষ্টেবলের ন্যায় পথিকেরও জনার্দ্দন সম্বন্ধে দিব্যজ্ঞান জন্মিল। দোকানশুদ্ধ সকলেই জনার্দ্দনকে হাবা বলিয়া এতক্ষণে স্থির করিল। তখন দোকানী আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথা যাবে ?"

"কোথা যাবে" একথা জিজ্ঞাসা করিলে জনার্দ্দন তাহার পুঁটুলি খুলিয়া সেই ঠিকানার কাগজ বাহির করিত।

দোকানী ঐ কথা জিজ্ঞাসা করাতে জনার্দ্দন তাহার অভ্যাস মত পুঁটলি হাতড়াইতে লাগিল।

জনার্দ্দনকে পুঁটলি হাতড়াইতে দেখিয়া দোকানী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "একি! কোথা যাবে একথা জিজ্ঞাসা করাতে তুমি পুঁটলির ভিতর কি খুঁজিতেছ? পুঁটলির ভিতর কি তোমার যাবার জায়গা আছে নাকি?"

জনার্দ্দন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "হায়! কি হ'লো! কে আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লে, কে আমার কাগজ চুরি করেছে!"

কাগজের কথা শুনিয়া দোকানী তখন বলিল "তোমার পুঁটলির ভিতর নোট ছিল, তাই কি কেউ চুরি করেছে নাকি?"

জনার্দ্দন তখন আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ওগো আমার সে হাজার টাকার নোট গো, হাজার টাকার নোট, আমার কে এমন সর্ব্বনাশ করেছে গো, ওগো আমি কি কর্ব্বো গো, ওগো আমার কি হবে গো! দোকানশুদ্ধ সকলেই তাহার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিক হাজার টাকার নোট হারাইয়াছে ভাবিয়া জনার্দ্দনকে প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করিল। "কোথা যাবে" একথা আর কেহই জিজ্ঞাসা করিল না দেখিয়া তখন জনার্দ্দন চুপ্ করিল। তাহার তখনকার মত পুঁটলি হাতড়ান বন্ধ হইল। সে ভাবিল যে যখন যাইব তখন কাগজখানা খুঁজিব। ক্রমে রাত্রি হইল দেখিয়া সকলেই দোকানের ভিড় ভাঙ্গিল।

সকলে চলিয়া গেলে দোকানী জনার্দ্দনকে বলিল “ তুমি যখন রাস্তা চেন না, আর তোমার মনও খারাপ হয়েছে সেইজন্য আমি বলি কি, তুমি আজ এই খানেই থাক, কাল সকালেই উঠে যেখানে যাবে ব’লে এসেছ সেইখানে যেও আমি সঙ্গে লোক দিব। জনার্দ্দনও দোকানীর এই কথা শুনিয়া স্বীকৃত হইল। পাঠক মহাশয়! জনার্দ্দনের নিকট নোট কি বেশী টাকা কিছুই ছিল না। কৃষ্ণলাল তাহাকে হাবা গোবা জানিয়া কেবল মাত্র একটী টাকা আর গণ্ডা কয়েক পয়সা পথ খরচের জন্য দিয়াছিলেন। সে তাহা হইতে কিছু খরচ করিয়া বাকী তাহার নিকট আট গণ্ডা কি দশ গণ্ডা পয়সা ছিল, তাহাও সে কোমরে বান্ধিয়া রাখিয়াছিল।

দোকানী ভাবিল যে যখন হাজার টাকার নোট হারাইয়াছে তখন ইহার নিকট নিশ্চয়ই বেশী টাকা আছে এই ভাবিয়া লোভে পড়িয়া তাহার সমস্ত আত্মসাৎ করিবার আশায় তাহাকে সে রাত্রি সেইখানে থাকিতে বলিল। জনার্দ্দন তাহার দুরাভসন্ধি কিছুই জানিত না সুতরাং নির্ভাবনায় দোকানে রাত্রি কাটাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

পূর্ণিমার রাত্রি। চারিদিক্ হাস্যময়। রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা, নিরাশ্রয়ের পর্ণকুটীরও হাস্যময়। পুষ্করিণীর চাঁদনিও হাস্যময়, পুষ্পোদ্যানও হাস্যময়। চন্দ্রদেব যেন অকাতরে অঞ্জলি অঞ্জলি জ্যোৎস্না ছড়াইতেছেন, সে জ্যোৎস্নায় কানন, কান্তার, প্রান্তর, সরোবর পুরিয়া যাইতেছে। সরোবরে মৃদুপবন প্রতিঘাতে লহরীদল স্তরে স্তরে

ভাস্‌ছে। কুমুদিনী প্রাণনাথকে দেখে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়্‌ছে, মস্তকের ঘোম্‌টা খুলে যাচ্ছে তবুও কেয়ার নাই, চাঁদের পানে একদৃষ্টে চেয়েই আছে, নিশানাথও রহস্যের ছলে কুমুদিনীর গায়ে মাঝে মাঝে সুধা ঢেলে দিচ্ছেন, কুমুদিনী হেসে হেসে সে সুধা গায়ে পেতে নিচ্ছে। জলে কমলিনী, স্থলে সূর্য্যমুখী চন্দ্রদেবকে আড়াল ক'রে পরপুরুষ দর্শন ভয়ে মুখ ঢেকে বসে আছেন, আবার একবার একবার কটাক্ষপাতে কুমুদিনীর কাণ্ডকারখানা দেখে ঘোমটার ভিতর থেমটা নেচে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছেন, ভাব্‌ছেন আমাদেরও একদিন অমনি ছিল।

জীর্ণ মন্দিরের, অট্টালিকার ফাটলে ফাটলে বাচাল উঁইচিংড়ে মহাশয়েরা পঞ্চমস্বরে গান জুড়িয়া দিয়াছেন, ঝিঁঝি পোকারা গাছ থেকেই সুর দিচ্ছে। ফড়িংদেব ঘাসবনে বসে বসেই মজা লুট্‌ছেন। টিক্‌টিকি মহাপ্রভু কড়িকাঠের ফাঁক্‌ থেকেই টক্‌ টক্‌ ক'রে তাল রাখ্‌ছেন, জোনাকিরা স্ফটিক জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট আলো বিতরণ ক'রে গাছে গাছে উড়ে বস্‌ছে। চাতকেরা মাঝে মাঝে দুই একবার "ফটিক জল ফটিক জল" ক'রে আওয়াজ ক'চ্ছে। কাক ও কোকিল এক একবার রাত্‌কে দিন মনে ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ছে। রাস্তায় বেকার কুকুরগুলো মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে পথিকদিগের ভয় প্রদর্শন ক'চ্ছে। ছোট ছোট ছেলেরা বৃদ্ধ পিতামহীর নিকট রাজপুত্র, কোটালের পুত্র, পক্ষিরাজ ঘোড়া জোড়ে প্রভৃতি গল্প শুনিয়া ঘুমিয়ে পড়্‌ছে। বির-

তিনীর মহলে চাঁদের রূপ দেখে দীর্ঘনিশ্বাসের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। অভিসারিণী বেশবিন্যাশ ক'রে টীপ টাপ কেটে সময় ও সুযোগ অপেক্ষায় বসে আছে। চাষা মহলে ১০।১৫ জন এক জায়গায় বসে এবারে চাষের বড় অসুবিধা, বৃষ্টি হ'লো না প্রভৃতি কথোপকথন চলছে। কোথাও একজন বৃদ্ধ জোৎস্নার আলোতে দড়ি পাক দিতে দিতে একে চন্দর দুয়ে পক্ষ প্রভৃতি স্বরে ছেলে তালিমী করছে।

রাত্রি দুই প্রহর। পৃথিবী নিস্তব্ধা, শব্দহীনা, স্বরহীনা। সেই দুই প্রহরের সময় কেবল নদী-স্রোত-বাহিত জীব জন্তুর শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। নদীর কল্ কল্ শব্দও দুই একবার শোনা যাইতে লাগিল। এই নিশীথ সময় কেবল দুই একজন ভিন্ন আর সকলেই নিদ্রিত। আমাদের কথিত দোকানদার তাহার মধ্যে একজন। তাহার আর সে রাত্রে নিদ্রা নাই। সে তাড়াতাড়ি উঠিল। দেখিল জনার্দ্দন অকাতরে ঘুমাইতেছে, জাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। নিকটে গিয়া পুঁটলিটী আস্তে আস্তে খুলিল। একে একে সমুদায়ই দেখিল। দেখিতে দেখিতে একখানি কাগজ পাইল। জ্যোৎস্নার আলোকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না সেখানি কি কাগজ; নোটের ন্যায় অনুমান করিয়া পুঁটলিটী আবার পূর্ব্বের ন্যায় বাঁধিয়া যথা-স্থানে রাখিয়া চলিয়া গেল। জনার্দ্দন কিছুই জানিতে পারিল না। দোকানী তাড়াতাড়ি তাহার স্ত্রীকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিল। প্রদীপ জ্বালা হইলে আলোতে কাগজ-খানি পড়িয়া দেখিয়া দোকানী একেবারেই হতাশ হইল,

কারণ কাগজে লেখা ছিল—"কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে অশোক মুখুয্যের বাড়ী।" তখন দোকানদার বুঝিল যে এইজন্য "কোথা যাবে" এই প্রশ্নে জনার্দ্দন তাহার পুঁটুলি খুঁজিয়াছিল। এইরূপে দোকানী ঠকিল দেখিয়া কাহাকেও আর কিছু না বলিয়া কাগজ খানি নিজেই রাখিয়া দিল, দোকানীর সে রাত্রি অনুতাপেই কাটিল।

চতুর্দ্দশ ধাপ।

কলিকাতা—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

সময় কাহারও জন্য থাকে না। সুখেই হউক আর দুঃখেই হউক সময় কাটিবেই। জনার্দ্দনের অঘোর নিদ্রার রাত্রি প্রভাত হইল আর দোকানীর অনুতাপের রাত্রিও প্রভাত হইল। প্রাতঃকালে দোকানী উঠিয়াই রহস্য করিবার জন্য কাগজের বিষয় জনার্দ্দনকে কিছুই বলিল না। কেবল জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথা যাবে?

জনার্দ্দন আবার পূর্ব্বের ন্যায় সেইরূপ পুঁটুলি খুঁজিয়া কাগজ না দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমি কোথা যাব তা আমি জানি না, আমার কাগজ তা জান্‌তো গো। হায়! কি হ'লো. কে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে সে কাগজখানা চুরি ক'ল্লে গো তাও আমি জানি নে। হ্যাগা তুমি বল্‌তে পার আমি কোথা যাব?

দোকানী বলিল "আমি কি ক'রে জানবো? তুমি কোথা যাবে তা আমি জানবো এ বড় মজার কথা শুনতে পাচ্ছি। যেখানে যাবে শীঘ্র বল ক্রমেই বেলা হ'চ্ছে যে?"

তখন জনার্দ্দন তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল "ওগো আমি আমাশয়ের ঔষুধ আনতে যাব।"

এই কথা শুনিয়া দোকানী হাসিতে হাসিতে মনে করিল যে আমড়াতলা ষ্ট্রীটের অশোক মুখুয্যেকে আমাশয়ের ঔষধ বলিয়া ইহার মনে পড়িল। তখন দোকানী আর কিছুই না বলিয়া কাগজখানি হাতে দিয়া পূর্ব্ব রাত্রির অপমান স্মরণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। কাহাকেও সঙ্গে দিল না।

জনার্দ্দন কলিকাতার রাস্তায় পড়িয়া প্রত্যেককে কাগজখানি দেখাইয়া দেখাইয়া ক্রমেই যাইতে লাগিল। যত যায় তত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কলিকাতার শোভা দেখিয়া জনার্দ্দনের মন অন্যরূপ হইল। ক্রমেই তাহার মুখ ফুটিতে আরম্ভ হইল। ভাগ্যক্রমে অশোক মুখুয্যের বাড়ীর চাকরের সহিত জনার্দ্দনের দেখা হইল, তাহাকে কাগজখানি দেখাইল। সে বলিল "আমি তাদেরই বাড়ীর চাকর।" জনার্দ্দন তখন আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। সে যেন মেঘ চাইতে জল পাইল। চাকর তাহাকে সঙ্গে করিয়া কেতকিনীর শ্বশুর বাটীতে লইয়া গেল।

জনার্দ্দন বাড়ী পৌঁছিয়া আদরের সহিত আধ আধ স্বরে ডাকিল "পিছি মা, পিছি মা, পিছি মা গো, ও গো পি—

ছি—মা তুমি কি ক'ৰ্চ্ছ? আমি এইছি বাইরে এছে দেখো।"

কেতকিনী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল জনার্দ্দন আসিয়াছে। জনার্দ্দনকে দেখিয়া কেতকিনী আহ্লাদিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি জনার্দ্দন যে, খবর কি?"

জনার্দ্দন বলিল "তোমায় যেতে হবে।" রাস্তার ঘটনার কথা কিন্তু কিছুই বলিল না। কেতকিনী ক্রমে পিত্রালয়ের সংবাদ শুনিল; শুনিয়া শোক, দুঃখ, ক্রোধ, হিংসা একেবারেই তাহার হৃদয়ের আনন্দের স্থান অধিকার করিল। ভ্রাতাদের মৃত্যু, ভাইপোদের পৃথক হওয়া, ভাজের ব্যবহার, তেমন সরলান্তঃকরণ মেজভাইএর এরূপ পরিবর্ত্তন তাহার চঞ্চল হৃদয়কে অত্যন্ত ব্যথিত করিল। যে হৃদয় কখন শোক কি জানিত না, ক্রোধ যে হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই, হিংসার নাম পর্য্যন্তও যে কখন শুনে নাই তাহার সেই অভগ্ন হৃদয় আজ ভাঙ্গিল; কেতকিনী আজ শোকে অধীরা হইল তাহার অচ্ছিন্ন হৃদয়গ্রন্থি আজ হঠাৎ ছিন্ন হইয়া গেল। কেতকিনীর আর কল্যাণপুরে যাইতে মন সরিল না। ভাবিল কল্যাণপুরে আর কাহার নিকট যাইব। মেজভাই তো স্ত্রীর বশ, ভাজও তো এখন আমায় ভাল বেসে নিতে লোক পাঠিয়েছে, কিন্তু প্রখরা ভাজের নিকট গিয়া ভাবিবাতে যে আমার অদৃষ্টে কি আছে তাহা সেই অন্তর্যামী ভগবানই জানেন! যখন আপনার ভাইপোদের পৃথক্ ক'রে দিয়েছেন, সেই সোণার চাঁদদের পথের ভিখারী ক'রেছেন, তাদের যখন পর ভেবেছেন তখন আমিই বা

গিয়া দাঁড়াই কোথা? যাই হ'ক যখন নিতে পাঠিয়েছেন তখন যাই, তারপর আমার অদৃষ্ট আছে আর আমি আছি। না দেখ্‌তে পারে, না হয় ভাইপোরা যেখানে আছে সেই-খানে গেলেও আমি আশ্রয় পাবো। তারা কখনই আমাকে মেজ্‌দার মত দূর ক'রে দিতে পার্‌বে না। এই সকল ভাবিয়া অবশেষে যাওয়াই স্থির করিল।

জনার্দ্দনকে যত্নপূর্ব্বক খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া বলিল "আমার যেতে এখনও ৭।৮ দিন দেরি হবে। আমার এখানে একটু কাজ আছে।" জনার্দ্দন ভাবিল একবার অনেক কষ্টে এই পথ আসিয়াছি, আবার গিয়া আবার আসিতে পারিব না, এই ভাবিয়া সেও থাকিতে স্বীকৃত হইয়া বলিল "আমিও ত কল্‌কেতার সহর কখন দেখি নি, ইদিকে কখন এসি নি, তা এই ক'দিন থেকে সহরটা একবার পাইচারি ক'রে দেখ্‌বো।" জনার্দ্দনের এই কথা শুনিয়া কেতকিনী চলিয়া গেল।

জনার্দ্দন আট দিন তথায় থাকিয়া কলিকাতার সমস্ত দেখিল, সহরের মানুষ চিনিল, সহরের মানুষের সহিত মিশিল। এখন জনার্দ্দন আর সে জনার্দ্দন নাই। পূর্ব্ব-কথিত দোকানীর সহিত জনার্দ্দন প্রায়ই দেখা করিত। দোকানী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিল যে কিরূপে সেই লোকের এতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে! জনার্দ্দন আর এখন কলিকাতা বলিতে ভোলে না, সে আর এখন আমহার্ষ্ট-ষ্ট্রীটের অশোক মুখুয্যেকে আমাশয়ের ঔষধ বলে না, সে এখন অনেক পথিককে রাস্তা দেখাইয়া দেয়। পাঠক মহাশয়ও

আশ্চর্য্য হইতে পারেন যে কয়েক দিনের মধ্যে জনার্দ্দন কিরূপে এত পরিবর্ত্তিত হইল! কিন্তু তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

কলিকাতা সহর অতি ভয়ানক স্থান। এখানে বোবার মুখ ফোটে, অন্ধের চক্ষু হয়, বিধবার স্বামী হয়, মূর্খ পণ্ডিত হয়, দরিদ্র ধনী হয়, সাধু ডাকাত হয়, সতী অসতী হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়, বাঙ্গালী সাহেব হয় তখন আমাদের হাবা জনার্দ্দন যে মানুষ হবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহার ক্রমে দুষ্ট লোকেদের সহিত আলাপ হইতে লাগিল, গুণ্ডাদের সহিত মিশামিশি হইতে আরম্ভ হইল, ডাকাতদের সহিত ঘনিষ্টতা হইবার সূত্রপাত হইল। যাহা হউক ক্রমে আট দিন করিতে করিতে প্রায় পনর দিন কাটিয়া গেল। পনর দিনের মধ্যে জনার্দ্দন একটী দুষ্ট লোকের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিল। চুরি শিখিল, ডাকাতদের সর্দ্দার হইল। কেতকিনীর-ও কার্য্য গতিকে যাওয়ার বিলম্ব পড়িয়া গেল। জনার্দ্দনেরও কলিকাতা হইতে যাইতে আর মনে পড়িল না।

পঞ্চদশ খাপ।

কল্যাণপুর—কেতকিনী।

জনার্দ্দনের গৃহে ফিরিয়া আসিতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, কৃষ্ণলাল ও মেজবউ ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। আজ আসিবে কাল আসিবে করিয়া একপক্ষ অতীত হইল তথাপি জনার্দ্দন কেতকিনীকে লইয়া কল্যাণপুরে ফিরিয়া

আসিল না। মেজবউএর দুর্ভাবনার আর সীমা রহিল না। সর্ব্বদা নানাপ্রকার অমঙ্গল চিন্তা করিতে লাগিল। আর স্নেহের চাকরের জন্য রাত্রিদিন চ'কের জল ফেলিতে লাগিল। একবার ভাবিল পাগল ছাগল মানুষকে পাঠিয়েছি, কি হ'ল, কোথায় গেল, পথ ভুলে কোথাও গেল, না কি কেউ মেরিই ফেল্লে তাও ত বল্‌তে পারি না। সে তো সেই হাবা গোবা, কারও সঙ্গে ঝগড়াই ক'ল্লে, কি, কি তাও তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। রাস্তা ঘাট কিছুই জানে না, কোন্ রাস্তায় যেতে কোন্ রাস্তায় গিয়ে প'ড়্‌লো, কি, কি হ'লো আমি ত ভেবে কিছুই কুল কিনারা পাই না। রেলের গাড়ীতে সাহেব ত ধরে রাখ্‌তে পারে, তাও তো আশ্চর্য্য নাই। আমি হলুম এখানে সে হ'লো সেখানে, কি ক'রেই বা বুঝ্‌বো যে কি হ'লো। শুনেছি কল্‌কাতায় অনেক জোচ্চোর আছে, তা তার কাছে ত আর পয়সা কড়ি বেশী নাই, তবে জোচ্চোরে তার বা কি ক'র্ব্বে? তবে আস্‌ছে নাই বা কেন? মেজবউ এইরূপ মনে মনে কতখানা ভাবিতে লাগিল। মেজবউএর মন স্থির হইল না।

মেজবউ কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কৃষ্ণ-লালের নিকট গিয়া বলিল "ওগো, জনার্দ্দন আজও আস্‌ছে না কেন কিছু খবর বল্‌তে পার? হাবা গোবা লোককে পাঠিয়েছ, কার সঙ্গে কি ক'ল্লে তা তো কিছু বলা যায় না। আমি এই জন্যেই বলেছিলাম হাবা গোবা পাগল ছাগল মানুষকে ওসব কাজে পাঠিয়ে কাজ নাই। শুধু হাবা গোবা হ'লেও বাঁচ্‌তুম, আবার রাস্তা ঘাট কিছুই জানে না,

হয় তো কোন্ রাস্তায় যেতে কোন্ রাস্তায় গিয়ে প'ড়েছে। এখন উপায় কি তার ঠিক্ নাই। আমার কথা তো শুন্‌বে না, ব'ল্লেই রাগ কর কেবল বৈত নয়, গুণের মধ্যে ঐ গুণটুকু খুব আছে, ভাত দিতে পার্‌বো না, কিন্তু নাক কাট্‌বার গোসাঞি। এখন যাও আপনি গিয়ে তাকে খোঁজ ক'রে নিয়ে এস। আর কে যাবে বল আর কে আছে। কৃষ্ণলাল আম্‌তা আম্‌তা করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও কি করেন অর্দ্ধাঙ্গীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রত্যুষে কৃষ্ণলাল কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। বেলা ৯টা ১০টার সময় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পৌঁছিলেন। গিয়া প্রথমেই দেখিলেন যে তাহার স্নেহের চাকর জনার্দ্দন তখন সেখানে নাই। তাঁহার মনও তখন জনার্দ্দনকে না দেখিয়া অত্যন্ত অস্থির হইল। কেতকিনী তাহার গুণের মেজ্‌দা আসিয়াছে শুনিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে বসাইল ও ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা কিছু দিন পরে শোক ভুলিয়া গেলেও আপনার জন দেখিতে পাইলে আবার পুরাতন শোক নূতন করিয়া তোলে। কেতকিনী আজ তাহার মেজ্‌দাকে দেখিয়া ভাইদের শোক যাহা ক্রমেই পুরাতন হইয়া আসিতেছিল তাহাকে আবার নূতন করিয়া তুলিল। কেতকিনী আবার শোকে অধীরা হইল।

কৃষ্ণলাল! আজ আবার তুমি নির্ব্বাণ আগুণ কেন সতেজ করিতে আসিলে? কেন আজ তার সুখের পথ কণ্টকাবৃত করিতে আসিলে? কেন আজ অবীরা বিধবা রমণীকে শোকসাগরে ভাসাইতে আসিলে? তোমার কি কিছুমাত্র লজ্জা

বোধ হইল না। সে তো তোমার নিকট কোন অপরাধ করে নাই। সে যে অবলা, পতি পুত্র-হীনা বিধবা, তাহার দেহে যে পাপের লেশ মাত্রও নাই, তাহার নিষ্পাপ হৃদয়কে কেন আজ কলুষিত করিতে আসিলে? তাহার ভাইপোদের পৃথক্ করিয়া দিয়াছ তাহাতে কি সে সুখী হইয়াছে? তাহাতে তাহার মন কি তোমার উপর সন্তুষ্ট আছে? না, তাহা কখন মনেও করিও না। স্ত্রীলোকদের স্বভাব সেরূপ নয়, তাহাদের মন বড়ই কোমল, কোমলতার দিকেই তাহাদের মন টানে, কঠিনতার দিকে তাহারা ফিরিয়াও চায় না। তুমি লইতে আসিয়াছ, তোমার স্ত্রীর সুখের জন্য; কিন্তু তুমি বুঝিতেছ না যে তোমার তেমন মুখরা রায়বাঘিনী স্ত্রীর নিকট সে কতদূর সুখী হইবে!

কেতকিনী! তুমিও সাবধান, অমৃত ভাবিয়া গরল আশ্রয় করিও না, চন্দনতরুভ্রমে বিষবৃক্ষের ছায়ায় গিয়া বসিও না, রত্ন পাইব ভাবিয়া অসার সমুদ্রে ডুব দিও না, ভবিষ্যতে তোমার মঙ্গল কামনা কর, ইচ্ছা করিয়া বিষাক্ত সর্পের গর্ত্তে হাত দিও না। কিন্তু কেতকিনী এ সকল কিছুই ভাবিল না। কেবল যাহা সার ভাবিয়া রাখিয়াছিল তাহাই করিল;— ভাজের সহিত অমিল হয় ভাইপোদের নিকট যাইব। এই মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া নিশ্চিন্তা রহিল।

কৃষ্ণলাল কেতকিনীর নিকট জনার্দ্দনের খবর লইলেন, জানিলেন তাঁহার হাবা চাকর জনার্দ্দন আর এখন সে জনার্দ্দন নাই। সে এখন ডাকাতের সর্দ্দার হইয়াছে, গুণ্ডার সহিত আলাপ করিয়াছে কত লোকের খাতিরের

লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন কেহই তাহাকে ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে দেয় না। জনার্দ্দনের বাহাদুরী শুনিয়া কৃষ্ণলাল মনে মনে একটী নূতন পাপের আশ্রয় দিলেন, তাহা কি, পাঠক মহাশয় পরে জানিবেন। কৃষ্ণলাল আরও শুনিলেন যে কোন কার্য্যের গতিকে কেতকিনীর এতদিন যাওয়া হয় নাই। কৃষ্ণলাল এই সকল শুনিতেছেন এমন সময় জনার্দ্দন আসিল।

জনার্দ্দনকে দেখিয়া কৃষ্ণলাল হাসিতে হাসিতে বলিলেন— "কি জনার্দ্দন যে? কল্যাণপুরে আর যাবে না নাকি?"

জনার্দ্দন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "আঁ্যা, আঁ্যা, তা, তা আপনি আবার এয়েছেন কেন, আমি আজই যাব বলে মনে ক'রেছিলুম, তা এয়েছেন ভালই হয়েছে পিসি-মাকে আপনিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান, আমি আর তা'হলে যাই না।"

জনার্দ্দনের এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণলাল বলিলেন "তা ডাকাতদের দলে মিশেছ, তাদের দলের সর্দ্দার হয়েছ তা ত ভালই হয়েছে, তাতে আর কল্যাণপুরে যেতে কি? চল তোমার জন্য সেখানে বড়ই ভাব্‌ছে। একবার চল আবার তখন এলেই পার্‌বে। তোমার দলের লোকে না ছাড়ে না হয় তোমার বন্ধু বান্ধবদের বলে ক'রে বিদায় নিয়ে এস।"

জনার্দ্দন দেখিল তাহার মনিব সকলই জানিতে পারি-য়াছে। অবশেষে কোন মতে ছাড়াইতে না পারিয়া অগত্যা তাহাই করিল। কৃষ্ণলাল কেতকিনীকে লইয়া কল্যাণপুরে

আসিলেন। বলিতে হইবে না যে জনার্দ্দনও কৃষ্ণলালের সঙ্গে আসিয়াছিল। মেজবউ তাড়াতাড়ি আসিয়া কেতকিনীকে যত্ন করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেল। কৃষ্ণলালের মুখে জনার্দ্দনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের বিষয় শুনিল, শুনিয়া মেজবউ তাহাকে কিছুই বলিল না বরং আরও অধিক আনন্দ প্রকাশ করিল। আমরা বলিতে ভুলিয়াছিলাম যে কৃষ্ণলাল জনার্দ্দনকে কলিকাতায় পাঠাইবার পরদিনই এক চাকরাণী রাখিয়াছিলেন ; চাকরাণীর নাম "বিষয়া"। বিষয়া সংসারের সমুদায় কার্য্যই করিত, সুতরাং মেজবউকে আর তত পরিশ্রম করিতে হইত না। মেজবউ কেবল রন্ধন কার্য্যেই ব্যস্ত থাকিত। কিন্তু এখন কেতকিনী আসিয়া অবধি মেজবউকে আর তাহাও করিতে হইত না। মেজবউ আপনাকে মনে মনে সুখী বোধ করিতে লাগিল ও জগদীশ্বরকে সেই সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হইল না। কেতকিনীকে পাইয়া মেজবউ কিছুদিন সুখে ঘর সংসার করিতে লাগিল।

ষোড়শ প্রাপ।

ছিন্ন মুকুল।

এ সংসারে সুখ দুঃখের আকর নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। কিসে সুখোৎপত্তি হয় তাহা নিরূপণ করা অনেক সময়ে মনুষ্যের সাধ্যাতীত। যাহাকে আবার সুখের আকর ভাবিয়া আমরা মহোল্লাসে উল্লাসিত হই হয়ত সেই ঘটনাক্রমে অপার

দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আবার যাহাকে অসীম দুঃখের আকর ভাবিয়া আমরা বিষাদসাগরে মগ্ন হই ঘটনাক্রমে তাহাই আবার আমাদিগকে অসীম সুখসাগরে ভাসায়। তাই বলিতেছিলাম এ সংসারে সুখ দুঃখের আকর নিরূপণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইহা ঈশ্বরাধীন কার্য্য। ঈশ্বরাধীন কার্য্য না হইলে সুখ হইতে দুঃখ এবং দুঃখ হইতে সুখ কোথা হইতে আসিবে? হইতে পারে মনুষ্য ভ্রমান্ধ, সুখের আকরকে দুঃখের আকর এবং দুঃখের আকরকে সুখের আকর ভাবিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হয়। কিন্তু তত্রাচ মনুষ্য-জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যাহাতে সুখ দুঃখের আকস্মিক পরিবর্ত্তন কার্য্যকে ঈশ্বরাধীন কার্য্য বলিয়া স্বীকার না করিলে কোন মতেই চলে না। আমাদের এই উপন্যাস-লিখিত বাঁড়ুয্যে পরিবারের মধ্যে আমরা তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিব।

মেজবউএর সুখের সংসার আজ দুঃখের আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সংসার-রাজত্বে সুখকে পদচ্যুত করিয়া দুঃখই আজ একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, দুঃখ আজ তাহার সুখের পথ রুদ্ধ করিতে বসিয়াছে। মেজবউএর চিরসুখী হৃদয় আজ এই প্রথম দুঃখের মুখ দেখিল। মেজ-বউএর কিছুই ভাল লাগে না, কেবল কৃষ্ণার নিকট বসিয়া তাহারই মুখের দিকে সর্ব্বদা চাহিয়া আছে। আজ মেজবউ-এর হৃদয়াকাশে পূর্ণিমায় হঠাৎ অমাবস্যা দেখা দিয়াছে, আজ তাহার হৃদয়াকাশের একমাত্র পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইতে

বসিয়াছে। বিরজার একমাত্র হৃদয়নিধি কৃষ্ণা আজ ১১।১২ দিন বসন্ত রোগে আক্রান্তা। অজ্ঞান, অচৈতন্য সমস্ত গাত্র ফুলিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ বেদনা, গাত্রে হস্ত দেয় কাহার সাধ্য। কিছুই খাইতে পারে না, গাত্রদাহ অতিশয় প্রবল, বাক্‌রোধ, নিশ্বাস অতি ক্ষীণ। ৮ বৎসরের বালিকা আজ অপার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিছানায় শুইয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। পাশ ফিরিবার ক্ষমতা নাই। কেবল্ এক একবার জল পিপাসায় অস্থির হইতেছে, আর সময়ে সময়ে মাতার মুখের দিকে চাহিতেছে। কৃষ্ণলাল বাড়ীতে নাই। তিনি আজ ১৫।১৬ দিন হইল জমিদারের কার্য্যবশতঃ মফঃস্বলে গিয়াছেন, তিনি এ সংবাদ কিছুই জানেন না কারণ তিনি কোথায় আছেন তাহার ঠিকানা কেহই জানে না।

পাড়ায় কাহারও বাড়ী বিপদ আপদ হইলে অন্য কাহারও নিকট অপ্রকাশ থাকে না। মেয়ে পুরুষ সকলেই কৃষ্ণাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। মেয়েরা সকলেই দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল ও পরস্পর বলিতে লাগিল "উঃ! মায়ের অনুগ্রহ যখন হয়েছে তখন মা না দেখ্‌লে আর কে দেখ্‌বে বল? তিনি ভাল না ক'ল্লে আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা কৃষ্ণাকে ভাল দেখ্‌বো। স্বস্ত্যয়নাদি কর, মায়ের পূজা আচ্ছা দেও যদি মা মুখ তুলে চান্ তবেই মঙ্গল নতুবা মায়ের অনুগ্রহ একজনের উপর হ'লে বাড়ী শুদ্ধ আর কেহ বাকী থাকিবে না।" ডাক্তার সর্ব্বদাই আসিতেছেন, ঔষধ ব্যবস্থা করেন আর চলিয়া যান। হেম, কিশোরী প্রভৃতি ইহাদেরও কাকার বিপদের কথা শুনিতে বাকী রহিল না।

হেম ও শ্যাম ইহারা সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করে। আর কেহই নাই সুতরাং ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, ব্যবস্থামত ঔষধ সেবন করান সমস্তই হেম ও শ্যাম করিতে লাগিল। রোগীর প্রতি হেম প্রভৃতির যত্নের কোন ত্রুটী হইল না। কেনইবা হইবে? হাজার হ'ক্ রক্তের টান।

মেজবউ! আজ তুমি স্বচক্ষে দেখ, এমন রত্নদের তুমি অপমান ক'রে, তাহাদের দুঃখসাগরে ভাসিয়ে তুমি নিজে সুখী হইতে গিয়াছিলে কিন্তু তোমার অদৃষ্টে সুখ হইল কৈ? দেখ, তুমি যাহাদিগকে কাচ বলিয়া জলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলে শ্যাম জহুরি হ'য়ে তাহাদের রত্ন জানিয়া যত্ন ক'রে চাবি দিয়া রাখিয়াছিল তাই এখন তোমার এমন অসময়েও অনেক উপকারে আসিল।

কৃষ্ণলাল! তুমি দেখিতে পাইলে না যে যাহাদিগকে তুমি দুঃখের কাণ্ডারী করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলে তাহারা তোমাকে আজিও পর ভাবে নাই, তোমার স্ত্রীকে তাহারা আজিও তাহাদের মাতার ন্যায় স্নেহ করে, নতুবা আজ তোমার কন্যার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে এত যত্নের সহিত বাঁচাইবার চেষ্টা পাইবে কেন? তাহারা না থাকিলে তোমার এমন বিপদের সময় কে সাহায্য করিত? তোমার মন্ত্রী সেই জগদম্বা এখন কোথায়? জগদম্বা একবার কি দুইবার দেখিয়া যায় মাত্র তাহাও তুমি আসিয়া একবার দেখিয়া যাও। তাহারই কথায় এমন পরেশপাথরকে সামান্য প্রস্তর জ্ঞানে ফেলিয়া দিয়াছিলে!

স্ত্রীলোকের মন হাজার ক্রূর হ'ক্ না কেন, হাজার কাহারও সহিত শত্রুভাব থাকুক্ না কেন, বিপদের সময় সেরূপ খল, কপটতা, কি শত্রুতাভাব কিছুই দেখা যায় না। মেজবউ তাহার প্রকৃত চরিত্র গোপন করিয়া বলিল "বাবা হেম, বাবা শ্যাম, বাবা কিশোরী, হ্যাঁগা বড়্‌দিদি, কি হবে, আমার কৃষ্ণাকে আমি কি আর পাব না, আমার অদৃষ্টে আমার কৃষ্ণা কি বাঁচ্‌বে না?" তাহারা সকলেই মেজ-বউকে আশ্বাস দিয়া চলিয়া যাইত। কেবল হেম ও শ্যাম রোগীর নিকট থাকিত। মায়ের পূজা আচ্ছাও দেওয়া হইল।

আজ পনর দিন। রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। সমস্ত অঙ্গ হিম হইয়া আসিল, জীবনের আর আশা রহিল না। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন "অবস্থা বড়ই খারাপ, মা বুঝি এ যাত্রা রক্ষা করিলেন না" বলিয়া ডাক্তারের কার্য্য করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ডাক্তা-রের সাধ্য কি যে এ রোগ আরাম করিবে? যাহার রোগ সে না মনে করিলে এরূপ ভীষণ রোগ হইতে মুক্ত করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। রোগীর শরীর ক্রমশঃ অবশ হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে সকলের অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল! মায়ের অনুগ্রহে কৃষ্ণার আজ সংসারলীলা জনমের মত ফুরাইল। কৃষ্ণলালের অসাক্ষাতে তাঁহার জীবনরত্ন আজ দুরন্ত কৃতান্ত অসময়ে হরণ করিল! কৃষ্ণা আজ তাহার পিতা মাতাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল।

মেজবউ শোকে অত্যন্ত কাতর হইল। ধুলাই তাহার শয্যা হইল, উপবাসই তাহার জীবনের বন্ধু হইল, চিন্তাই তাহার অবলম্বন হইল। এতদিনে মেজবউ শোক কি তাহা জানিল, এতদিনে তাহার একমাত্র স্নেহের পুতলি তাহার হৃদয় অন্ধকার করিয়া অনন্ত রাজ্যে ক্রীড়া করিতে গেল, এতদিনে তাহার একটী বৰ্দ্ধিত মুকুল বিধাতা অকালে ছিন্ন করিল। তাহার কুটিলতার, তাহার পাপের, তাহার হিংসার শিক্ষা বিধাতা তাহাকে এই প্রথম শিখাইল।

হেম ও শ্যাম কৃষ্ণার সৎকার করিতে গেল, মুখ-অগ্নি হেমই করিল। তাহারা সৎকার করিয়া ফিরিয়া আসিলে মেজবউ আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আসিয়া মেজবউকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিল।

কেহ বলিল "কাঁদ্‌লে কি হবে বল, কাঁদ্‌লে ত আর ফিরে আস্‌বে না, তবে আর কেঁদে কেন নিজের শরীরটাকে নষ্ট কর বল? যার জিনিস সেই নিয়েছে। যিনি দিয়েছিলেন তিনিই কাড়িয়া লইলেন অতএব তার জন্য দুঃখ ক'রে তোমার নিজের মনকে কষ্ট দিলে আর কি হবে? তার প্রমাই ফুরিয়েছিল সে চলে গেল তাতে ত আর তোমারও কোন হাত নাই কি আমাদেরও কোন হাত নাই তবে আর তার জন্য বৃথা শোক ক'রে কি হবে?"

সকলের শেষে জগদম্বা ঠাকুরুণ বলিল "আমার কেষ্ট বেঁচে থাক্ আবার তোমার কৃষ্ণার মত অনেক কৃষ্ণা পাবে তার জন্য ভাবনা কি? এতে মানুষে ভেবে যদি কিছু ক'ত্তে

পাস্তো তবে এ পির্‌থিমিতে কি আর কারও কিছু দুঃখ থাক্‌তো? এখন যাও হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাওগে। আপনার শরীরকে শুকুলে আর কি হবে?"

এইরূপে বুঝাইয়া দু চারি জনে ধরিয়া হাত মুখ ধোয়াইয়া দিয়া বলপূর্ব্বক মেজবউকে কিছু আহার করাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। হেম প্রভৃতি সাধ্যমতে বুঝাইতে ক্রটী করিল না। কৃষ্ণার মৃত্যুর পর পাঁচ সাত দিন গেল। মেজবউও ক্রমেই শোক ভুলিতে লাগিল। ক্রমেই মেজবউএর শোকের আর কোন চিহ্ন রহিল না। কৃষ্ণলাল যত দিন বাড়ী ছিলেন না তত দিনই হেম তাঁহার খুড়িমাকে দেখিয়া যাইত। এখন আর কোন শোকের চিহ্ন নাই দেখিয়া হেম আর তত দেখিতে আসিত না। কৃষ্ণার মৃত্যুর পর দশ বার দিন গেল, কৃষ্ণলাল আজিও কল্যাণপুরে ফিরিলেন না।

সপ্তদশ ধাপ।

অভাবনীয় বিপদ—কালের মাহাত্ম্য।

কৃষ্ণার মৃত্যুর পর একপক্ষ অতীত হইল তথাপি কৃষ্ণলাল বাড়ী ফিরিলেন না। জনার্দ্দন কৃষ্ণলালের সঙ্গে গিয়াছে সেও ফিরিল না। মেজবউ কেতকিনী প্রভৃতি সকলেই চিন্তিতা। বাড়ীতে একটীও দ্বিতীয় পুরুষ মানুষ নাই যে তাহাদের সাবধান লয়। হেম এক একবার আসিয়া প্রায়ই দেখিয়া যাইত। একে কন্যার মৃত্যু তাহার উপর

আজ মাসাবধি কৃষ্ণলালের কোন সংবাদ নাই এই সকল কারণে মেজবউ কৃষ্ণার শোক ভুলিয়াও ভুলিতে পারিল না।

মনুষ্যের যখন সময় ভাল হয় তখন সকল প্রকারেই সুবিধা হয় আর যখন সময় মন্দ পড়ে তখন সাধ্যমতে চেষ্টা করিলেও যেন চারিদিক্ হইতে অমঙ্গল আপনা হইতে আসিয়া দেখা দেয়। মেজবউএর সময় এখন মন্দ পড়িয়াছে সুতরাং তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়া কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। মেজবউ আপনার অবস্থার বিষয় ভাবিতেছে আর কেতকিনীর নিকট বসিয়া আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া নানাপ্রকার দুঃখ করিতেছে। কেতকিনী মাঝে মাঝে মুচ্‌কে হেসে তাহার দুঃখের সহানুভূতি দেখাইবার জন্য থেকে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে আর মনে করিতেছে যে দর্পহারী মধুসূদন আজ হাতে হাতেই দর্প চূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এই ভাবিয়া কেতকিনী হাসিল, আর ভাবিল আরও যে দর্পহারী অহঙ্কৃতা মেজবউএর অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য কি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন এই ভাবিয়া কেতকিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মেজবউ স্বামীর মঙ্গলের জন্য দেবতাদের নিকট সর্ব্বদাই পূজা মানিতে লাগিল আর অস্থির হইয়া একবার ঘর আর একবার বা'র করিতে লাগিল ; এমন সময় ডাকহরকরা একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রখানি পাইয়া দেখিল কৃষ্ণলালের হাতের লেখা ; দেখিয়া মেজবউ যেন স্বর্গের চাঁদ

হ'তে পাইল। পত্র খুলিল; খুলিয়া পড়িয়া দেখিল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :—

মেজবউ——

আমি এখানে আসিয়া অবধি অত্যন্ত গোলমালে পড়িয়াছি। প্রজাদের সহিত টাকার জন্য সর্ব্বদাই বিবাদ করিতে হইতেছে। প্রজারা আমাকে অত্যন্ত শাসাইতেছে এবং নানাপ্রকার ভয় দেখাইতেছে। যখন বিপদ হয় তখন একটী বিপদ হইতে উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই আবার নূতন প্রকারের বিপদ আসিয়া দেখা দেয়। এদিকে প্রজাদের সহিত গোলমাল আবার জমীদারি কাগজ হিসাব নিকাষে পাঁচ হাজার টাকার গরমিল। এই সকল কারণে আমার যাইতে বিলম্ব হইতেছে। যাহা হউক একটা হইলে শীঘ্র ওখানে যাইব। তোমরা কিছু চিন্তা করিও না, আমি এখন শারীরিক ভাল আছি। জনার্দ্দন আমার সহিতই যাইবে। ইতি

তোমারই

শ্রীকৃষ্ণলাল।

পত্র পড়িয়া মেজবউএর মন পার পর নাই চিন্তাযুক্ত হইল। কি করিবে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। জগদম্বার নিকট গিয়া পত্রের মর্ম্ম সমুদায় বলিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল। জগদম্বাও নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিল। মেজবউ বাড়ী আসিয়া কেতকিনীকেও পত্র দেখাইল। কেতকিনী পত্র দেখিয়া হাঁ কি না কিছুই বলিল না। মেজবউএর মন কিছুতেই স্থির হইল না। পত্র পাইবার পর আরও সপ্তাহ কাটিল তথাপি কৃষ্ণ-

লালের কোন সংবাদ নাই। আট দিনের দিন প্রাতঃকালে জনার্দ্দন এক ব্যাগ হস্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

মেজবউ ব্যস্তসমস্ত হইয়া মুক্তকেশেই জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করিল "জনার্দ্দন! কি হয়েছে? তুমি অমন ক'রে হাঁপাচ্ছ কেন? শীঘ্র বল কি হয়েছে? আমার মন বড়ই অস্থির হয়েছে।"

জনার্দ্দন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "বাবুর বড় বিপদ, আসিতে আসিতে পথে অন্ধকার পাইয়া বাবুর মস্তকে কে লাঠি মারিয়াছে" বলিয়া জনার্দ্দন আর বলিতে পারিল না। জনার্দ্দনের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া মেজবউ বুঝিল প্রজাদের অত্যাচার তাহার স্বামীকে তদবস্থ করিয়াছে। মেজবউ জনার্দ্দনকে আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না কেবল মনে মনে স্বামীর অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টা অতীত হইল। আধ ঘণ্টা পরে মেজবউ শুনিল একখানি গাড়ী আসিয়া দরজায় থামিল। মেজবউ এবং জনার্দ্দন তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল কৃষ্ণলালের মস্তক হইতে অবিশ্রান্ত রক্ত বহিয়া পড়িতেছে আর হেম স্বহস্তে কাপড় দিয়া রক্ত মুছাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণলালের অবস্থা দেখিয়া মেজবউ মুর্চ্ছিত ও অচৈতন্য অবস্থায় ভূমিতে পতিতা হইল। হেম তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিল যে মেজখুড়িমার দাঁতকপাটী লাগিয়াছে; জনার্দ্দনকে জল আনিতে বলা হইল। জনার্দ্দন জল লইয়া

মুখে চ'কে দিতে দিতে, ফাঁকে লইয়া বাতাস করিতে করিতে অনেকক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। চৈতন্য হইলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া গৃহে রাখিয়া জনার্দ্দন ও হেম উভয়ে কৃষ্ণলালকে আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। মেজবউ কিছু সুস্থা হইলে কৃষ্ণলালের নিকটে বসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। হেম তাহার খুড়ার একপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া ডাক্তার আনিতে গেল। কৃষ্ণলাল বেদনায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন আর বাপ্‌রে মারে করিয়া অনবরত দেবতাদের নামোচ্চারণ করিতেছেন। ডাক্তার আসিয়া রোগীর অবস্থা বিশেষরূপে যত্নের সহিত দেখিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া " কোন ভয় নাই, শীঘ্রত আরাম হইবেন " বলিয়া আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেলেন। পাড়ার সকলেই দলে দলে দেখিতে আসিতেছে। কিশোরী, হেমের মা, শ্যাম, শ্যামের মা সকলেই কৃষ্ণলালের পীড়া শুনিয়া দেখিতে আসিল। বাঁড়ুযো বাড়ী আজ লোকে লোকারণ্য। হেম ঔষধ আনিয়া ব্যবস্থামত ঔষধাদি সেবন করাইতে লাগিল।

জগদম্বার মন [illegible] বড়ই খারাপ হইল। কৃষ্ণলালের কন্যার পীড়ার সময় [illegible] এত কষ্ট হইতে দেখা যায় নাই কিন্তু বাড়ীর কর্ত্তার [illegible] দেখিয়া জগদম্বার কষ্টের আর অবধি রহিল না। জগদম্বা প্রায়ই রোগীর নিকট সর্ব্বদা বসিয়া থাকিত। [illegible], হেমের মাতা ইহারা সকলেই ব্যস্ত কিসে কৃষ্ণলাল আরাম হন। আবার ডাক্তার আসিলেন। রোগীকে দেখিয়া ডাক্তার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক

সাহসের সহিত "আর ভয় নাই, আরাম হইয়াছেন" বলিয়া সকলকেই আশ্বাস দিলেন। ডাক্তারের মুখ দেখিয়া সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। ডাক্তার আবার নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। হেম ঔষধ আনিয়া ব্যবস্থা-মত কার্য্য করিল। আজ ১০ দিন। ক্রমেই রোগীর অবস্থা ভাল হইয়া আসিল। জগদম্বা ও পাড়ার আর আর সকলে দেখিতে আসিয়া অবস্থা অনেক ভাল দেখিয়া কেহ বা আনন্দে, কেহ বা বিষণ্ণ মনে চলিয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে জগদম্বা বলিল "আহা! কালীর ইচ্ছেয় ভাল হ'ক্, আহা! কেষ্ট আমার ভাল হ'লে কালীকে জোড়া মোষ দিয়ে পূজো দেবো।"

আর একজন কৃষ্ণলালের সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল "ভাইপোদের ভিন্ন ক'রে দিয়ে অবধি ওদের একদিনের তরেও মা মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গলে রাখ্‌লেন না। হাতে হাতে মেয়েটা ম'লো, আবার কর্ত্তার নিজের এই অবস্থা। আহা! এমন মারও মেরেছে! জমীদার সরকারে কাজ ক'ল্লেই পদে পদে বিপদ।"

জগদম্বা বলিল "ওর ভাইপোরাই ওর শত্রু। কি কুক্ষণেই যে ওরা জন্মেছিল, ওদের শাপেই এমন হ'চ্ছে।"

আর একজন জগদম্বার খোসামুদে কথা সইতে না পেরে বলিল "ওর ভাইপোরা ওর ব্যায়রামে অনেক ক'চ্চে, ওর মেয়ের ব্যায়রামের সময় বল্‌তে গেলে ওরা নিজেদের প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়ে করেছে, তবে ছুঁড়ীর অদেষ্টে বাঁচ্‌লো না তা আর তারা কি ক'র্ব্বে? কিন্তু ওরা ত যত্নের ত্রুটী করে নি?

অমন কথা ব'লো না বুড়োঠাকরুণ; তোমার তিনকাল গেছে এককালে ঠেকেছে, লোকের নামে মিথ্যা কথাটা কেমন ক'রে ব'ল্লে? ধর্ম্ম ত আছে, এখনও ত চন্দ্র সূর্য্য উদয় হ'চ্ছে, এখনও ত লোকে তুলসীর পূজো ক'চ্ছে অমন অধর্ম্মে কথা ব'লো না। ওদের যত্নেই এবার কর্ত্তা এমন একটা ফাঁড়া কাটিয়ে উঠ্‌লেন।”

এই কথা শুনিয়া জগদম্বা মুখ সিঁট্‌কাইয়া বলিল “ওসব কি আর কেউ বুঝ্‌তে পারে না, ওদের ও যত্ন আন্তরিক নয়, ও কেবল স্বার্থের জন্য।” এই সকল কথায় রাস্তা হাঁটার পরিশ্রম লাঘব করিয়া যে যার বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। কৃষ্ণলাল ক্রমেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীরে এখন আর কোন গ্লানি নাই। সন্ধ্যা সকাল দুবেলাই বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বেড়াইতে কৃষ্ণলাল মুখুয্যে বাড়ী গিয়া বসিলেন। কথায় কথায় জগদম্বা বলিল “ভাইপোদের ভিন্ন ক'রে দিয়ে তোমার একদিনের জন্যও ভাল গেল না, মেয়েটা ম'লো, আবার তোমার এই মরণাপন্ন ব্যাম?”

কন্যার মৃত্যু শুনিয়া কৃষ্ণলালের মন বড়ই ব্যথিত হইল। এ পর্য্যন্ত তিনি এ অশুভ সংবাদ শুনেন নাই, তাঁহার পীড়া বলিয়া কেহ তাঁহাকে বলেও নাই। তিনিও কন্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে সময় পান নাই। নিজের পীড়া লইয়াই ব্যস্ত অপরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন কি? জগদম্বার মুখে আজ কন্যার মৃত্যুর বিষয় শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া

রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে জগদম্বাই সে স্থানের নিস্তব্ধতা প্রথম ভঙ্গ করিল।

জগদম্বা বলিল "যাক্ সে বিষয় ভেবে আর কি ক'র্বে; যারা বেঁচে ব'য়ে আছে তাদের ভালর চেষ্টা কর। তোমার ভাইপোরাই তোমার শত্রু, তা না হ'লে ওদের পৃথক্ ক'রে ইস্তক তোমার এমন অমঙ্গল হয় কেন? এসব তাদেরই শাপ মন্যিতে হ'চ্ছে। তারা যে দেখ্‌ছো উঠে প'ড়ে বিপদের সময় তোমাদের রক্ষা ক'ত্তে আসে সে আন্তরিক নয়, সে কেবল তাদের স্বার্থের জন্য।"

জগদম্বার কথা শুনিয়া যেন কালের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্যই কৃষ্ণলাল বলিলেন "তা আমি জানি। আমার এখন নিশ্চয় বোধ হ'চ্ছে যে হেমটাই গুণ্ডা জোগাড় ক'রে আমার তেমন অবস্থা ক'রেছিল, নতুবা সে আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইল কিরূপে? আমি কোথায় আর সে কোথায়? সে এখান হইতে আমার অবস্থা জানিতে পারিল কিরূপে?"

পাঠক মহাশয়! কৃষ্ণলালকে যেখানে প্রহার করিয়াছিল সেস্থান হেমের বাড়ার অতি নিকটে সুতরাং হেম দূর হইতে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাইয়া নিকটে গিয়া দেখিল যে কাকার মস্তক হইতে অবিশ্রান্ত রক্ত পড়িতেছে। তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী আনিয়া কাকাকে তুলিয়া বাড়ী আনিল। কিন্তু রোগীর সে সময় জ্ঞান ছিল না কেবল হেম গাড়ীতে তুলিয়া লইল এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছিলেন, ঘটনা কোথায় হইয়াছিল তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই সেই

জন্যই হেমের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আজ কলিকালের নাম রাখিলেন। আমরা বলিতে ভুলিয়াছিলাম যে কৃষ্ণলাল আসিবার পূর্ব্বেই মেজবউ মুখুয্যে বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিল।

মেজবউ, জগদম্বা ও কৃষ্ণলালের কথা শুনিয়া বলিল "দিদি! সে কথা আর তোমায় বল্‌তে হবে না, আমার মেয়েটাকে তো ওরাই পাঁচজনে প'ড়ে মেরে ফেল্লে। ওরা না থাক্‌লে আমার মেয়ে কখন ম'রে যেতো না।" এই বলিতে বলিতে মেজবউএর মেয়ের শোক আবার নূতন হইল। মেজবউ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। জগদম্বা ও কৃষ্ণলাল মেজবউকে সান্ত্বনা করিল। মুখুয্যে বাড়ীর সভা রাত্রি নয়টার সময় ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যুগল-মিলনে বাড়ী আসিলেন। সেই দিন হইতে কৃষ্ণলাল ভাইপোদের অনিষ্ট চেষ্টায় রহিলেন।

অষ্টাদশ ধাপ।

বিপদের উপর বিপদ।

অধর্ম্ম করিয়া, মিথ্যা দোষে দূষিত করিয়া অমুকের অনিষ্ট করিব মনে করিলে ঈশ্বর যেন তাহার শাস্তি দিবার জন্য অমঙ্গলের বোঝা আনিয়া মস্তকের উপর স্থাপন করেন। আবার কখন সেই লোক কাহারও ইষ্ট করিব মনে করিলে সেইরূপ তাহার মনের কোর্‌কাপের জন্য তাহাতেও নানা বাধা আসিয়া পড়ে। আর ন্যায়পথে থাকিয়া যদি আদি

কাহারও ইষ্ট বা অনিষ্ট করিব মনে করি তবে ঈশ্বর স্বয়ং সে কার্য্যে সাহায্য করেন। কৃষ্ণলালের চরিত্রে আমরা এখন তাহাই দেখাইব।

কৃষ্ণলাল তাঁহার ভাইপোদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া অনিষ্ট চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু ঈশ্বর যে তাঁহার অমঙ্গলের চেষ্টায় আছেন তাহা তিনি স্বপ্নেও এক-বার ভাবেন নাই।

আজ ছয় দিন হইল মেজবউ ভয়ানক বসন্ত রোগে আক্রান্তা। সমস্ত গাত্র বেদনা, পাশ ফিরিতে পারে না, কথা কহিতে পারে না, গলার ভিতর পর্য্যন্ত বেদনা। জল পর্য্যন্ত গিলিতে কষ্ট বোধ হয়। কৃষ্ণলাল শুনিয়াছিলেন তাঁহার কন্যারও এইরূপ বসন্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। সর্ব্বদা মা শীতলা রক্ষা কর, আমরা তোমারই সেবক, আমা-দের আর কষ্ট দিও না বলিয়া দেবতাদের শরণাগত হই-লেন। কিন্তু দেবতারা শীঘ্র মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। কৃষ্ণলাল ডাক্তার আনিতে গেলেন। পথে হেমের সঙ্গে দেখা হইল। হেম তাঁহারই মুখে শুনিল যে খুড়িমার সঙ্কটাপন্ন পীড়া। হেম তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া দেখিতে আসিল।

কৃষ্ণলাল! তুমি এমন রত্ন আজিও চিনিতে পারিলে না? আজিও তোমার চক্ষু ফুটিল না? তোমায় ধিক্! তোমার ব্যবহারকেও ধিক্! তোমার প্রকৃতি জগতে অতীব নিন্দ-নীয়, তোমার ব্যবহার জনসমাজে নিতান্ত ঘৃণার্হ। তুমি স্বর্গের নিকটে গিয়া পাপী বলিয়া বহিষ্কৃত হইবে। তোমার

নরকেও স্থান হইবে না। ইহজগতে আর কেহ তোমার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ করিবে। অন্তিম কালে তোমার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইবে।

হেম আসিয়া দেখিল তাহার খুড়িমা অজ্ঞান, অচৈতন্য কেবল বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; দেখিয়া হেমের মন অত্যন্ত অস্থির হইল। নিকটে বসিয়া হেম কেবল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। জগদম্বাও নিকটে বসিয়া আছে। এবার জগদম্বা সর্ব্বদাই বাঁড়ুয্যে বাড়ী মেজবউএর্ নিকট বসিয়া আছে। জগদম্বা হেমের সহিত কোন কথাই কহিল না কিম্বা হেমকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। জনার্দ্দন একধারে বসিয়া অনবরত চক্ষের জল ফেলিতেছে। কেতকিনী শিয়রে বসিয়া তাহার গালে একটু একটু করিয়া জল দিতেছে। কৃষ্ণলাল ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তার রোগীর অবস্থা দেখিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনারা এত ভয় করিতেছেন কেন? আপনার কন্যার ন্যায় ইহার রোগ মারাত্মক নয়" বলিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন আর যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে রোগীকে যেন কোন প্রকারে বিরক্ত করা না হয় ও জল অধিক পরিমাণে না দেওয়া হয়। হেম ঔষধ আনিতে গেল। ঔষধ আনিয়া যথাবিধি সেবন করান হইল। চিকিৎসাও রীতিমত চলিতে লাগিল। রোগী কাহাকেও চিনিতে পারে না, কিছুই দেখিতে পায় না। ডাক্তার প্রায় দুবেলা আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন।

আজ ১৫ দিন। বসন্ত ক্রমেই পাকিয়া উঠিতে লাগিল, দুই একটা করিয়া গলিয়া যাইতেও আরম্ভ হইল। একটী একটী করিয়া ক্রমেই শুকাইতে লাগিল। রোগীর অবস্থাও ক্রমে ভাল হইতে দেখা গেল। অনেকের আশা হইল যে এযাত্রা রক্ষা পাইল, মা শীতলা এযাত্রা মুখ তুলিয়া চাইলেন। মেজবউএর শরীর ক্রমেই সুস্থ হইতে লাগিল। রোগী ২০ দিন পরে ভালরূপে আহার করিতে পারিল। শরীর ক্রমেই হৃষ্ট পুষ্ট হইতে লাগিল। মেজবউ এযাত্রা ঈশ্বরেচ্ছায় রক্ষা পাইল। হেম প্রভৃতিও যথাসাধ্য যত্ন করিতে ক্রুটী করে নাই!

আহা! যে ভাইপোরা কাকার জন্য মরে, কাকার জন্য বাঁচে, কাকার কিসে ভাল হয় সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল তাহাই প্রার্থনা করে, আর নিদারুণ, স্ত্রীপরবশ কাকা কিনা তাহাদের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতে ক্রুটী করেন না। কাকা তাহাদের ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন স্ত্রীকে সুখী করিবার জন্য, তাই বলিয়া কি তাহাদের কোথাও থাকিবার স্থান হয় নাই, না তাহারা সর্ব্বদাই দুঃখ ভোগ করিতেছে? কৃষ্ণলাল! তোমা অপেক্ষা তাহাদের দিন নিরাপদে, নির্ব্বিঘ্নে এবং সচ্ছন্দে কাটিতেছে। দুঃখ তাহাদের পবিত্র স্থানকে স্পর্শও করিতে পারে না, সুখ তাহাদের স্বর্গীয় হৃদয়ে, পুণ্যময় সংসারে সর্ব্বদা বিরাজমান। তাহারা ঈশ্বর-অনুগৃহীত জীব তাহাদের কোন অমঙ্গল সাধন করা তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর, অধার্ম্মিকের কার্য্য নহে। এজন্মে ত নয়ই, যদি পরজন্মে কখন নিষ্পাপ হৃদয় লইয়া জন্মিতে

পার তবে এমন নিষ্কলঙ্ক হৃদয়কে কলঙ্কিত করিতে পারিবে, এমন নির্দ্দোষ সংসারকে দূষিত করিতে পারিবে, এমন পবিত্র চরিত্রকে অপবিত্র করিতে পারিবে। যাহাহউক মেজবউ ক্রমেই পূর্ব্বের ন্যায় শরীর প্রাপ্ত হইল, কেবল মায়ের অনুগ্রহের জন্য সর্ব্বাঙ্গে কুটিলতার চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি দাগ চিরকালের জন্য রহিয়া গেল।

কৃষ্ণলাল সংসারের এইরূপ অমঙ্গল দেখিয়া এক দিবস জগদম্বাকে ডাকাইয়া বলিলেন "দিদি! কি করা যায় বল দেখি, কি করিলে এরূপ অমঙ্গলের শান্তি হয়।"

জগদম্বা বলিল "ভাল ভট্টাচার্য্য আনাইয়া হরিকে তুলসী দেও, স্বস্ত্যয়নাদি কর তবে ইহার শান্তি হইবে নতুবা আর ত কোন উপায় দেখিতে পাই না।" কৃষ্ণলাল অবশেষে তাহাই স্থির করিলেন।

কৃষ্ণলাল! তুলসীই দেও আর স্বস্ত্যয়নই কর মন পবিত্র না হইলে মঙ্গলের আশা করিও না। তোমার সংসারনাশিনী, কুলকলঙ্কিনী, কপটী স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য স্বস্ত্যয়ন কর আর দুশ্চরিত্রা, পক্ষপাতিনী জগদম্বাকে এই পৃথিবী হইতে দূর করিবার জন্য স্বস্ত্যয়ন কর ইহা ভিন্ন তোমার মঙ্গলের আর কোন আশা এজগতে, এই নিষ্পাপ জগতে নাই। এ উপদেশ এখন কৃষ্ণলালকে কে দেয়?

কৃষ্ণলাল জগদম্বার কথা শুনিয়া কাশীতোষ বিদ্যাভূষণকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কৃষ্ণলাল যেখানে কার্য্য করেন সেই জমীদারের একখণ্ড জমিতে কিছু খাজানা দিয়া বিদ্যাভূষণ বাস করিয়া থাকে। জমীদার

সরকারে কার্য্য করা হইতেই কৃষ্ণলালের তাহার সহিত আলাপ; ইহার উপর কৃষ্ণলালের অচলা ভক্তি ছিল। ইহাকে আনিবার জন্য কৃষ্ণলাল লোক পাঠাইলেন। এই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই আমাদের প্রথম ধাপের কাথত বিদ্যা-ভূষণ। ইহারই উপর কৃষ্ণলালের দৃঢ় ভক্তি। হবে না কেন? যে যেরূপ লোক হয় তাহার উপর সেই প্রকারের চরিত্রের লোকেরই ভক্তি ও স্নেহ হইয়া থাকে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আসিয়া স্বস্ত্যয়ন তুলসীদানাদি কার্য্য শেষ করিলেন। বিদ্যাভূষণের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে বিদায় আদায় লইয়া গৃহে যাইবার সময় কৃষ্ণলালের নিকট একটী প্রস্তাব করিয়া গেলেন; তাহা যে কি, তাহা আমরা পরধাপে বিস্তারিত বলিব।

উনবিংশ ধাপ।

কাশীতোষ বিদ্যাভূষণ।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামটী শুনিয়া বোধ হয় পাঠক মহাশয়েরও তাঁহার উপর কিছু পরিমাণে ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে! যদি তাহা হয় তবে আপনাকে আমরা কৃষ্ণলালের দলে ফেলিতে বাধ্য হইব। আর যদি না হয় তবে আপনিও বাঁচিলেন আমরাও বাঁচিলাম। যাহাহউক আমরা এখন বিদ্যাভূষণকে আপনার সহিত আলাপ করিয়া দিব আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করিবেন।

কৃষ্ণলাল যে জমীদার সরকারে কার্য্য করিতেন তাঁহারই জমিতে কিছু খাজানা দিয়া বিদ্যাভূষণ স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিত, ইহা আমরা পূর্ব্ব ধাপে বলিয়াছি। তাহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম পুত্রের বয়স পাঁচ বৎসর, দ্বিতীয় পুত্রের বয়স দুই বৎসর এবং কন্যার বয়স তিন বৎসর। বিদ্যাভূষণের স্ত্রী দেখিতে কিছু সুন্দরী ছিল কিন্তু হ'লে হবে কি তাহার পিত্রালয় পূর্ব্ব বঙ্গদেশে ছিল বলিয়া তাহার কথার কিছু তারতম্য ছিল। প্যারিমোহন নামে একটী বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক বিদ্যাভূষণের বাঁড়ীতে থাকিয়া চাকুরী করিত। প্যারিমোহনের বাড়ী বিদ্যাভূষণের শ্বশুর বাড়ীর নিকটে। প্যারিমোহন কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আপিসে চাকুরী করিত। বিদ্যাভূষণের সংসার খরচ প্যারিমোহন প্রায় সমস্তই দিত। বিদ্যাভূষণ নিজে কিছু দুশ্চরিত্রের লোক ছিল বলিয়া জমীদার তাহার উপর বিরক্ত হন। কৃষ্ণলালের বাড়ী স্বস্ত্যয়ন করিতে আসিবার দুই দিন পূর্ব্বে জমীদার তাঁহার জমি হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য পনর দিন সময় ধার্য্য করিয়া এক নুটিস দেন। বিদ্যাভূষণ কৃষ্ণলালের বাড়ী স্বস্ত্যয়ন করিতে আসিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত দুঃখ জানাইল। কৃষ্ণলালের মন তাহার দুঃখে গলিয়া গেল। কৃষ্ণলাল বিদ্যাভূষণের প্রতি দয়া করিবেনই ত। কৃষ্ণলালের দয়া সৎপ্রকৃতির উপর পড়িত না। তাঁহার ন্যায় চরিত্রের লোক না হইলে কৃষ্ণলালের কাহারও উপর দয়া হইত না। কৃষ্ণলাল এখনও জানিতে পারিলেন না যে তিনি কাহার উপকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইচ্ছা করিয়া যত্নপূর্ব্বক কাল-

সর্প পুষিতে যাইতেছেন তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যে এ উপকারের বিধিমত প্রত্যুপকার পাইবেন তাহা এখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কৃষ্ণলালের প্রতি বিদ্যাভূষণের কৃতজ্ঞতা পাঠক মহাশয় ক্রমেই জানিবেন।

বিদ্যাভূষণ কৃষ্ণলালের নিকট হইতে বিদায় হইবার সময় তাঁহার নিকট কিছু জমি ক্রয় করিয়া বাস করিবেন এইরূপ প্রস্তাব করিয়া যান, কৃষ্ণলালও তাহাতে স্বীকৃত হন। বিদ্যাভূষণ যেখানে থাকিত সেখান হইতে কৃষ্ণলালের বাড়ী প্রায় আধ ক্রোশ অন্তরে সুতরাং বিদ্যাভূষণের সর্ব্বদা কৃষ্ণলালের বাড়ী যাতায়াতেরও অসুবিধা হইত না। বিদ্যাভূষণ দুবেলা কৃষ্ণলালের নিকট হাঁটাহাঁটী করিতে লাগিল। কৃষ্ণলাল কি করেন মতিলালের নামে ক্রীত এক বিঘা জমি ছিল তাহারই অর্দ্ধেক তাহাকে বিক্রয় করিলেন। বিদ্যাভূষণের নিকট এই জমি বিক্রয় করিতে কৃষ্ণলালের ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যৎকিঞ্চিৎ খাজানা লইয়া তাহাকে বাস করিতে দেন, তাহাহইলে ব্রাহ্মণেরও উপকার করা হয়। কিন্তু বিদ্যাভূষণ ভবিষ্যতে অসৎকার্য্য পরিচালনার অভিপ্রায়ে জমিটী নিজের নামে রেজেষ্টারি করিয়া ক্রয় করিয়া লইল। বিদ্যাভূষণ ভাবিল যে যদি নিজের জমি না হয় তবে জমীদারের ন্যায় আমাকে আবার মনে করিলেই তুলিয়া দিতে পারিবে, এই ভাবিয়া অধিক খরচ করিয়াও জমিটী ক্রয় করিয়া সামান্য গোলপাতার ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিল। বিদ্যাভূষণ ক্রমেই কৃষ্ণলালের ভক্তির পাত্র হইয়া উঠিল, কৃষ্ণলালের বিশ্বাসও তাঁহার উপর দৃঢ় হইল।

কৃষ্ণলালের সংসারে স্বস্ত্যয়নের পর আর কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। এইজন্য মেজবউও বিদ্যাভূষণকে অচলা ভক্তি করিত, মুখুয্যে বাড়ীর সহিতও তাহার বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মিল। ক্রমেই তাহার সহিত সকলের আলাপ হইল। বিদ্যাভূষণ ভাল বলিয়াই তাহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইল। কিন্তু কয়লাকে যতই ধৌত কর তাহার মলিনত্ব কখনই যায় না, সর্পকে যত্ন করিয়া খাবার দিয়া পুষিলেও তাহার যে দংশনের স্বভাব তাহা কখনই যায় না, নিম্বকে যতই কচ্লাও, যতই পরিষ্কার কর তাহার তিক্তগুণ কখনই যায় না। স্বভাব সকলেরই মস্তকের উপর থাকে। "অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধি বর্ত্ততে।" হিতোপদেশের এই শ্লোক অকাট্য, যেখানে খাটাও সেইখানেই খাটে, যাহার প্রতি প্রয়োগ কর তাহার প্রতিই উপযুক্ত হয় অর্থাৎ অন্য সকল গুণকে অতিক্রম করিয়া স্বভাব সকলের মস্তকে থাকে। বিদ্যাভূষণও তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না। এখানে আসিয়াও কিছুদিনের মধ্যে তাহার প্রকৃতি অত্যন্ত জঘন্য হইয়া উঠিল; সে ব্রাহ্মণকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া উঠিল, পাড়ায় দুষ্টের শিরোমণি হইতে লাগিল। লিখিতে লজ্জা করে বেশ্যাই তাহার প্রণয়ের পাত্রী হইল। ক্রমেই সে একটী বেশ্যা রাখিল, সে বিদ্যাভূষণের জাতীয়া নহে তবে কোন্ জাতীয়া তাহা আমরা বলিতে পারি না; বেশ্যাই তাহার যজমান হইল। বেশ্যা যজমান করিয়া বিদ্যাভূষণ টাকার মানুষও হইয়া উঠিল।

জুয়াচুরি তাহার একমাত্র ব্যবসা হইল, পরের পরিবার প্যারিমোহনের হইল, তাহাও বিদ্যাভূষণ জানিত কিন্তু তাহার জন্য মনে ঘৃণা হওয়া দূরে থাকুক বরং আরও এইরূপ অসৎ কার্য্যে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করিল। তাহার পরিবারের অসৎ কার্য্যের বিষয় জানিয়াও বিদ্যাভূষণ বেশ্যা ছাড়িতে পারিল না। ফলতঃ কাশীতোষ অসৎ প্রকৃতির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। পাড়ার সকলেই একে একে জানিতে পারিল যে বিদ্যাভূষণ ছুঁচ হইয়া প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু ফাল্ হইয়া বাহির হইবে সুতরাং পাড়ায় তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি তদ্রূপ রহিল না। পাড়ার সকলের সহিত কলহে বিদ্যাভূষণ অদ্বিতীয় হইল। কাহারও সহিত তাহার সদ্ভাব রহিল না, বেশ্যার সহিতই তাহার বিশেষ সদ্ভাব রহিল। বেশ্যার বাড়ী ভিন্ন তাহার নিমন্ত্রণাদি হইত না, বেশ্যা ভিন্ন কেহই তাহাকে আর পূজা করিতে ডাকিত না, বেশ্যা না হইলে আবার তাহারও কোন কাজ কর্ম্ম হইত না। রাত্রি হইলে বেশ্যার বাড়ী থাকিত আর দিনের বেলায় বকা-ধার্ম্মিকের ন্যায় ধর্ম্মকার্য্য করিয়া বেড়াইত। লোক দেখান বাড়ীতে এক নারায়ণ রাখিয়াছিল। বেশ্যার বাড়ী হইতে আসিয়া সে নিজে নারায়ণের পূজা করিত। মিথ্যা কথা তাহার অঙ্গের ভূষণ হইল, আর পরের দ্রব্য অপহরণ তাহার জপমালা হইল। বাহিরে রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনলেপন, কুসুমচয়ন, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ত্রুটী ছিল না কিন্তু অন্তরে বিদ্যাভূষণের অসৎ বিদ্যার ছড়াছড়ি। কৃষ্ণলালও ক্রমে তাহার চরিত্রের বিষয় সকলই শুনিলেন

কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি তাহাকে ছাড়িতে পারিলেন না। কেবল পাড়ার মধ্যে বাঁড়ুয্যে বাড়ী আর মুখুয্যে বাড়ী বিদ্যাভূষণের খাতির রহিল। অপর সকলেই জানিল যে বিদ্যাভূষণ নামেই বিদ্যাভূষণ। কাশীতোষ ক্রমেই বেশ্যা-তোষ হইয়া দাঁড়াইল।

সামান্য লেখনীতে তাহার গুণের পরিচয় আর কত দিব। লেখনীতে পুস্তকাকারে অন্য সমুদায় গুণের বিষয় লিখিতে লজ্জা করে। এখন ভদ্রলোকে কেহই তাহার সহিত আর ভালরূপে আলাপ করে না। ছোটলোক, কাওরা, মুসলমান লইয়া তাহার কারবার চলিত। মুসলমান দুই একটী তাহার যজমানও হইল। আজ পাষণ্ড বিদ্যাভূষণের হাতে পড়িয়া দেবতাদের পর্য্যন্ত জাতির বিচার রহিল না। মুসল-মানের বাড়ী পর্য্যন্ত নারায়ণ লইয়া পূজা করিতে যাইত। বিদ্যাভূষণ! তোমার পরকালের গতি যে কি হইবে তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ? বিদ্যাভূষণের যদি কেহ কখন কোন উপকার করিত তবে তাহার পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক্ বরং তাহার পদে পদে সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিত। আমাদের কৃষ্ণলালের অদৃষ্টেও পরে তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি তাহাকে আশ্রয় দিলেন, তাহার অসময়ে যথেষ্ট উপকার করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাকে নানাপ্রকারে ফাঁকি দিতে, তাঁহার সহিত জুয়াচুরি করিতে, তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে বিদ্যাভূষণ কসুর করে নাই। লোকের টাকা হইলেই এইরূপ হইয়া থাকে। যখন লোকের টাকা না থাকে তখন সকলেরই খোসামোদ করিয়া বেড়ায়, সক-

লের নিকট হইতে উপকার প্রত্যাশা করিয়া বেড়ায় কিন্তু টাকা হইলে লোকের আর সে দিন মনে থাকে না। তখন কাহার কিসে সর্ব্বনাশ করিবে, কাহার জুয়াচুরি করিবে, কাহাকে কিসে ঠকাইবে কেবল সাধ্যানুসারে তাহারই পথ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব যখন এই-রূপ তখন বিদ্যাভূষণই বা না করিবে কেন? যাহা হউক বিদ্যাভূষণ ক্রমেই তাহার এই সকল অসৎ গুণের দরুণ পাড়ার কি ভদ্র, কি অভদ্র সকলেরই নিকট যথেষ্ট নিন্দনীয় হইয়া উঠিল। কেবল বেশ্যামহলে এবং নীচ ব্যক্তিদের নিকট তাহার কিছু পশার রহিল।

বিংশ ধাপ।

বসন্ত বেহারী।

অনেক দিন হইল আমরা হরলাল মুখুয্যের কোন সংবাদ লইতে পারি নাই, ঘটনাসূত্রে পড়িয়া আমাদিগকে নানা কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল সুতরাং হরলাল মুখুয্যের বাড়ীর কে কেমন আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমাদের সময় হয় নাই, মনেও হয় নাই। পাঠক মহাশয়! আসুন একবার মুখুয্যে বাড়ী বেড়াইতে যাই, তাহাদের কে কি করিতেছে আসুন দেখা যাউক।

আমরা হরলাল মুখুয্যের পুত্র বসন্ত বেহারীর নামকরণ করিয়াই রাখিয়া আসিয়াছি এপর্য্যন্ত তাহার আর কোন

খোঁজ খবর লই নাই, কেবল মাঝে মাঝে জগদম্বা ঠাক্‌রুণের কিছু কিছু খোঁজ খবর রাখিয়াছিলাম।

বসন্ত বেহারী এখন দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় বৎসরের হইয়াছে। পরিষ্কার আধ আধ কথা কহিতে শিখিয়াছে, চলিতে শিখিয়াছে, লেখা পড়া শিখিতেও আরম্ভ করিয়াছে। পাড়ায় এবাড়ী ওবাড়ী বেড়াইতে যাইতে শিখিয়াছে, লেখা পড়ার জন্য বাপ মার নিকট নানাপ্রকারের ওজর করিতে শিখিয়াছে, স্কুলে যাইতে শিখিয়াছে, স্কুলে সমপাঠীদিগের সহিত ঝগড়া করিয়া তাহাদের নামে মিথ্যা দোষ দিয়া শিক্ষকের নিকট হইতে তাহাদের মার খাওয়াইতে শিখিয়াছে। বাড়ীতে খাবার না পাইলে রাগ করিতে শিখিয়াছে আবার মিষ্ট কথায় বশীভূত হইতেও শিখিয়াছে।

বসন্ত বেহারী বাড়ীর কাহাকেও ভয় করিত না, কেবল জগদম্বাকে যমের ন্যায় দেখিত। কখন দৌরাত্ম্য করিতে করিতে যদি হঠাৎ জগদম্বাকে দেখিত তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ মলিন হইত ও ধীরে ধীরে পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিত। ভাল খাইব, ভাল পরিব সেদিকেও বিলক্ষণ ঝোঁক্ ছিল। পিতা মাতার কথা বসন্ত বেহারী কখন অগ্রাহ্য করিত না। তাঁহারা যখন যাহা বলিতেন তাহা তৎক্ষণাৎ করিতে আলস্য করিত না। জীব জন্তুর উপর তাহার অত্যন্ত মায়া দেখা যাইত। পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্ক বালকের ভক্তি দেখিলে সকলেই আশ্চর্য্য হইত। পিতা মাতা পূজা করিবেন বলিয়া বসন্ত বেহারী প্রাতঃকালে উঠিয়াই ফুল তুলিতে যাইত। অন্য অন্য বালকদের ন্যায় তাহার প্রাতঃ-

কালে উঠিয়া বাল্যভোজনের অভ্যাস ছিল না। ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়া কখন পিতা মাতাকে বিরক্ত করিত না। স্কুলে যাইব না বলিয়া কখন কোন ওজর আপত্তি তাহার ছিল না। পিতা মাতাকে কখন কোন উচ্চ কথা বলিত না, পিতা মাতাও তাহাকে কখন কোন বিষয়ের জন্য তিরস্কার করিতেন না। বসন্ত বেহারীর কোন দোষই ছিল না। অল্প বয়সেই বসন্ত বেহারী পাড়ায় একটী সৎ ছেলে বলিয়া সকলেরই নিকট বিলক্ষণ সুখ্যাতির পাত্র হইয়া উঠিল। পাড়ার সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। যেখানে যাইত কেহই তাহাকে কোথাও কোনপ্রকারে অনাদর বা অযত্ন করিত না।

বসন্ত বেহারী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলেও ঈশ্বর তাহার প্রতি বড়ই নির্দ্দয় ছিলেন। আজ দুই বৎসর হইল রক্ত আমাশয় রোগে বসন্ত বেহারীর শরীর আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার শরীর ক্রমশঃই শীর্ণ হইয়া আসিতেছে, মুখ বিবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ রক্ত হীন হইয়া পড়িতেছে। ডাক্তার, কবিরাজ কেহই কিছু করিতে পারিতেছে না। হরলাল মুখুয্যে টাকাও বিস্তর ব্যয় করিলেন কিন্তু পুত্রের রোগ কিছুতেই আরাম হইল না। নানা প্রকার ঔষধে তাহার শরীর গরম হইয়া উঠিয়াছিল। টোট্‌কা টাট্‌কাও কিছু বাকী ছিল না। ঔষধের দ্বারা কিছুদিন ভাল থাকে আবার কিছুদিন পরে পীড়ার বৃদ্ধি হয়। আহা! এত অল্প বয়সে এরূপ দুরন্ত রোগে বসন্ত বেহারীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তেমন হৃষ্ট পুষ্ট দেহ একেবারেই নিস্তেজ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। সে

এখন আর কিছুই খাইতে পারে না, পৃথিবীর ভাল মন্দ খাইবার জিনিস কিছুই আস্বাদন করিতে পায় না।

হায়! ঈশ্বর এমন সুশীল বালককে এত শৈশবাবস্থায় এমন দুরন্ত রোগ কেন দিলেন? তাঁহার কি এই সুবিচার হইল? সে কি পূর্ব্বজন্মে কোন পাপ করিয়াছিল সেই পাপেই কি এত অল্পবয়সে তাহাকে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে? এত রোগ, তথাপি বালক বলিয়া সর্ব্বদা আহ্লাদে বেড়াইয়া বেড়ায়। বাড়ীর সকলেই সর্ব্বদা বসন্ত বেহারীকে লইয়াই ব্যস্ত। জগদম্বা তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসে। তাহার তেমন দুরন্ত রোগের চিন্তায় জগদম্বা আর সে জগদম্বা ছিল না, তাহার তেমন শরীর আধখানা হইয়া গিয়াছিল, তাহার আহার নিদ্রা কিছুই ছিল না কেবল রাত্রি দিনই বসন্ত বেহারীর জন্য ভাবিত।

জগদম্বা! তোমারই পাপে আজ তোমার প্রিয়দর্শনের এত যন্ত্রণা। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয় একথা কি তুমি জান না? তোমার এখন চারপো পাপ পরিপূর্ণ হইয়াছে সেই জন্যই বোধ হয় ছয় বৎসরের বালককে তোমার ভাল-বাসার বস্তু বলিয়া দুই বৎসর ধরিয়া এত যন্ত্রণার অংশ লইতে হইতেছে, নতুবা এত সদ্গুণের আধারস্থানীয় হইয়াও অল্প বয়সে তাহার প্রতি ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিতে-ছেন না কেন? আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি এ কেবল তোমারই পাপের ফল, আর কিছুই নহে।

যাহাহউক বসন্ত বেহারীর পীড়া কোন প্রকারেই আরাম হইতেছে না। ক্রমেই শরীর দুর্ব্বল হইতেছে, হস্ত

পদ নিস্তেজ হইতেছে, মুখ পূর্ব্বাপেক্ষাও বিবর্ণ হই-তেছে। রোগের এই সকল চিহ্ন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাই-তেছে দেখিয়া এক দিন সন্ধ্যার পর হরলাল মুখুয্যে পাড়ার কয়েকটী ভদ্র লোককে ডাকাইলেন, ডাক্তার কবিরাজকেও ডাকান হইল, জগদম্বা, কৃষ্ণলাল, মেজ-বউ সকলেই একস্থানে বসিয়া কি করা যাইবে, কি করিলে ভাল হইবে তাহারই মীমাংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই কিছু সুপরামর্শ দিতে পারিল না। জগদম্বা, মেজবউ ও অন্য অন্য স্ত্রীলোকগণ অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া দেবতাদের স্মরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ডাক্তার কি কবিরাজ কেহই এপর্য্যন্ত কোন কথা বলেন নাই। সকলের মতামত শুনিয়া, সমুদায় আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া, হরলালের অবস্থার বিষয় আগাগোড়া ভাবিয়া ডাক্তার বলিলেনঃ—

"দেখুন হরলাল বাবু, অনেক দেখা গেল, অনেক ঔষধ দেওয়া গেল, অনেক চেষ্টা করা গেল, টোট্‌কা টাট্‌কাও করিতে কিছু বাকী রহিল না তথাপি আপনার পুত্রের রোগ ত কোন ক্রমেই আরাম হইল না। আমাদের যত দূর সাধ্য আমরাও প্রাণপণে সকল প্রকার চেষ্টাই ত করিলাম কিন্তু রোগের সিকিও কমাইতে পারিলাম না। আর যে ঔষধের দ্বারা কমিবে সে আশাও নাই। এখন আর কোন উপায় ত নাই, কেবল একটী উপায় আছে, যদি করিতে পারেন তবেই ঈশ্বরেচ্ছায় এখনও আরাম হইবার আশা আছে।"

হরলাল এই কথা শুনিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন "ডাক্তার মহাশয়! বলুন, বলুন কি উপায় আছে। উপায় যদি থাকে, বাঁচ্‌বার আশা যদি এখনও থাকে, সাধ্যই হউক আর অসাধ্যই হউক, টাকা যতই লাগুক আমি সমুদায়ই করিতে এখনই প্রস্তুত আছি।"

ডাক্তার বলিলেন "না অসাধ্য এমন কিছু নয়, তবে কিছু টাকার দরকার বটে।"

হরলাল ডাক্তারের কথা শুনিয়া বলিলেন "যদি আমি আমার ছেলে পাই তবে টাকার জন্য ভাবি না, এত গেছে না হয় আরও কিছু যাবে।"

ডাক্তার তখন কতক আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন "দেখুন, এই সম্মুখে ফাল্গুন মাস। যদি আপনার পুত্রকে এই ফাল্গুন মাস পড়িতে পড়িতেই পশ্চিমে লইয়া গিয়া হাওয়া বদল করাইতে পারেন তবে এ সমুদায় রোগের তাহা অপেক্ষা প্রধান ঔষধ আর কিছুই নাই। পশ্চিমের হাওয়া সর্ব্বদাই ভাল; আবার স্থলবিশেষে কোন কোন স্থান কোন কোন সময় মন্দ হয় বটে কিন্তু এই ফাল্গুন মাস পড়িলে পশ্চিমের অধিকাংশ স্থান অতি মনোহর হয়। সেখানে হাওয়া বদল করাইলে আমি বলিতে পারি নিশ্চয়ই আরাম হইবে। আমাদের ডাক্তারি মতে যদি কোন ঔষধে কিছু না হয় অবশেষে হাওয়া বদলই আমাদের শেষ ঔষধ। আমরা সর্ব্বশেষে হাওয়া বদলের ব্যবস্থাই দিয়া থাকি।"

এই কথা শুনিয়া সকলেরই মনে যেন একটু আশার সঞ্চার হইল, সকলেরই মনে কথাটা কিছু ভাল বলিয়া বোধ

হইল। হরলালের মনেও দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে হাওয়া বদলে নিশ্চয়ই আরাম হইবে।

স্ত্রীলোকেরা তখন এই কথা শুনিয়া পরস্পর কত কি বলাবলি করিতে লাগিল। একজন বলিল "ওপাড়ার নবীন রক্ত-আমাশয় রোগে এখন যায় তখন যায় হইয়াছিল, বড় বড় ডাক্তারে পর্য্যন্ত জবাব দিয়েছিল। কত ঔষধ পত্র ক'ল্লে, কত দেবতার পূজা মান্‌লে কিছুতেই কিছু হ'লো না, তার পর হাওয়া বদল ক'ত্তে নিয়ে গেল। ওমা পশ্চিমে একমাস থেকে সে দিব্যি আরাম হয়ে এলো। এখন সে বেশ বেড়াচ্ছে, চেড়াচ্ছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, কোন অসুখ নাই। এখন তাকে দেখ্‌লে আর সে নবীন ব'লে বোধ হয় না।"

এই কথা শুনিয়া আর একজন অমনি বলিয়া উঠিল "কেন ওদের হ'রের মার হ'রে, সে ত এই ব্যায়রামে দশ বৎসর ভুগেছে, তার শরীলে আর কিছুই ছিল না, হাড়গুলি এক একখানা ক'রে গোণে নেওয়া যেত। সে হাওয়া বদল ক'রে এসে তার শরীলে এখন আর কোন রোগ নাই, বেশ মোটা সোটা হয়েছে।"

আর একজন অমনি তখন তাড়াতাড়ি বলিল "ওদের গৌরেকে জান ত দিদি, তার এ ব্যায়রাম নয়। তার এর চেয়ে সর্ব্বনেশে ব্যায়রাম, যক্ষ্মাকাশী। সকলেই বলে যে সে রোগ শিব সাক্ষাৎ হ'লেও আরাম হয় না কিন্তু সেই কঠিন রোগ থেকেও সে হাওয়া বদল ক'রে সেয়ে উঠ্‌লো। তার এখন বেশ শরীর হয়েছে।"

তখন জগদম্বা বলিল "আহা এত লোকের এত ব্যায়রাম আরাম হ'চ্ছে আর শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে এর পাঁচটা নয় সাতটা নয় একটা ছেলে গা তাও কি ভাল হবে না।" তখন সকলেই "হবে বৈকি" বলিয়া আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেল। হরলালের বাড়ীর সভা ভঙ্গ হইল। ফাল্গুন মাসে বসন্ত বেহারীর হাওয়া বদলের ব্যবস্থাই স্থির হইল।

একবিংশ খাপ।

হাওয়া বদল।

আজ ফাল্গুন মাস, বসন্তকাল। সন্ধ্যাকালের ফুর্‌ফুরে বাতাসে বিরহীর প্রাণ আকুল হইতে লাগিল। কোকিলের কুহুরবে বিরহিনীর প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া কোকিলের স্বরের সহিত তালে তালে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। শীতকালেব বাতাসে কেহই ঘরের বাহির হইতে পারিত না, মাঘ মাসের হিম বাঘের ন্যায় বোধ হইত, এখন দক্ষিণে বাতাস পাইয়া মাঘ মাসের সেই দুরন্ত হিম আর কাহারও অসহ্য হয় না। গাছের পাতা সমুদায় ঝরিয়া গিয়াছিল, বসন্তকাল পাইয়া নূতন কচি কচি পাতায় তাহারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহারা যেন এতদিন পরে নব নব অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া পতিসমাগমের আশায় মৃদুমন্দ সমীরণে নূতন নূতন শোভায় শোভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। উজ্জ্বল এবং মনোহর নদী সকল বসন্তকালের প্রাতঃকালীন আকা-

শকে প্রতিবিম্বিত করিতেছে। বেল, যুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি নানাপ্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

সন্ধ্যার পর দাঁড়ী মাঝিগণ বসন্ত-সমীরণে গঙ্গাবক্ষে নৌকার উপরিভাগে নানাপ্রকার স্বরে গান করিতেছে। নব্য ইয়ারগণ কেহ কেহ গঙ্গার ধারে বসিয়া ঝুর্‌ঝুরে বাতাসে নানাপ্রকার বিরহিণীর টপ্পা, নিধুর টপ্পা মান-ভঞ্জন গান করিয়া যুবতীদিগের মন হরণ করিতেছে। আবার কেহ বা গঙ্গার সেতুর উপর মলয় বায়ু সেবন করিতেছে ও বার-বিলাসিনীদিগের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছে। বাগানে নানাপ্রকার ফুল ফুটিয়াছে, মলয় বায়ু তাহাদের সুগন্ধ বহন করিয়া পথশ্রান্ত পথিকদিগের তাপিত প্রাণ সুশীতল করিতেছে।

নবযুবতীগণ বসন্তকাল পাইয়া পতিসহবাসসুখে নিদ্রা যাইতেছিল, প্রাতঃকালে কোকিলের স্বরে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে কোকিলের প্রতি অসন্তুষ্টা হইয়া তাহাদের কত কি বলিতেছে। নূতন পত্রে শোভিত বৃক্ষশাখা গুলি রাস্তার উপরে পড়াতে যেন বোধ হইতেছে প্রকৃতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের নূতন পোষাক পরিধান করাইয়াছেন। কীট পতঙ্গদিগের রবে যেন বোধ হইতে লাগিল বসন্ত–সমীরণ নবজীবন পাইয়া প্রকৃতির সহিত কথা কহিতেছে। কল-কল–নিনাদিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পথের ধারে থাকিয়া প্রকৃতির অন্য অন্য স্বরের সহিত তাহাদের সেই সুন্দর স্বরকে একত্রমিল করিয়া আপনার মনে বহিয়া যাইতেছে। প্রবীণারা

সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে রোয়াকে বসিয়া বসন্তের সমীরণ সেবন করিতেছে আর বালকদিগকে ভূতের গল্প, এক রাজার দুই রাণী, সো আর দো ইত্যাদি গল্প শুনাইতেছে।

পক্ষিগণ শীতকালে পক্ষহীন হইয়া অতি কষ্টে শীত কাটাইয়া এখন নব পক্ষযুক্ত হইয়া যেন শীতকালকে দেখাইবার জন্য গা ফুলাইয়া পাখা নাড়িতে নাড়িতে উড়িয়া যাইতেছে। দরিদ্রগণ জীর্ণ কান্থামাত্র আশ্রয় করিয়া শীত কালের লম্বা রাত্রি যোগে যাগে কাটাইয়াছিল, এখন তাহারা দক্ষিণের মলয় বাতাসে শীত কালের কষ্ট ক্রমশঃই ভুলিতে লাগিল। নব বিধবাগণ বসন্ত কালের সুখের সমীরণে দুঃখিত হইয়া অন্যের নিকট আপন আপন পতির গুণপনা বর্ণন করিতেছে। বিরহিণীগণ কোকিলের স্বর শুনিয়া ছোট রাত্রি বলিয়া সেই স্বরের বিপক্ষে কত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। এই কালে সকলকেই হৃষ্ট পুষ্ট, সকলকেই প্রফুল্ল হইতে দেখা যায় কিন্তু ঝিল, বিল, পুষ্করিণী ইহারা ইহাদের তীরস্থিত বৃক্ষ লতাদির শোভা দেখিয়াই যেন হিংসাতে ক্রমেই শুষ্ক হইতে থাকে। আম্রবৃক্ষ সমুদায় নব মুকুলে সুশোভিত হইয়া ক্ষুধার্ত্ত ভ্রমর, মধুমক্ষিকাদিগকে মধু দান করিয়া তাহাদের ক্ষুধার শান্তি করিতেছে। এমন ফাল্গুন মাসের বসন্ত-সমীরণে সকলেই সুস্থ ও হৃষ্ট পুষ্ট হইল, বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী সকলেরই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হইল কিন্তু আমাদের বসন্ত বেহারীর শরীর সমভাবেই রহিল, কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না।

হরলাল একদিন জগদম্বাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ মা, এই ত ফাল্গুন মাস, দিনও সন্নিকট, পশ্চিমে ত আমাদের যেতেই হবে কারণ বসন্ত ত আজিও আরাম হইল না। এবিষয়ে তুমি কি মত কর?"

জগদম্বা বলিল "ইহাতে আর মতামত কি, না গেলেও আরাম হওয়া কঠিন। এত টাকা ত খরচ হয়েছে না হয় আরও কিছু খরচ হবে। সর্ব্বস্ব দিলেও যদি ছেলে পাওয়া যায় তবে আর তাতে কৃপণতা ক'ল্লে চল্‌বে কেন? তোমার টাকায় না কুলিয়ে ওঠে তবে আমার যা কিছু আছে তাই নিয়ে যাও, আমি ত ওকে দেব বলেই রেখেছি, ও যদি নাই বাঁচ্‌লো তবে আমি আর সে টাকা রেখে কি কর্ব্বো বলো। এখন যাতে বাঁচে তাই ত ক'ত্তে হবে।"

হরলাল বলিলেন "দেখ, কেবল আমি আর বসন্ত গেলে ত আর হবে না, রোগীর সঙ্গে একজন মেয়ে মানুষ না গেলে কোন মতে চল্‌বে না। সুতরাং আমার মতে আমি, বসন্ত আর বসন্তের গর্ভধারিণী এই তিন জনে যাওয়াই উচিত বলে বোধ হচ্ছে।"

হরলালের পরিবারের মধ্যে হরলালের সৎশাশুড়ি, বসন্ত আর তাঁহার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। সুতরাং হরলালের কথা শুনিয়া জগদম্বা রাগিয়া বলিল "আমার বুঝি এই বুড়ো বয়েসে তীর্থি ধর্ম্ম কিছুই হবে না, তোমরাই মাগ ভাতারে গিয়ে তীর্থি করে আস্‌বে?"

জগদম্বার কথা শুনিয়া হরলাল দুঃখিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "মা আমরা ত সখ করে তীর্থ ক'ত্তে যাচ্ছি না, আমরা

কেন যে যাচ্ছি তা কি তুমি জেনেও জান না, জেনেও এমন অসময়ে, এমন বিপদের সময়ে অন্যায় কথা কেন বল্‌ছো?” এই রূপে কথায় কথায় দুই পক্ষে একটী প্রকাণ্ড কলহ বাধিয়া গেল। কলহের শব্দ শুনিয়া কৃষ্ণলাল, মেজবউ তাড়াতাড়ি আসিয়া ঝগড়ার কারণ শুনিয়া জগদম্বাকে অনেক বুঝাইয়া ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। জগদম্বা ক্ষান্ত হইলে বিদ্যাভূষণকে ডাকাইয়া পশ্চিম যাত্রার দিন দেখান হইল। হরলাল ও কৃষ্ণলাল আজিও বিদ্যাভূষণকে পুরোহিত পদ হইতে বিচ্যুত করেন নাই কারণ তাঁহারা জানিতেন হাজার দোষ থাকিলেও সে ব্রাহ্মণ ত বটে। সেই ভাবিয়াই বিদ্যা-ভূষণকে ডাকা হইল। আগামী শুক্রবার যাত্রার শুভদিন বলিয়াই স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে শুক্রবার আসিল। হাওয়া বদলে যাইবার জন্য সমস্তই প্রস্তুত হইল। কিন্তু বাড়ী থাকে কে? জগদম্বা ত থাকিবে না বলিয়া প্রথমে অস্বীকার করিল। পরে হরলাল বাড়ী চৌকী থাকিবার জন্য একটী লোক ঠিক করিলেন দেখিয়া তখন জগদম্বা থাকিতে স্বীকার হইল। সমুদায় ঠিক হইলে জগদম্বার নিকট টাকা লইয়া হরলাল, বসন্ত বেহারী, আর তার মা এবং একটী চাকর শুভদিনে শুভক্ষণে বেলা নয়টার সময় হাওয়া বদলের জন্য পশ্চিম যাত্রা করিলেন।

জগদম্বা নিজের ইচ্ছায় হরলাল বাড়ীতে থাকিবার জন্য যে লোক ঠিক করিয়াছিলেন তাহাকে রাখিল না। জগদম্বা একাকীই রহিল। কৃষ্ণলালের বাড়ী নিজে রাঁধে আর খায়, রাত্রি হইলে কেবল বাড়ী চৌকী দিবার জন্য হরলালের

বাড়ী আসিয়া শুইয়া থাকে। হরলাল যাইবার সময় প্রধান প্রধান জিনিস পত্র চাবি দিয়া রাখিয়া চাবি জগদম্বার নিকটই রাখিয়া গেলেন। টাকা, কড়ি গহনা পত্র কোম্পানির কাগজ সমুদায় লোহার সিন্দুকে পুরিয়া জগদম্বা নিজেই চাবি দিয়া রাখিল। হরলাল পশ্চিম যাওয়া পর্য্যন্ত হরলালের বাড়ী আর কেহই পদার্পণ করিত না। হরলালের বাড়ী এখন ফাঁক্ হইল।

দ্বাবিংশ ধাপ।

পাপের পরিণাম।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জনার্দ্দন কলিকাতায় গিয়া ডাকাতের সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিল, অনেক গুণ্ডার সহিত আত্মীয়তা করিয়া আসিয়াছিল, ডাকাতদের সর্দ্দার হইয়াছিল। আরও বলা হইয়াছে যে জনার্দ্দন যে ডাকাতের দলের সর্দ্দার হইয়াছিল তাহারা জনার্দ্দনকে বিশেষ খাতিরও করিত। জনার্দ্দন এখন ডাকাতি করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করে। মাঝে মাঝে কলিকাতায় যায়, কিছুদিন সেখানে থাকিয়া আবার চলিয়া আইসে। এখন তাহার কলিকাতায় যাইতে আর তিন চারি দিন বিলম্ব হয় না, এখন আর সে দোকানীকেও জনার্দ্দন ভয় করে না। এখন সর্ব্বত্র জনার্দ্দন এক জন প্রধান দস্যু বলিয়াই বিখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণলালের বাড়ী থাকে আর এক এক বার কলিকাতায় যায়। কল্যাণপুরে

কেহ জনার্দ্দনের সহিত সহজে ঝগড়া করে না, পাছে সে কাহাকেও কিছু বলে কি কাহারও কিছু অনিষ্ট করে। কৃষ্ণলালও তাহাকে কিছু বলিতেন না। কিন্তু জনার্দ্দন কৃষ্ণলালকে প্রগাঢ় ভক্তি করিত।

জনার্দ্দনের দলীয় ডাকাতেরা একটী ডাকাতির জন্য পুলিস কর্ত্তৃক তাড়া খাইয়া জনার্দ্দনের সহিত কল্যাণপুরে আসিয়া একটী আড্ডা খুলিয়াছে। প্রায় এক মাস হইল জনার্দ্দন ডাকাতদের সহিত কল্যাণপুরেই ডাকাতের দল খুলিয়াছে। কেহই তাহাদের কিছু করিতে পারে না। জনার্দ্দনকেও আর কলিকাতায় যাতায়াত করিতে হয় না। একটী ডাকাতের দলের সহিত আলাপ হইলে কি কোন একটী ডাকাতের দলের সর্দ্দার হইলে অন্য অন্য দলের অনেক ডাকাতের সহিত আলাপ হইয়া থাকে। জনার্দ্দনেরও অন্য অন্য স্থানের অনেক ডাকাতের সহিত আলাপ হইয়া উঠিল। ডাকাতের সর্দ্দার বলিয়া সকলেই জনার্দ্দনকে বিশেষ খাতিরও করিত। জনার্দ্দনের কোন প্রয়োজন পড়িলে সকলে পড়িয়া জনার্দ্দনের কার্য্য উদ্ধার করিতে বিশেষ যত্নবান্ হইত। জনার্দ্দনও সেইরূপ সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিত, কোন দিন কোন বিষয়ের জন্য পরস্পরের মধ্যে কোন মনান্তর হইত না। ডাকাতি করিয়া যে যখন যাহা পাইত সমুদায় আনিয়া সকলেই জনার্দ্দনের নিকট দিত, জনার্দ্দন সকলকেই সমান ভাগ করিয়া দিত, তাহাতে কেহই কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইত না। জনার্দ্দন তাহাদিগকে যখন যাহা করিতে বলিত ন্যায় হউক আর অন্যায়

হউক, সাধ্য হউক আর অসাধ্যই হউক, আয়াসে হউক বা অনায়াসেই হউক আগাগোড়া কিছু অনুসন্ধান না লইয়াই, ভাল মন্দ কিছু বিচার না করিয়াই জনার্দ্দন বলিতেছে বলিয়া সে কার্য্য তাহারা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিয়া আসিত, পরে করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিত না।

জনার্দ্দন ক্রমে ক্রমে পরম্পরায় শুনিল যে হরলাল মুখুয্যের বাড়ী একাকী জগদম্বা শুইয়া থাকে আর কেহই থাকে না। জিনিস পত্র টাকা কড়িও বাড়ীতে লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া তাহারা সকলেই অনেক দিন হইল পশ্চিম চলিয়া গিয়াছে। জগদম্বার নিকটেই সমস্ত চাবি আছে। জনার্দ্দন একেই ত জনার্দ্দন, একে মনসা, তায় তার উপর আবার ধুনার গন্ধ পাইয়াছে. জনার্দ্দন এত দিন ফিকিতেছিল কিসে জগদম্বার মিথ্যা কথার প্রতিশোধ লইতে পারে।

প্রথমেই বলা হইয়াছে মেজবউ চাকরের সহিত কথা কহিত বলিয়া মিথ্যা করিয়া নানাপ্রকার অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া জগদম্বা জনার্দ্দনের তেমন নিষ্পাপ চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া একটী সংসার ছারেখারে দিয়াছে। জগদম্বাই তাহার মূল, জগদম্বাই তাহার নায়িকা। জনার্দ্দন তখন কিছুই বুঝিত না, নিতান্তই হাবা গোবা ছিল সুতরাং মেজবউএর সহিত কথা জনার্দ্দনের পক্ষে কোন মন্দ ভাবের ছিল না। এখন জনার্দ্দন ডাকাত হইয়াছে এবং সুবিধাও যথেষ্ট পাইয়াছে। জনার্দ্দন এখন জগদম্বার সেই পূর্ব্ব পাপের প্রতিশোধ লইবে বলিয়া মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প করিল।

জনার্দ্দন যখন যাহা মনে করিত তাহা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইত, সুবিধা পাইলে করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিত না। এখন জনার্দ্দন এরূপ সুবিধা শুনিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাত্রি দুই প্রহর। ষষ্ঠীর চন্দ্র ডুবিয়া গিয়াছে, নক্ষত্রগণ এতক্ষণ চন্দ্র আছে বলিয়া লজ্জায় কেহ কেহ লুকাইয়া ছিল, এখন চন্দ্র ডুবিলেন দেখিয়া একে একে দুই একটী করিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিল। জ্যোৎস্নাও সহচর চাঁদের বিরহে ভূতল পরিত্যাগ করিলেন। অন্ধকার আসিয়া ভুবন অধিকার করিয়া বসিলেন। পৃথিবী অঘোরা, রাত্রি গম্ভীরা, গৃহস্থের দীপমালা নির্ব্বাপিতা, রজনী শুক্লপক্ষীয়া হইলেও এখন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্না।

এইরূপ ঘোর দুই প্রহর রাত্রিতে জনার্দ্দন ডাকাতদের দলে গিয়া বলিল "ওহে আজ একটী শিকারে বাহির হইতে হইবে। কতকগুলি মশাল তৈয়ারি কর, গোটাকত পিস্তল ঠিক্ কর, কিছু কেরাসিন তৈল আর কিছু ঘৃতও সংগ্রহ করিয়া লও।" এ সমুদায় সর্ব্বদাই তাহাদের নিকটে থাকিত সুতরাং সংগ্রহ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তাহারা প্রায় ২৫ জন লোক ছিল, ২৫টা মশাল তৈয়ারি হইল। তাহাদিগের নিকট নানাপ্রকারের চাবিও সংগ্রহ করা থাকিত সে সমুদায়ও সঙ্গে করিয়া লইতে বলা হইল। যাহা যাহা করিতে হইবে জনার্দ্দন তাহা সকলকেই বুঝাইয়া দিল। সেখান হইতে আধ ক্রোশ দূরে আর একটী ডাকাতের দল ছিল, তাহারাও প্রায় ২৫ জন আসিয়া

যোগ দিল। সমস্ত সরঞ্জাম এক লহমার মধ্যে প্রস্তুত হইল।

ডাকাতদের একজন বলিল " রাত্রি কত ? "

জনার্দ্দন। রাত্রি এখন দুই প্রহর হইয়াছে।

দ্বিতীয় ডাকাত। তবে আর দেরি কেন ?

তৃতীয় ডাকাত। আর খানিক হ'ক্ না ?

চতুর্থ ড়াকাত। কেন ? আর খানিক হবার আবশ্যক কি ? এই ত বেশ সময়।

জনার্দ্দন। তবে আমি একবার দেখে আসি সকলে ঘুমুলো কি না।

পঞ্চম ডাকাত। তোরা মশাল কটা জ্বাল্।

ষষ্ঠ ডাকাত। ওকে আগে ফিরে আস্‌তে দেও তারপর মশাল জ্বালা হবে।

এই সকল কথার পর সকলেই ক্ষণেক নীরব হইল। খানিক পরে জনার্দ্দন ফিরিয়া আসিয়া বলিল " হাঁ সকলেই ঘুমিয়েছে। পাড়া নিস্তব্ধ। সকলেই আপনার আপনার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হও। "

জনার্দ্দনের এই কথাতে একজন ডাকাত আর একজনকে মশাল জ্বালিতে বলিল। মশাল জ্বালিবার কথা শুনিয়া আর একজন তাহাকে বলিল " যদি জল আসে ত নিবে যাবে। "

এই কথা শুনিয়া অমনি সকলে বলিল " কুচ্ পরোয়া নেহি। কালীর পূজো শেষ হয়েছে ত ? সকলেই কালী মায়ের পায়ের সিঁদুর মুখে বেশ ক'রে মাখ আর বিল্বপত্র ছোঁয়াও। " এই কথা বলিয়া " জয় কালীমায়ী কি জয় "

বলিয়া জনার্দ্দন আগে আগে আর অন্য সকলে জলন্ত মশাল হস্তে “ হারা—রা—রা—রা, জয় কালীমায়ী কি জয় ” শব্দে একটা ভয়ানক হাল্লা করিতে করিতে একেবারে মুখুয্যে বাড়ীর দরজায় উপস্থিত।

শব্দ শুনিয়া জগদম্বার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জগদম্বা উঠিতে উঠিতে সকলে দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল। জগদম্বা দেখিল বাড়ী একেবারে আলোকময় হই-য়াছে। তখন বুঝিল যে বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে। ডাকাতের শব্দে কেহই আর পাড়ায় নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমা-ইতে পারিল না। পাড়া ভাঙ্গিয়া মুখুয্যে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পঞ্চাশজন অস্ত্রধারী ডাকাতের সম্মুখে অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ-বিদারক তলওয়ারের ঝন্ ঝন্ শব্দ, ঘুর্ণিত বল্লমের সন্ সন্ শব্দ, লাঠির ঠকাঠক্ শব্দ, দরজা বাক্স ভাঙ্গার চকাচক্ শব্দ, ডাকাতের চীৎকার আর মধ্যে মধ্যে গেলামরে মলামরে প্রাণ যায়, রক্ষা কর, ডাকাত ডাকাত শব্দ হইতে লাগিল। গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোক ডাকাত ডাকাত বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কেহ কহিল “ আমার তলওয়ার খানা কৈ দে'ও ত। ” কেহ বলিল “ হ'রে চৌকিদার বড় খেলোয়ার তাকে ডাক। ” কেহ বলিল “ রামা সর্দ্দার বেঁচে থাকলে আজ ডাকাতেরা যায় কোথা ? ” কেহ ডাকাতদের শুনাইয়া কহিল “ বাড়ীর ডাল রুটী খেকো মেড়ুয়া দরওয়ান গুলো এসময় কোথা গেল ? জনার্দ্দন তাহাদের সে কথায় কর্ণপাতও করিল না কারণ সে জানিত যে বাড়ীতে কেহই

দরওয়ান থাকিত না আর থাকিলেই বা তাহারা ভয় করিবে কেন? কেননা তাহাদের পঞ্চাশ জনের সম্মুখে যায় কে? গ্রামশুদ্ধ লোক সকলেই অনেক আস্ফালন করিতে লাগিল বটে কিন্তু কেহই ডাকাতদের কিছু করিতে পারিল না। তাহারা সমুদায় বাক্স ভাঙ্গিয়া জিনিস পত্র বাহির করিল। পরে জনার্দ্দন আসিয়া জগদম্বাকে বলিল "লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় আছে দে।" জগদম্বা দেখিল যে জনার্দ্দন সম্মুখে। তখন সাহসে ভর করিয়া বলিল "জনার্দ্দন তোর পায়ে পড়ি চাবি দিচ্ছি আমায় প্রাণে মারিস্ না" বলিয়া লোহার সিন্দূকের চাবি বাহির করিয়া দিল।

জনার্দ্দন তখন বলিল "জগদম্বা কেন এখন পায়ে পড় কেন? তখন আমার নামে মিথ্যা দোষ দিয়া একটা সংসার ছারেখারে দিয়াছ তা কি এখন মনে পড়ে না?" বলিয়া জলন্ত মশাল লইয়া জগদম্বার মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল। জগদম্বা "বাপ্‌রে" বলিয়া চীৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। তখন সকলে তাহার গায়ে কেরাসিন তৈল আর ঘৃত ঢালিয়া দিয়া আগুণ ধরাইয়া দিল। জগদম্বা জীবন্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তখন জনার্দ্দন লোহার সিন্দুক খুলিয়া সমুদায় গহনা পত্র টাকাকড়ি কোম্পানির কাগজ যাহা কিছু ছিল সমুদায় বাহির করিয়া লইয়া দলবলের সহিত চলিয়া গেল। এতদিন পরে সকলেই জানিতে পারিল যে জগদম্বাই বাঁড়ুয্যে সংসার ভাঙ্গিবার মূল। হেম প্রভৃতিও জানিল যে জগদম্বাই খুড়িমার একমাত্র মন্ত্রী সুতরাং জগদম্বার এরূপ নৃশংস মৃত্যুতে কেহই সহানুভূতি দেখাইল না। কেবল

কৃষ্ণলাল আর মেজবউ জগদম্বার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল। কিন্তু জনার্দ্দনকে তাহার এত বড় একটা দোষের জন্য কৃষ্ণলাল প্রভৃতি কেহই কিছুই বলিলেন না। কেতকিনী জগদম্বার জন্য কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিল না, বরং মনে মনে বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। এতদিনে কৃষ্ণলাল ও মেজবউএর প্রধান মন্ত্রীর পৈশাচিক পাপের পরিণাম হইল। এতদিনে জনার্দ্দন কর্ত্তৃক তাহার পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হইল। পৃথিবী একটা ভার হইতে এতদিনে মুক্তা হইলেন। বাঁড়ুয্যে ও মুখুয্যে সংসারের বিধাতা জগদম্বা আজ নৃশংসরূপে ডাকাতের হাতে প্রাণ ত্যাগ করিল। ঈশ্বর তাহাকে হাতে হাতে তাহার পাপের শাস্তি দিলেন! জগদম্বা মনেও কখন ভাবে নাই যে জনার্দ্দনই তাহার জীবন-নাটকের অভিনয় এইরূপ নিষ্ঠুর-ভাবে এইখানে শেষ করিবে। জনার্দ্দন যে সমস্ত জিনিস পত্র আনিয়াছিল সমস্তই সকলকে সমান ভাগ করিয়া দিল কেহই তাহাতে অসন্তুষ্ট হইল না। যে যাহা পাইল তাহা-তেই সকলে সন্তুষ্ট হইয়া নিজ নিজ কাজে চলিয়া গেল।

জনার্দ্দন! তুমি আজ সমস্ত জগৎকে শিক্ষা দিলে যে এরূপ পৈশাচিক পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত কি? এরূপ নিষ্কলঙ্ক পবিত্র সংসারকে অপবিত্র করিলে তাহার শাস্তি আজিও জগতে আছে কিনা? যাহাহউক এতদিনে এইরূপ শিক্ষার সহিত জনার্দ্দন তাহার প্রতিহিংসার আশা মিটাইল।

ত্রয়োবিংশ ধাপ।

হেমের সংসার।

হেম মোহন পৃথক্ হওয়া অবধি তাহার সংসার কিরূপ চলিতেছিল সে সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই, এখন তাহার সংসারের বিষয় কিছু বলিব। হেমের সংসার এখন সুখের সংসার হইয়াছে। শ্যাম সমস্ত খরচ পত্রই দেয়, সর্ব্বদা হেমের বাড়ীতেই থাকে। স্বর্ণময়ীও সংসারের অনেক সাহায্য করে। কিশোরী "ল" পাশ দিয়া একজন বিখ্যাত উকীল হইয়াছে। তাহার পশারও বিলক্ষণ হইয়াছে। ললিত আজিও স্কুলে পড়িতেছে। শ্যাম পঞ্চাশ টাকা বেতনে গবর্ণমেণ্ট আফিসে হেমের একটী চাকুরী করিয়া দিয়াছে। এখন তাহারা আর সে বাগান-বাড়ীতে নাই। শ্যাম তাহাদের জন্য নিকটেই একটী দিব্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে সেইখানেই হেমেরা সুখে সচ্ছন্দে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহার সংসারে এ পর্য্যন্ত কখন কোন অমঙ্গল ঘটে নাই। পাষণ্ড কাকা কখন তাহাদিগকে মনেও করিতেন না। কিন্তু ইহারা কাকার প্রত্যেক বিপদে উঠিয়া পড়িয়া প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া খাটিয়াছে, মনে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই। এখন হেমের পরিবারের মধ্যে হেম, কিশোরী, ললিত, তাহাদের মা, হেমের স্ত্রী কিশোরীর স্ত্রী, তাহাদের খুড়িমা, স্বর্ণময়ী আর হেমের "কুমারী" নাম্নী দুই বৎসরের এক কন্যা। ললিত আজিও

অবিবাহিত। ফলতঃ হেমের এখন সোণার সংসার হই-য়াছে; এমন কি তাহারা মনে করিত যে বোধ হয় এরূপ সুখে সচ্ছন্দে তাহারা পূর্ব্বে কখন কাটাইতে পারে নাই।

হেম একদিন মনে মনে ভাবিল, "কাকা তুমিই এ জগতে ধন্য। তুমি আমাদিগকে ভিন্ন করিয়া দিয়াছ বটে কিন্তু তাহাতে আমরা তোমার উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট নই কারণ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তুমি আমাদিগকে ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলে বলিয়াই ত আমরা এত সুখী হইয়াছি নতুবা আমরা এরূপ সুখের মুখ দেখিতাম কোথা হইতে? অতএব কাকা তুমি আমাদের ভিন্ন করিয়া দিয়া আমাদের একপ্রকার উপকারই করিয়াছ বলিতে হইবে। না করিবেই বা কেন? তুমি কাকা, আমরা তোমার সহোদর ভাইএর সন্তান, তুমি আমাদের উপকারের চেষ্টা করিবে না ত এ জগতে আর কে করিবে? আমাদের আর কে আছে? তুমি আমাদের পৃথক করিয়া না দিলে ত আর সাধু, উন্নত-মনা, পরোপকারী, অকপট-বন্ধু শ্যাম আমার প্রতি এত দয়া করিত না। তাই বলিতেছিলাম কাকা তুমি আমাদের কষ্ট দিবে বলিয়া আমাদিগকে ভিন্ন করিয়া দিয়াছ কিন্তু আমরা তাহাতে কিছুই কষ্ট পাই নাই। সেই জন্যই বলিতেছি যে তুমি আমাদের প্রকারান্তরে উপকার করিবে বলিয়াই এই সদুপায় স্থির করিয়াছিলে।"

হেম এই প্রকার ভাবিতেছে এমন সময় একজন আসিয়া বাহিরে ডাকিল "হেম বাবু বাড়ী আছেন?" হেমের দেউড়াতে একজন দ্বারবান্ থাকিত সে গিয়া হেমকে

ডাকিয়া দিল। হেম বাহিরে আসিয়া দেখিল রজনী বাবু আসিয়াছেন। হেমের ছোট খুড়ী বা আমাদের ছোট বউ-এর বড় ভ্রাতার নাম রজনী নাথ মুখোপাধ্যায়। বাড়ী হুগলীর নিকট সুগন্ধা নামক গ্রামে।

হেম বলিল "কি রজনী বাবু যে, আসুন আসুন! তারপর বাড়ীর সব ভাল ত? আপনি এখানে চিনিয়া আসিলেন কিরূপে? আপনি কি শুনিয়াছিলেন যে কাকা আমাদিগকে ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন?"

রজনী বাবু বলিলেন "আমরা সমস্তই শুনিয়াছি। তোমার ছোট কাকার মৃত্যু, তোমার পিতার মৃত্যু সমুদায়ই আদ্যোপান্ত আমরা শুনিয়াছি। সেই জন্যই বরাবর এই খানেই আসিয়াছি। বাড়ীর আর আর সকলেই একপ্রকার ভাল আছে তবে মাতা ঠাকুরাণীর বড় ব্যায়রাম সেই জন্য হেমাঙ্গিনীকে লইতে আসিয়াছি। ছোট বউএর সংসারে পরিবারের মধ্যে এক ভ্রাতা ও তাহার মাতা ও ভ্রাতার স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি। এই কথা শুনিয়া সে দিন রজনী বাবুকে থাকিবার জন্য হেম অনেক জেদ করিতে লাগিল, কিন্তু মাতার পীড়া বলিয়া রজনী বাবু থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। বেলা দুইটার সময় ছোট বউ তাহার ভাইএর সহিত বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ ধাপ।

পরামর্শ—কেতকিনীর পত্র।

মুখুয্যে বাড়ীর ডাকাতিতে জগদম্বার পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইলে পর কিছু দিন নিশ্চিন্তভাবে কাটিল। জনার্দ্দন কৃষ্ণলালের বাড়ীতে থাকে আর মাঝে মাঝে ডাকাতি করিতে বাহির হয়। কৃষ্ণলাল যে দিন কলিকাতায় কেতকিনীর শ্বশুর বাটী গিয়া প্রথম শুনিয়াছিলেন যে জনার্দ্দন ডাকাতদের দলের সর্দ্দার হইয়াছে; আমরা বলিয়া আসিয়াছি সেই দিন কৃষ্ণলাল মনে মনে একটী নূতন পাপের আশ্রয় দিয়াছিলেন। কৃষ্ণলালের সেই পাপ যে কি পাঠক মহাশয় এইবার তাহা জানিতে পারিবেন।

জগদম্বা মরিবার পূর্ব্বে একদিন কৃষ্ণলালের মনে যে অসৎ উপদেশ দিয়া গিয়াছিল, কৃষ্ণলাল সেই অসৎ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভাইপোদের কিসে অনিষ্ট করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভাইপোদের প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছেন, অনেক প্রকারে তাহাদের জ্বালাতন করিয়াছেন সে সমুদায় বিস্তারিত বলিতে গেলে পুস্তকের আকার বৃহৎ হইবে ভয়ে বলিতে সাহস করিলাম না, কেবল প্রধান দুই একটীর বিষয় পাঠক মহাশয়কে বলিব।

কৃষ্ণলাল পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন যে পৃথক্ হওয়া অবধি তাঁহার ভাইপোরা অত্যন্ত সুখে আছে। তাহাদের বন্ধু শ্যাম তাহাদের দিব্য বাড়ী করিয়া দিয়াছে, সেই

তাহাদের সমস্ত খরচ পত্র দেয়। এই কথা শুনিয়া অবধি কৃষ্ণলালের হিংস্রক মন তাহাদের সেই সুখ-তপনকে চির-মেঘাচ্ছন্ন করিতে দিবারাত্রি চেষ্টা পাইতে লাগিল। কৃষ্ণলালের আহার নিদ্রা সমুদায় বন্ধ হইল কেবল কিসে ভাইপোদের অনিষ্ট করিতে পারিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া অবশেষে তাহাদের বাড়ী ডাকাতি করিবার জন্য জনার্দ্দনকে পাঠাইবেন ইহাই উপযুক্ত উপায় বলিয়া স্থির করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন বটে কিন্তু জনার্দ্দনকে কোন দিনই সুবিধা মত পান না বলিয়া ক্রমশঃই শুভকার্য্যের বিলম্ব পড়িয়া যাইতে লাগিল।

এক দিবস প্রাতঃকালে কৃষ্ণলাল জনার্দ্দনকে সম্মুখে পাইয়া কেহ কোথাও নাই দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "জনার্দ্দন, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে যদি পারিস্ তবে আমার বিশেষ উপকার করিস্। আমি জন্মের মত তোর কেনা হয়ে থাক্‌বো। কেমন পার্‌বি ত?"

জনার্দ্দন তাড়াতাড়ি বলিল "পার্‌বো বৈকি মশায়, তুমি হুকুম দিয়ে দেখ না। তারপর পারি কি না পারি দেখ্‌বে। কি কাজ তাই আগে বলুন শুনি।"

কৃষ্ণলাল চুপি চুপি বলিলেন "হেমের বাড়ী ডাকাতি ক'ত্তে হবে, তার বেশ বাড়ী ঘর হয়েছে। কেমন পার্‌বি ত? পারিস তো তোকে একশত টাকা পুরস্কার দেব।"

কৃষ্ণলালের মুখে এমন নিদারুণ কথা শুনিয়া জনার্দ্দনের দস্যু হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠিল, তাহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত

হইল। ভাবিল যে কি আশ্চর্য্য কাকা হইয়া ভাইপোদের উপর অত্যাচার! একি মানুষে পারে? যাহাহউক জনার্দ্দন তথাপি টাকার লোভ ছাড়িতে না পারিয়া বলিল "এ একটা কি কাজের মধ্যে কাজ? কত শতো খুন করে পাচার ক'রে দিলাম তার আর আপনি ডাকাতির কথা কি বল্‌ছো? কিন্তু এক শত টাকায় আমি যেন স্বীকার হলাম, আমার দলের কেউ ত তাতে স্বীকার হবে না। আমি যেন আপনার খেয়ে মানুষ, আমায় আপনি যা দেও তাই আমার অনেক কিন্তু আমি এ কাজ ত আর একলা' পার্‌বো না সুতরাং আমার লোকদের কি দিব? তাদের নিদেন পক্ষে আর এক শত টাকা না দিলে ত হবে না? কিন্তু আমাকে এক শত টাকা নগদ দিতে হবে কারণ তাদের মদ টদ খাওয়াতে হবে, ডাকাতির জন্য যে যে জিনিস দরকার তাও সংগ্রহ ক'ত্তে হবে, সে সবও ত চাই। পরে কাজ হাঁসিল হলে বাকী একশত টাকা দিলেও চল্‌বে।" কৃষ্ণলাল তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

জনার্দ্দনের হাতে নগদ একশত টাকা দিয়া বলিলেন "দেখিস্ যেন শীঘ্র শীঘ্রই কাজ হাঁসিল হয়।"

জনার্দ্দন বলিল "তা আর আপনাকে বল্‌তে হবে না। কালই শুন্‌তে পাবেন যে কাজ ক'ত্তে হয়ে গেছে।"

যেখানে কৃষ্ণলালের সহিত জনার্দ্দনের এই সকল কথা হইতেছিল তাহারই পাশের ঘরে কেতকিনী বসিয়াছিল তাহা কৃষ্ণলাল জানিতেন না সুতরাং কেতকিনী আগাগোড়া সমুদায় কথাই শুনিতে পাইল। কেতকিনী শুনিয়া শিহরিয়া

উঠিল, তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। মনে ভাবিল যে অপর এক জনের প্রতিও লোকে এমন পাষণ্ডের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে না, করিতে সাহসও করে না, আর তুমি কাকা হয়ে কি ব'লে কোন প্রাণে আপন ভাইপোদের উপর এরূপ সর্ব্বনেশে পাশব প্রবৃত্তির পরিচালনার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ? দাদা! তোমায় কি বল্‌বো, তারা না তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তান, তুমি না তাদের আপনার কাকা, তুমি না তাদের অভিভাবক? ছি, ছি, ছি তাহাদের প্রতি তোমার এইরূপ ব্যবহার? তুমি ত তাঁদের কৃতান্ত নও তবে কেন তাহাদের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? মেজবউ কি তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি একেবারেই হরণ করিয়াছে? তুমি কি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া একেবারেই অধঃপাতে গিয়াছ? তুমি মানুষ হইয়া যে পশুর ন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার কি চৈতন্য হইবে না?

এই সকল ভাবিয়া কেতকিনী অনেকক্ষণ নীরবে রহিল। অনেকক্ষণ পরে আবার মনে মনে ভাবিল যে কাল ত জনার্দ্দন ডাকাতি করিতে যাইবে। এ বিষয়ে যেরূপেই হউক, তাহাদের সংবাদটা আমায় দিতেই হবে, আজকার মধ্যেই দিতে হবে, তাহ'লেই তারা সাবধান হবে। এই মনে ভাবিতে ভাবিতে মুখুয্যে বাড়ীর ডাকাতি এবং জগদম্বার শাস্তি কেতকিনীর যুগপৎ মনে পড়িতে লাগিল। তাহার পবিত্র হৃদয় চমকিয়া উঠিল। কেতকিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। কাহার দ্বারা কিরূপে তাহাদের যে

সংবাদ দিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে স্থির করিল যে একখানি পত্র লিখি। পত্র লেখা হইল।

পত্র এইরূপ লেখা হইল ;—

হেম ;—

যাহা শুনিলাম তাহা অশ্রাব্য, অতি ভয়ানক লিখিতে আমার হাত কাঁপিতেছে। সে কথা মনে করিলে আমার শরীর শিহরিয়া উঠে। আমায় শত বৃশ্চিক দংশন করিলেও আমার এত যন্ত্রণা হয় না। যাহা শুনিলাম সেরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য এ জগতে মনুষ্যে পারে কিনা সে বিষয় আমার অনুভবেই আইসে না। হৃদয় পাষাণময় তাই সেই নিদারুণ হৃদয়-বিদারক পরামর্শ শুনিয়াও আমার দেহে এখনও প্রাণ আছে এখনও আমি কথা কহিতে পারিতেছি। শুনিবামাত্র সেই দণ্ডে যদি আমার মস্তকে বজ্রপাত হইত তবে আমি কথঞ্চিৎ সুখ বোধ করিতে পারিতাম। ঈশ্বর কেন যে আমায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য এখনও জীবিতা রাখিয়াছেন তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার হৃদয় এখনও বিদীর্ণ হইল না কেন? সে শোচনীয় কথা লেখনীতে লিখিলে সরস্বতীর অপমান করা হয়। লেখনী সেরূপ অসম্ভব বাক্য লিখিতে পারে না, মন তাহা ভাবিতে পারে না, মুখ তাহা উচ্চারণ করিতে পারে না। জানি না কোন্ প্রাণে কাকা হ'য়ে সেরূপ পাপ প্রবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিয়াছেন। আমার না লিখিলে নয় সেই জন্য সেই জঘন্য পরামর্শ যাহা শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয় সেই হৃদয়-বিদারক কথা আজি লেখনীতে লিখিতে বাধ্য হইলাম।

তোমার গুণের কাকা, প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও যাহার উপকার করিতে তুমি কদাচ কাতর হও না সেই অকৃতজ্ঞ কাকা কাল তোমার বাড়ী ডাকাতি করিবার জন্য জনার্দ্দনকে একশত টাকা দিয়াছেন !!! জনার্দ্দন কাল তোমার বাড়ীতে ডাকাতি করিতে যাইবে। সাবধান, খুব সাবধান। আর কি লিখিব। দেখো আমি তোমাদের সংবাদ দিলাম এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। বিষয়াকে কোন কথা বলিও না। ইতি

তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষিনী
শ্রীমতি কেতকিনী।

পত্র খানি লেখা হইলে বিষয়াকে দিয়া তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পত্র লইয়া বিষয়া হেমের হস্তেই পত্র খানি দিয়া চলিয়া আসিল। হেমও বিষয়াকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, জিজ্ঞাসা করিতে সময়ও পাইল না। পত্র পড়িয়া হেম অবাক্! কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কি করিবে আপাততঃ কিছুই বুঝিতে পারিল না। অনেক ক্ষণ এক স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

হেম ভাবিল যে আমরা ত আমাদের জ্ঞানে কখন কাকার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, আমরা ত তাঁহার হৃদয়ে কোন রূপেই ব্যথা দিই নাই, আমরা ত আমাদের জ্ঞাতসারে তাঁহার কখন কোন অপকারই করি নাই, তবে আমরা তাঁহার সুখের পথের কন্টক হইলাম কেন? কেন তাঁহার অসন্তোষ-ভাজন হইলাম? কেন তাঁহার দুই চক্ষের বিষ হইলাম? তাঁহার কিসে ভাল হয় তাহাই ত আমরা

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, তিনি কিসে সুখে থাকেন তাহাই ত আমরা ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা আন্তরিক প্রার্থনা করিয়া থাকি, তবে কাকা আমাদের বিরুদ্ধে এমন যৎকুৎসিৎ জন-সমাজে ঘৃণিত পাশব প্রবৃত্তি মনে মনে কেন উত্তেজিত করিলেন? তিনি আমাদের কাকা কি তিনি আমাদের কৃতান্ত তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। এখনও বিশ্বাস হয় না যে তিনি আমাদের এমন বিপদে ফেলবার চেষ্টা পাই-বেন। কিন্তু কেতকিনী সরলা, সে ধর্ম্ম-ভীরু প্রিয়ংবদা, সে কখনই মিথ্যা কথা বলিবার লোক নয়। তাহার হৃদয় পবিত্র, তাহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক সে ধর্ম্মের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। তাহার কথা অবিশ্বাস করা নিতান্তই অসম্ভব। যদি সূর্য্যের পশ্চিম দিকে উদয় হওয়া কখন সম্ভব হয়, যদি সাগর শুষ্ক হওয়াও সম্ভব হয় তথাপি কেতকিনীর মিথ্যা কথা কওয়া কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সে মিথ্যা কহিয়াছে এ কথা মনে করিলেও পাপ। বাস্তবিক তাহার অচিন্তনীয় হৃদয় মনস্তাপে তুষানলের ন্যায় অল্পে অল্পে দগ্ধ হইয়াছে, বাস্তবিক সে আমাদের বিপদে চক্ষের জল ফেলিয়াছে, বাস্তবিকই সে কাকার, পাষণ্ড কাকার পাশব পরামর্শের বিষয় শুনি-য়াছে। কেতকিনী মিথ্যাবাদিনী নয়। কাকা! নিশ্চয়ই তুমি আমাদের প্রতি তোমার ঘৃণিত, জঘন্য প্রবৃত্তির পরি-চালনার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে পিতৃব্যানুরাগী হেমের চক্ষের জলে হৃদয় ভাসিয়া গেল। অবশেষে শ্যামের নিকট গিয়া হৃদয়ের দুঃখ প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের শান্তি লাভ করিল। সহৃদয় শ্যামের অন্তর

বন্ধুর বিপদে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইল। উভয়ে একত্রে মাতার নিকট আসিয়া মাতাকে ও সংসারের অন্য অন্য সকলকেই সমদুঃখভাগী করিল। সকলেই চিন্তিত কি করিলে ভাল হয়। অবশেষে সুচতুর শ্যাম বলিল :—

"ভাই হেম, টাকায় সকলই হইতে পারে। টাকায় না হয় এমন কার্য্য এ জগতে নাই, মনে করিলে টাকা খরচ করিয়া এক রাত্রির মধ্যে এই বাড়ীকে অন্য স্থানে লইয়া স্থাপন করা যায়। অতএব তাহার জন্য এত ভাবিবার কোন কারণ ত আমি দেখিতে পাইতেছি না।" এই কথা বলিয়া শ্যাম বন্ধুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নিজে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া সমস্ত রাত্রি হেমের সংসারকে ডাকাতের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত পুলিসকে মোতায়েম রাখিল। শ্যাম নিজে সে রাত্রি হেমের নিকট থাকিয়া তাহার সহিত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা দ্বারা সতর্ক থাকিল। পুলিসও টাকা খাইয়া সে রাত্রি অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া গুপ্তভাবে রক্ষক হইয়া হেমের উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিল।

পঞ্চবিংশ প্রাপ।

অসাধারণ সতর্কতা।

জনার্দ্দন তাহার মনিবের সহিত পরামর্শ করিয়া আড্ডায় আসিয়া সকলের সহিত পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। এবার জনার্দ্দনের দলে ডাকাতের সংখ্যা ১০।১২ জন মাত্র ছিল।

মুখুয্যে বাড়ীর ডাকাতির সময় জনার্দ্দন যাহাদের সাহায্য লইয়াছিল তাহাদের সহিত জনার্দ্দনের দলের বাকী লোক অন্য স্থানে ডাকাতি করিতে গিয়াছিল তাহারা আজিও ফিরিয়া আইসে নাই, কবে আসিবে তাহারও কিছু ঠিক ছিল না, অথচ কালই কৃষ্ণলালের কাজ করিতে হইবে স্বীকার করিয়াছে সুতরাং সেই ১০।১২ জন লোক লইয়াই কাজ সমাধা করিবে স্থির করিল।

জনার্দ্দন জানিল না যে, হেম সকলই জানিতে পারিয়াছে। সে ভাবিল না যে পাপ কার্য্য কখন অপ্রকাশ থাকে না, সে বুঝিল না যে দৈব তাহাদের অনুকূল। সময় ক্রমেই কাটিতে লাগিল। সময় কাহারও হাতধরা নয়, সুখ ও দুঃখকে অতিক্রম করিয়া সময় দ্রুত পাদবিক্ষেপে চলিয়া যাইবেই কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। ক্রমে জনার্দ্দনের সময় আসিল সুখের কিন্তু অন্য দিকে হেমের সময় আসিল দুঃখের। আজি রাত্রিতে হেমের বাড়ীতে জনার্দ্দনের ডাকাতি করিবার দিন।

রাত্রি ক্রমে দুই প্রহর হইল। রজনী যৌবনভরা, গম্ভীরা। প্রকৃতি নিরবচ্ছিন্ন ঘোর কৃষ্ণাম্বরা। জগৎ সুষুপ্ত ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। দিবসের পরিশ্রমে অবসন্ন নিঃসহ মনুষ্য, পশু, পক্ষিগণ আর জাগরিত নাই। এখন নিদ্রার রাজত্ব। নিদ্রার সমস্ত জগৎ ঘেরিয়াছে। মায়াবিনী নিদ্রার সুকোমল কোলে কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্ধন, কি দাতা, কি দরিদ্র, কি অন্নান্ন-লালায়িত সকলেই সংজ্ঞাশূন্য। তাই বলি নিদ্রে! প্রাণী জীবনে তোমার তুল্য হিত-

কারিণী আর কেহই নাই। তুমি দীন হীনের শোক দুঃখ নিবারক, পাপীর তাপহর। রোগীর শান্তি, কারাবাসীর নিষ্কৃতি, নিরাশার আশা ভরসা, চিন্তার চরম দশা, বিরহীর আসঙ্গ স্বপন, বিরহিনীর অপূর্ব্ব মিলন, অলসের আরাম, শ্রমীর বিরাম।

এ ঘোর নিশীথে নানা গন্ধে আমোদিত মুক্তা-প্রবাল রচিত, হীরক-খচিত, কিঙ্খাপ মণ্ডিত দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় বিলাসী সম্রাট শয়ন করিয়া তোমার অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। জয়ী বীর পুরুষ তোমার স্নিগ্ধ করস্পর্শে রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। হে স্বভাব সুন্দরি! সংসারত্যাগী যোগী পুরুষেও তোমার আক্রমণে পরমাত্ম-চিন্তা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। ব্যজন-দোলিত, বিচিত্র শোভিত, প্রকোষ্ঠস্থিত নক্সাকার কোচে বসিয়া তোমার গয়ঙ্গচ্ছ ভাব দেখিয়া অবনীর ক্রোড়পতিও সকাতরে তোমার উপাসনা করিতেছে তুমি ফিরিয়াও দেখিতেছ না। আবার দিবসের পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্তদেহ, তৃণ গুচ্ছোপরি শয়ান দরিদ্র হলজীবির শয্যাতলে বিনা আয়াসেই তুমি গিয়া গৃহিনীর মত তাহার পদসেবা করিতেছ। কত প্রেমের পুত্তলি নবনীত-কলেবরা সুকুমারী বিধবা বালা স্বামীশোক চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া সমস্ত দিবস চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে তোমার সুকোমল অঙ্কে ১০।১২ ঘন্টার জন্য শান্তি লাভ করিতেছে। কত শোকো-ন্মাদিনী জননী প্রাণাধিক্ হৃদয়-সর্ব্বস্ব পুত্র-রত্নকে হারাইয়া আকাশ পাতাল মৃত্যু ভাবিতে ভাবিতে তোমায় পাইয়া নিশ্চিন্তা হইয়াছে।

স্ত্রী পুত্র পরিত্যক্তা আজীবন লৌহ-নিগড়-নিবদ্ধ হৃতসর্ব্বস্ব হতভাগ্য বন্দী এ ঘোর নিশীথে সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গিয়া সুখ ভোগ করিতেছে। এ ঘোর কালরূপিনী নিশীথে জাগ্রত কে আছে? কেহই নাই। দেবি! এ নিশীথে কাহার নয়ন তোমার মোহিনী দৃষ্টির অন্তরালে আছে? কাহারো নাই। হে মনোমোহিনি! তোমার মায়ায় আকৃষ্ট না হইয়া কে তোমার নিস্তব্ধতা বাধা দিতেছে? এক মাত্র তনয়ের মৃত্যুজনিত নবশোকে অভিভূতা হইয়া কোন জননী কি জাগিয়া আছে? না। কাতর-ব্যথিত-হৃদয় কতক্ষণ জাগিবে? তবে কি কোন পতিসোহাগী পতি বিরহে জাগিয়া আছে? না সেও নয়। তাহারও হৃদয় ব্যথিত সে কতক্ষণ জাগিবে? তবে এ নিশীথে যদি কেহ জাগিয়া থাকে তবে কৃপণ ধনচিন্তায় জাগিতেছে, প্রহরী শান্তিরক্ষার জন্য জাগিতেছে, অভিসারিণী প্রাণবল্লভের জন্য জাগিতেছে, তস্কর নিজ দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য জাগিতেছে আর জনার্দ্দন. কৃষ্ণলালের নিকট টাকা খাইয়া হেমের বাড়ী ডাকাতি করিয়া তাহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য জাগিতেছে।

জনার্দ্দন সকলকে একত্র করিয়া প্রত্যেকের হস্তে এক একটী মশাল দিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে হেমের বাটীর দরজায় উপস্থিত হইল। তাহাদের চীৎকারে হেমের বাটীর সকলেই জাগিয়া উঠিল। দস্যুরা যেমন বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবে পুলিস অমনি আসিয়া তাহাদিগকে হঠাৎ চারিদিকে ঘেরিয়া ফেলিল। দস্যুরাও প্রাণ রক্ষার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইল। হেমের বাটীর হিন্দুস্থানী দ্বারবান্

দোবে, চৌবে প্রভৃতি কেহ অস্ত্র, কেহ লাঠি লইয়া দস্যুদিগকে বাধা দিতে লাগিল। হেম ও শ্যাম অনবরত বন্দুকের আওয়াজ করিতে লাগিল। দুই প্রহর রাত্রির সময় হেমের বাড়ী প্রকাণ্ড একটী সংগ্রাম বাধিয়া গেল। এইরূপ কিছুক্ষণ সংগ্রামের পর দস্যুগণ নিরস্ত্র হইয়া পড়িল, কে কোথা পলাইল তাহার কিছুই ঠিক্ করা গেল না। কেবল দেখা গেল যে ৪ জন ডাকাত কাটা পড়িয়াছে, দুই জন পুলিস কনষ্টেবল আহত হইয়াছে ও জনার্দ্দন ধরা পড়িয়াছে।

জনার্দ্দন পুলিসকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সে রাত্রি হাজতেই থাকিল। কৃষ্ণলাল ইহার কিছুই জানিলেন না। তবে কি তিনি দস্যুদিগের চীৎকার শুনিতে পান নাই? তিনিই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি শুনিবেন না ত আর কে শুনিবে? তিনি শুনিয়াও সে স্থানে সে রাত্রি যান নাই। জনার্দ্দন পুলিসকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হাজতে প্রেরিত হইল, কিন্তু দয়ার্দ্রহৃদয় হেমের হৃদয় তাহার দুঃখে বড়ই কাতর হইল। হেম মনে করিল "আহা তাহার ত কোন দোষ নাই। তাহার ব্যবসা তাহার জীবনোপায়ের জন্য সে এ কার্য্য করিয়াছে, সে টাকা খাইয়া নিমকহারামী করিবে কেন?" এই ভাবিয়া পরদিন প্রাতঃকালে হেম অনেক বলিয়া কহিয়া অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া জনার্দ্দনকে পুলিসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

জনার্দ্দন মুক্ত হইয়া বরাবর আড্ডায় গেল। সেখানে গিয়া দেখিল কেহই নাই। সেখান হইতে বরাবর কৃষ্ণলালের নিকট গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বলিল। কৃষ্ণলাল অনেক

দুঃখ করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা দিয়া তাহাকে বিদায় করি-লেন। জনার্দ্দন চলিয়া গেলে কৃষ্ণলাল ভাবিতে লাগিলেন যে তাইত এ গুপ্ত ঘটনা কিরূপে প্রকাশ হইল? কে গোয়েন্দা হইয়া আমার ভবিষ্যতের সুখের পথ বন্ধ করিল? যাহা হউক ভাইপোদের কোনরূপ প্রবঞ্চনা, অত্যাচার দ্বারা অনিষ্ট করিতে না পারিলে আমার ভাবী মঙ্গলের আশা নাই এই ভাবিয়া অন্যরূপ অনিষ্ট চিন্তাতেই কৃষ্ণলাল সময় কাটাইতে লাগিলেন।

ষড়বিংশ প্রাপ।

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

এ পৃথিবী জুয়াচুরির গৃহ। শঠতা, হিংসা, ছলনা. প্রবঞ্চনা এবং অত্যাচারের মন্দির, কপটতার আলয়। কেহ ভাবিবেন না যে গ্রন্থকর্ত্তা শুদ্ধ ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছেন। কি ইয়োরোপ, কি এশিয়া, কি আফ্রিকা, কি আমেরিকা, সকল স্থানেই এইরূপ। অসভ্য বন্যদিগের মধ্যেও প্রবঞ্চনা আছে। যাহারা পশুসদৃশ অপক্ক মাংস-ভোজী, যাহাদের গৃহ নাই, সমাজ নাই, শৃঙ্খলা নাই, উলঙ্গ-বেশে ব্যাঘ্র ভল্লুকগণের সহিত বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যেও অন্যের প্রতি অত্যাচার করিব, অন্যের প্রবঞ্চনা করিয়া সর্ব্বস্ব লইব এ চিন্তা প্রবল। অতি পবিত্র স্বর্গসদৃশ ৺ কাশীধামে গমন কর দেখিবে প্রবঞ্চনা আর অত্যাচার। সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধামসদৃশ দ্বারিকা পুরীতে গমন কর দেখিবে চারিদিকে প্রবঞ্চনা আর শঠতায় পূর্ণ।

কলিযুগের পূর্ণ ব্রহ্ম বিরাজিত পুরুষোত্তম যাত্রা কর দেখিবে কেবল ছলনা আর হিংসা আর কিছুই নাই। কালীঘাট যাইয়া দেখিবে সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী ভুবনেশ্বরীকে সম্মুখে রাখিয়া কত নর নারী কত ছলনা করিতেছে, কত লোকের প্রতি কত অত্যাচার করিতেছে, কত প্রকারে লোকের উপর হিংসা করিতেছে, অভ্যন্ত হৃদয়ে অণুমাত্রও ভয় হইতেছে না যে সাক্ষাৎ দেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া কি প্রকারে এতাদৃশ কুপ্রবৃত্তি সমুদায়কে প্রশ্রয় দি।

শুদ্ধ ভারতীয় তীর্থ স্থানে নহে, মক্কা'য় যাও, মেদিনায় যাও, রোমে যাও তথায়ও এইরূপই দেখিবে। মস্‌জিদে যাও, চর্চ্চে যাও চারিদিকেই এই প্রকার কু-প্রবৃত্তির ছড়াছড়ি। অর্থ লোভ, বিষয় লোভ এ মহাপাপের মূলীভূত কারণ। অর্জ্জিত অর্থে হৃদয়ের আশা না মিটিলেই ঐ সমুদায় নীচ প্রবৃত্তির সাহায্য লইতে হয়। অধর্ম্ম ও প্রবঞ্চনার সাহায্য ভিন্ন লোক ধনী হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারেন যে ব্যবসা বাণিজ্যেও ত ধনী হয়, কিন্তু তাহাতেও প্রবঞ্চনার সাহায্য আবশ্যক। লণ্ডন, পারিস, রোম, কলিকাতা প্রভৃতি মহানগরী গুলিই প্রবঞ্চনা ও হিংসার গৃহস্বরূপ। কত যে প্রবঞ্চনা এই মহানগরীর প্রতি গলিতে গলিতে, বাজারে বাজারে হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে? আজ অমুক ব্যাঙ্কে বাতি জ্বালিল, কাল অমুক ব্যাঙ্ক 'ফেল' হইল, পরশ্ব অমুক লোক লক্ষ টাকার নোট জাল করিল। পল্লিগ্রামেও আজ ধনাঢ্য কুণ্ডুদের নিকট মিত্রজা মহাশয় ফাঁকি ডিক্রী বিক্রয় ক'রে গেছেন, কাল মোড়লদের বাড়ী থেকে নাবা-

লকের সই দিয়ে মজুমদার মহাশয় ১০০৲ টাকা অমুক বাবুর বৈটকখানা তৈয়ারি করবার জন্য নিয়ে এসেছেন, পরশ্ব বাবুদের কারপরদাজ একটা বিষয় চারি জায়গায় বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়ে এসেছেন অথচ মহাজনেরা কেহই তাহা অবগত নহেন। ওখানে বাবুর বাড়ীর আমলারা অমুক অনাথার ১২ বিঘা ভাল জমি বেদখল করিতে হইবে তাহারই পরামর্শ আঁটিতেছেন, এদিকে কৈবর্ত্তদের মাছ লুট করিতে হইবে পরামর্শ হইতেছে, তাই বলিতেছি যে দিকে যাও সেই দিকেই প্রবঞ্চনা, সেই দিকেই ছলনা, সেই দিকেই হিংসা আর সেই দিকেই অত্যাচার।

আমাদের কৃষ্ণলালও আজ এই সমুদায় নীচ কুপ্রবৃত্তির নায়ক। তাঁহার এ অত্যাচার কি প্রবঞ্চনা বিষয় লোভের জন্য নহে, ভাইপোদিগকে কোন রূপে বিপদে ফেলিয়া নিজে ভবিষ্যতে সুখী হইবেন এই চেষ্টা। অত্যাচারের উপর অত্যাচার, প্রবঞ্চনার উপর প্রবঞ্চনা, হিংসার উপর হিংসা করিয়া ভাইপোদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দিয়া নিজে সুখী হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

কৃষ্ণলাল একদিন প্রাতঃকালে জনার্দ্দনকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। জনার্দ্দন আসিলে তিনি তাহাকে নম্রভাবে বলিলেন "জনার্দ্দন! টাকাও খরচ কল্লুম, চেষ্টা ক'ত্তেও ত কসুর কল্লুম না কিন্তু কাজ ত কিছুই হ'লো না। এখন আর কি করা যায় বল্ দেখি? ভাইপোরা ত আমার ভবিষ্যতে সুখের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে রয়েছে, তাদের সুখের পথ ঘোচাতে না পাল্লে ত আর আমার অদৃষ্টে ভবিষ্যতে সুখের

আশা কোন মতেই নাই। শ্যাম ব'লে তার একটা বন্ধু আছে, সেটা যত নষ্টের গোড়া। শ্যামটাকে জব্দ ক'ত্তে পাল্লেই তারা নিশ্চয়ই জব্দ হবে। শ্যামের দৌলতেই তাদের এত সুখ, নইলে তারা কখনই এত বড়মানুষি চালে চল্‌তে পাত্তো না। আমার ভাইপো হ'য়ে তারা আমার উপর প্রভুত্ব কর্‌বে, আমার চেয়ে বড় মানুষি ফলাবে আমি বেঁচে থেকে তা কখনই সহ্য ক'ত্তে পার্‌বো না। আমি সুখে সচ্ছন্দে থেকে নিরাপদে সংসার চালিয়ে কিছু টকা জমাতে পার্‌বো বলে তাদের ভিন্ন ক'রে দিলাম, তা না হ'য়ে তারা গিয়ে অবধি আমার যত বিপদ, যত অমঙ্গল। এক দিনের তরেও সুখ কাকে বলে তা আমি জান্‌তে পাল্লুম না। কিন্তু তারা এখন এত বড়মানুষ হয়েছে, এত সুখী হয়েছে যে তারা আমার মত এমন দশটা সংসার অনায়াসে প্রতিপালন ক'ত্তে পারে। তাদের কাছে আমায় নীচু হয়ে চল্‌তে হয়। আমার চেয়ে যারা বয়সে ছোট তাদের কাছে এরূপ নীচু হয়ে চলা বড়ই অপমানের বিষয়। এত অপমান আর কতদিন সহ্য ক'রে থাক্‌বো বল্ দেখি? আচ্ছা জনার্দ্দন, তুই সেই শ্যামটাকে চিনিস্? সে কোথায় শুয়ে থাকে কিম্বা আর কেউ তার কাছে থাকে কি না সে সব তুই জানিস্?"

কৃষ্ণলালের এই কথা শুনিয়া জনার্দ্দন বলিল "আমি তার আগাগোড়া সবই জানি, আমার কাছে অজানা কি কিছু আছে? আমি সকলের নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত জানি। কেন বলুন দেখি?"

কৃষ্ণলাল তখন বলিলেন "তাকে কোন প্রকারে গিয়ে খুন ক'রে আস্‌তে পারিস্ যদি তবেই আমি নিষ্কণ্টক হ'তে

পারি। তাকে কোন রকমে নিকেষ ক'ত্তে পাল্লে হেমারা ও খুব জব্দ হবে, তাহ'লে তাদের আর এত জাঁক জমক থাক্‌বে না আর আমারও তাহ'লে আর এত নীচু হ'য়ে চল্‌তে হবে না। তা যদি পারিস্‌ তবে আমি পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি?"

জনার্দ্দন কৃষ্ণলালের কথাগুলি শুনিয়া চমৎকৃত হইল। সে মনে মনে অনেকক্ষণ কথাগুলি তোলাপাড়া করিতে লাগিল। প্রথমতঃ জনার্দ্দন স্বীকার হইল না কিন্তু টাকার লোভ পরিত্যাগ করা এ সংসারে বড়ই দুরূহ ব্যাপার। টাকার লোভ দেখাইলে লোক না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। এক পয়সার লোভে পড়িয়া এ জগতে লোক কত পাপ করিতেছে আর জনার্দ্দন পাচ শত টাকার লোভে পড়িয়া আজ একটা নরহত্যার পাপে লিপ্ত হইবে ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আর জনার্দ্দন এতাবৎকাল তাহাই করিয়া আসিয়াছে সুতরাং ইহাকে সে পাপ কার্য্য বলিয়াই বা মনে করিবে কেন? যাহাহউক জনার্দ্দন পাঁচ শত টাকার লোভ ছাড়িতে না পারিয়া অনেকক্ষণ পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্বীকার হইল। সেই দিন রাত্রিতেই কার্য্য শেষ হইলে টাকা লইবে জনার্দ্দন এই চুক্তি করিয়া চলিয়া গেল।

যখন জনার্দ্দনকে ডাকিয়া আনা হয় তখন কেতকিনী তাহা দেখিয়াছিল; দেখিয়া সকলই বুঝিতে পারিল। অন্তরাল হইতে সমুদায় পরামর্শ শুনিল। কেতকিনীর প্রাণ আইঢাই করিতে লাগিল। পূর্ব্বের ন্যায় পত্র লিখিয়া তাহাদের সংবাদ

দিল। তাহারাও সে রাত্রি সাবধান হইয়া রহিল। হেম সে রাত্রি শ্যামের নিকটেই থাকিল।

রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন জনার্দ্দন একখানি শাণিত ভুজালি লইয়া বাহির হইল। অন্ধকার রাত্রি, কোলের মানুষ পর্য্যন্তও দেখা যায় না। জনার্দ্দন গেট্ পার হইয়া শ্যামের বাটীর প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। রাত্রিকালে গেটে কেহই থাকিত না সুতরাং জনার্দ্দনের গেট্ পার হইয়া প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতে কোন প্রতিবন্ধক হইল না। প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া জনার্দ্দন আর অগ্রসর হইতে পারিল না। আজ জনার্দ্দনের "খুন" এই কথা মনে করিয়া ভাবান্তর উপস্থিত হইল। "নরহত্যা।" এই কথা ভাবিয়া জনার্দ্দনের দস্যুহৃদয়ও আজ কাঁপিয়া উঠিল। যে জনার্দ্দন দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শত শত নরহত্যা করিতে কদাচ বিমুখ হয় নাই, কদাচ তাহার কঠিন হৃদয়ে কোন বৈষম্য উপস্থিত হয় নাই, কদাচ তাহার অটল দেহ কোন দিকে টলে নাই সেই জনার্দ্দন আজ "খুন" এই কথা মনে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। তাহার বোধ হইল যেন তাহার সম্মুখে একটী জ্যোতিঃবিশিষ্ট দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ শূলহস্তে তাহাকে বধ করিতে আসিতেছে। তাহার অত্যন্ত ভয় হইল। অন্ধকারে একাকী স্তম্ভিত হইয়া সে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল, আর কিছুই দেখিতে পাইল না। "খুন" "নরহত্যা," "দস্যু-বৃত্তি" এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে জনার্দ্দন সম্পূর্ণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না।

ভুজালি খানি হস্তে করিয়া চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। জনার্দ্দনের অবস্থা অতি শোচনীয় হইল। জনার্দ্দন প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। আবার সেইরূপ আলোকময় প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত ভাবিয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিল :—

"খুন, অ্যাঁ, না, আমা হতে হবে না। সাক্ষাৎ ধর্ম্মের গাত্রে অস্ত্রাঘাত! একি! একি! অগ্নি! অগ্নি! না আমায় মেরো না, আমি খুন ক'ত্তে আসিনি। আবার একি! নরক! নরক! আমাকে নরকে ফেলে দেবে? হাঃ! হাঃ! হাঃ! তোমার কর্ম্ম নয়। আমি পাগল, দেও, দেও আমাকে নরকে ফেলে দাও। দস্যু আমি, অনেক খুন করিছি, অনেক পাপ করিছি ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা, পাঁচ শত টাকার লোভ, দেবে, দেবে পাঁচশ টাকা তুমি দেবে, না, না, না, মেরো না, লোভ মহাপাপ জানি, জানি জানি, আমি সব জানি। আবার তুমি কে? আমার যম? আমায় নিতে এসেছ? এসো, এসো।" এইরূপ ছড়িভঙ্গ কথা বলিতে বলিতে জনার্দ্দন একটী ভয়ানক চীৎকার করিয়া হস্তস্থিত সেই শাণিত ভুজালি নিজ বক্ষে সজোরে আঘাত করিয়া আত্মহত্যা করিল। সংজ্ঞাহীন ভূতলে পতিত হইয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল। চীৎকারের শব্দে হেম ও শ্যাম একটী আলো লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে জনার্দ্দন প্রাঙ্গনে শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখিল রক্তের নদী বহিতেছে। জনার্দ্দন একবার এদিক্ একবার ওদিক্ করিতেছে, অল্প অল্প জ্ঞান তখনও আছে। অস্ত্রের আঘাতে

বক্ষঃস্থল হইতে অবিশ্রান্ত রক্ত পড়িতেছে। নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেও জনার্দ্দন, তোমার এমন অবস্থা কে ক'রে বল, আমরা তাহার সমুচিত প্রতিফল এখনি দিব।"

জনার্দ্দন অতি ক্ষীণস্বরে বলিল "আমায় কেউ মারে নি। তোমা-দে-র প-বি-ত্র দেহ-ন-ষ্ট এই দ-শা-এক-টু জ-অ-ল" বলিতে বলিতে জনার্দ্দনের নিশ্বাস বন্ধ হইল, আর কথা কহিতে পারিল না। জনার্দ্দন টাকার লোভে পড়িয়া আপনার মৃত্যু আপনিই ঘটাইল। পাপিষ্ঠ কৃষ্ণলালের জন্য জনার্দ্দন আজ অসহায়ে পড়িয়া আত্মহত্যা করিল। কৃষ্ণ-লালের দুরভিসন্ধির ফল আজ জনার্দ্দনের উপর দিয়াই ফলিল। জনার্দ্দন আজ জনমের মত পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিল। হেম ও শ্যাম আগাগোড়া সকলই বুঝিতে পারিল যে নিষ্ঠুর কাকার পাপ পরামর্শে লোভী জনার্দ্দন আজ তাহার পাপের শাস্তি হাতে হাতেই পাইয়াছে। এই ভাবিতে ভাবিতে সে রাত্রি আর তাহাদের উভয়ের নিদ্রা হইল না। চিন্তা এবং দুঃখে তাহারা সে রাত্রি অতি কষ্টে কাটাইল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ভ্রাতা ও ভগিনী।

শীতকাল। রাত্রি ৭টা বাজিয়াছে। পশু পক্ষিগণ শীতে জড়সড় হইয়া যে যার বাসায় আশ্রয় লইয়াছে। বালকেরা তাহাদের পড়ায় মন দিয়াছে। চাষারা সমস্ত দিনের পরি-শ্রমের পর সন্ধ্যার সময় অগ্নির সাহায্য লইয়াছে। পৃথিবীস্থ

জীব জন্তুগণ প্রচণ্ড শীতের ভয়ে কেহই আর ঘরের বাহির হইতে পারিতেছে না। এমন সময়, এই প্রচণ্ড শীতের সময় বাঁড়ুয্যে বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বের ঘরে বসিয়া একটী বিধবা রমণী কপোলদেশে হস্তার্পণ করিয়া কি করিতেছে? তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন কি ভাবিতেছে, অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্না, যেন কাহার নিকট কত কি অপরাধে অপরাধিনী। তাহার তেমন প্রফুল্ল মুখকমল তখন দেখিলে যেন গ্রীষ্ম কালের প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে শুষ্ক কুসুম-কলিকা বলিয়া বোধ হইত। তেমন প্রচণ্ড শীত যেন তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে।

পাঠক মহাশয়! শোক-সন্তপ্তা, পরদুঃখ-কাতরা, মলিন বদনা অসীম চিন্তাস্রোতে ভাসমানা এই বিধবা বালাকে কি চিনিতে পারিয়াছেন? ইনি আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদায়িনী সরলা বিধবা বালা কেতকিনী। কেতকিনী অনিমেষনয়নে রাত্রিকালে বসিয়া কি ভাবিতেছে? কেতকিনী আজ চিন্তা-সহচরীকে আশ্রয় করিয়া তাহার সেই অচিন্তনীয়া প্রকৃতিকে অধিকতর চিন্তাশীলা করিতেছে। কেতকিনী যখন শুনিল জনার্দ্দন তাহার সেই ভ্রাতার অমানুষিক পরামর্শে অকালে অসহায় অবস্থায় জনমের মত পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, যখন শুনিল ডাকাতি হইতে রক্ষা পাইয়া হেম প্রথমবারে জনার্দ্দনকে পুলিসের হস্ত হইতে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ছাড়াইয়া দিলেও তাহার নিষ্ঠুর ভ্রাতা তাহাকে আবার ইচ্ছা করিয়া কৃতান্তের হস্তে নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র ভীত বা

সঙ্কুচিত হন নাই বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকার লোভ দেখাইয়া তাহাকে শমনসদনে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন এবং তাহার এখন অন্যায়রূপে আত্মহত্যার কথা শুনিয়াও তাঁহার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল না, এখনও তিনি যে নির্ব্বোধ সেই নির্ব্বোধই রহিলেন, ভাইপোদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব তাঁহার আজিও গেল না, ভাইপোদের বিপদে তাঁহার চক্ষের জল পড়িল না, ভাইপোদের জন্ম তাঁহার পাষাণ হৃদয় কাঁদিল না, কিন্তু জনার্দ্দনের মৃত্যু শুনিয়া তিনি অনায়াসে চক্ষের জল ফেলিলেন তাহার জন্য অনেক দুঃখ করিলেন, তাহার অন্তিম কালের দুর্দ্দশার বিষয় অনেক ভাবিলেন তখন একদিকে ভ্রাতার অপবিত্র কলুষিত চরিত্র এবং অন্য-দিকে তাহার ভাইপোদিগের স্বর্গীয়, অনুপম, পবিত্র চরিত্র শ্যামের তেমন ন্যায়পরতা, তেমন উদারতা ও অনির্ব্বচনীয় বন্ধুত্ব-প্রণয় ভাবিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখসাগরে নিমগ্না হইল। কেতকিনী কপোলদেশে হস্তার্পণ করিয়া হেটবদনে তাহাই ভাবিতেছে এমন সময় সেই ঘরে দ্বিতীয় মূর্ত্তি আসিয়া দেখা দিল। কেতকিনী এত চিন্তিতা, এত অনন্যমনা ছিল যে কৃষ্ণলাল যে ঘরে আসিয়া তাহার নিকটে বসিয়া আছেন তাহা জানিতেও পারিল না। কৃষ্ণলাল প্রায়ই কেতকিনীর নিকট বসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেন।

কৃষ্ণলাল কেতকিনীকে তদবস্থাপন্না দেখিয়া বলিলেন "কেতকিনী! তোমায় আজ এত বিষণ্ণা ও এত কাতরা দেখ্‌ছি কেন? যেন কি ভাবচো ভাবচো ব'লে বোধ হচ্ছে। তোমার আজ হঠাৎ এরূপ ভাব হইবার কারণ কি?"

কেতকিনী তাহার ভাইকে দেখিয়া থতমত খাইয়া অপ্র-স্তুত হইয়া বলিল "কে দাদা এসেছ? এসো, বসো। আমি আরও তোমাকে ডাকিতে পাঠাইব মনে করিয়াছিলাম। তুমি যে দয়া করিয়া আপনা হইতেই এ অধিনীর গৃহে পদার্পণ করিয়াছ তাহাতে আমি বড়ই উপকৃতা হইলাম। দাদা! আমি আজ তোমাকে গুটিকত কথা বলিব বলিয়া মনে করিয়াছি যদি ছোট ভগ্না ব'লে এ অধিনীর কোন অপরাধ না লও তবে বলিতে সাহস করি।"

কৃষ্ণলাল কেতকিনীর মুখে এইরূপ কথার ভূমিকা শুনিয়া বলিলেন "কি বল্‌বে বল, দোষের কথা না হ'লে কেন শুধু শুধু রাগ কর্‌বো বলো, তোমার কোন কথায় কি আমি কখন তোমার উপর রাগ করেছি যে আজ রাগ কর্‌বো?"

কেতকিনী কল্যাণপুরে আসিয়াবধি কৃষ্ণলালকে কোন বিষয়ের জন্য কিছু অনুরোধ করে নাই, তথাপি কৃষ্ণলালের স্নেহ তাহার উপর সমভাবেই আছে এইরূপ আশা করিয়া কেতকিনী তাহার ভাইকে বলিল "দাদা! আমি তোমাপেক্ষা বয়সে ছোট হইলেও, তোমার অপেক্ষা আমার জ্ঞান অল্প হইলেও তোমার কোন দোষ দেখিলে সে দোষ সংশোধনের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে আমি কখনই ত্রুটী করিব না। ভাই! তোমার তেমন পবিত্র নিষ্পাপ অন্তঃকরণ এত অপবিত্র ও এত কলুষিত হইল কেন? তুমি কি পুণ্য কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা কর না? তাহাই যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য তাহা কি জান না?"

"দাদা! দেখ মানবমাত্রই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিয়া কার্য্য করিত তবে তাহাদের কখনই এ জগতে দুই দিনের জন্য আসিয়া এত দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। দেখ ঈশ্বর রোপিত মানববৃক্ষের সুখ ও দুঃখ এই দুইটী প্রধান শাখা, চিন্তা ও আশা তাহার প্রধান রস, আর মায়া, স্নেহ, মমতা, ভক্তি এই সমুদায় সেই বৃক্ষের পাতাস্বরূপ। ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই তাহার ফলস্বরূপ। এই চতুর্ব্বর্গ ফল একমাত্র মানববৃক্ষেই ফলে, কেবল নাম ভেদে পরস্পর প্রভেদ মাত্র নতুবা একেই চারি আর চারেই এক সকলই সমান। পুণ্য কার্য্য এই মানববৃক্ষের ফুলস্বরূপ। সকল বৃক্ষে এ ফুল ফোটে না সুতরাং সকল বৃক্ষে ফলও হয় না। দাদা! লোকে এই সংসারক্ষেত্রে থাকিয়া যেরূপ কার্য্য করিবে তাহার মানববৃক্ষে ফলও সেইরূপ ফলিবে। তুমি চিন্তা ও আশাকে আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃই ঈশ্বরের কৃপায় বর্দ্ধিত হইতেছ বটে এবং তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অজ্ঞাতসারে শাখা দুইটীও একটীর পর আর একটী বাড়িতেছে বটে কিন্তু তোমার গাছের পাতাসকল ক্রমেই যে কোঁকড়াইয়া যাইতেছে তাহা ত তুমি দেখিতে পাইতেছ না? তোমার গাছে ফুলও ত কখন ফুটিতে দেখিলাম না সুতরাং তোমার মানববৃক্ষে ফলও যে কখন ফলিবে তাহাও তুমি আশা করিতে পার না। তাই বলিতেছিলাম যে সকল বৃক্ষে সমান ফল ফলে না। কোন বৃক্ষে চারিটীর প্রথমটী অল্পই ফলে, কোন বৃক্ষে দ্বিতীয়টী অধিক ফলে, কোন বৃক্ষে আবার তৃতীয়টী আরও অধিক ফলে। কিন্তু চতুর্থটী বৃক্ষ শুষ্ক হইবার

সময় জানা যায় যে সকল বৃক্ষে চতুর্থটী সমান ফলে কি না। আবার ঐ চারিটীর পরস্পর এমনি সম্বন্ধ যে একটী না ফলিলে আর একটী ফলে না।"

"ঈশ্বর কর্ত্তৃক সংসারক্ষেত্রে রোপিত তোমার ন্যায় মানববৃক্ষে ফুল ত কখন ফুটিল না অতএব তোমার বৃক্ষে ফলও যে আর ফলিবে তাহার আশা করিও না। অন্যান্য বৃক্ষ যেমন চেষ্টা করিলেও তাহাদের নিজের চেষ্টায় ফুল কি ফল কিছুই হইতে পারে না, মানববৃক্ষে সেরূপ নয়। মানবমাত্রেই চেষ্টা করিলে, আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেই মানববৃক্ষের ফুল এবং ফল যখন ইচ্ছা তখনই হইতে পারে, ইহার সময় অসময় নাই। তোমার বৃক্ষে রস যথেষ্ট আছে সুতরাং বৃক্ষও বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু পাতা নাই, ফল কি ফুল কিসে হইবে? দুইটী শাখা ছিল তাহার একটী মাত্র এখন সার হইয়াছে। আর একটীর সিকি ভাগ মাত্র আছে আর সমুদায়ই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। যে টুকু আছে যদি গাছের এখনও যত্ন কর তবে সেটী আবার বর্দ্ধিত হইতে পারে। প্রধান শাখাটী বর্দ্ধিত হইলে অন্যটীকে তখন অনায়াসেই কাটিয়া ফেলিতে পারিবে। দাদা! তাই বলি এখন যত্নপূর্ব্বক গাছের সেবা কর পরে সেই প্রধান শাখাটী বর্দ্ধিত হইয়া তাহাতে ফুল ও ফল সকলই হইতে পারে।"

"ভাই! তোমার স্ত্রী তোমার এই চারি ফলের উৎপাদনের জন্য ফুল জন্মাইতে দিবে না। সে তোমার মানববৃক্ষের আগাছাস্বরূপ। সে তোমার বৃক্ষের নাশের নিমিত্ত দুরপ্রকার কীটের জন্মদায়িকা মাত্র। সে তোমার বৃক্ষে

কীট গুলিকে তোমায় না দেখাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, তুমি এখন জানিয়াও সে কীট নাশ করিবার কিছুই উপায় দেখিতেছ না। তুমি ইচ্ছা করিয়া কেন তোমার বৃক্ষ নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছ? এখনও বুঝিয়া কার্য্য কর এখনও তোমার বৃক্ষে সুফল ফলিবে। এখনও তোমার সংসারক্ষেত্রস্থ মানববৃক্ষে তুমি সুফল দেখিতে পাইবে। তুমি জানিও সংসার-ক্ষেত্রে স্ত্রী তোমার ঘাসস্বরূপ। ঘাস যেমন লোকে ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দেয় তোমারও সেইরূপ সংসারক্ষেত্রস্থ স্ত্রীস্বরূপ ঘাসকে বৃক্ষনাশক মনে করিয়া অযত্নই করা উচিত।"

"অত্যাচার, প্রবঞ্চনা, পরের অনিষ্ট বাসনা এ সমুদায়ই দেহীমাত্রেরই নাশমূলক তাহা কি তুমি জান না? তাই বলি দাদা তুমি এখনও এ সকল ত্যাগ কর, আত্মীয়ের প্রতি স্নেহ মমতা করিতে যত্নবান্ হও, যাহাদের হইতে পরকালে এক গণ্ডুষ জল পাইবে তাহাদের সামান্য তৃণজ্ঞানে অযত্ন করিও না, তাহাদের উপাদেয় শস্যজ্ঞানে যত্নপূর্ব্বক গৃহে রাখিবার চেষ্টা কর তাহাতে তোমার বৃক্ষে সুফল বৈ কুফল ফলিবে না। দেখ পূর্ব্বকালে অজামীল কি পাপই না করিয়াছিল, কত লোকের প্রতি কত অত্যাচার করিয়াছে কত লোককে কত ঠকাইয়াছে কত লোকের কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কত যে অনিষ্ট করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু সে জীবদ্দশায় এত পাপ করিয়াও তাহার পুত্রের নাম নারায়ণ রাখিয়াছিল বলিয়া মৃত্যুসময়ে সে তাহার পুত্রকে ডাকিতে গিয়া নারায়ণ নাম উচ্চারিত হওয়াতে

তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুদূতে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। তাহার পুত্রের নাম নারায়ণ রাখিয়াছিল বলিয়াই ত মৃত্যুকালে তাহার মোক্ষপদ হইল। তুমি তোমার জীবনে কি কার্য্য করিলে যাহাতে কৃতান্তের কঠিন নিগড় হইতে পরিত্রাণ পাইবে?"

"তোমার স্ত্রী যাহাকে তুমি এই সংসারে আপনার বলিয়া মনে কর, যাহার পরামর্শ তোমার নিকট সৎপরামর্শ বলিয়া জ্ঞান হয়, যাহার সুখে এবং দুঃখে তুমি সুখ ও দুঃখ বোধ কর সেই স্ত্রী তোমার অসময়ে কখনই তোমার প্রতি ফিরিয়া চাহিবে না। শাস্ত্রে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। আমি তাহার দুই একটী দেখাইয়া দিতেছি। দেখ যে বাল্মীক মুনির নাম করিলে লোকে এখনও উদ্ধার হয় সেই বাল্মীক মুনি প্রথমে রত্নাকর নামে জন্মিয়া কি পাপই না করিয়াছিলেন। কত লোককে বিনা দোষে হত্যা করিয়াছেন, কত লোকের স্ত্রী পুত্র বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছেন, কত লোককে কতপ্রকারে কষ্ট দিয়াছেন। কিন্তু যখন ব্রহ্মা ও নারদ আসিয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার পাপের ভাগী কে? এই কথাটী তোমার পরিবারবর্গের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। তিনি একে একে সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু তাঁহার পাপের ভাগী কেহই হইতে চাহিল না। এমন কি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ যে স্ত্রী যাহার সকল ভাগই লওয়া উচিত সে পর্য্যন্ত তাঁহার পাপের ভাগী হইতে চাহিল না। অবশেষে নারদ ও ব্রহ্মা ছলনায় রামনাম বলাইয়া রত্নাকরকে উদ্ধার করিয়া-

ছিলেন। তিনিই শেষে বাল্মীক মুনি হইয়া লোকের জন্য ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিলেন।"

"আরও দেখ রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যের শাপে জরা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার জরাদেহ বিনিময়ে যৌবন দিবার জন্য তিনি প্রত্যেককে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার জরা লইয়া যৌবন বিনিময় করিল না। অবশেষে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তাহার পিতার জরা লইয়া তাহার বিনিময়ে তদীয় যৌবন পিতাকে দান করিল। রাজার স্ত্রী, যিনি অতিশয় পতি-সোহাগিনী বলিয়া পুরাণে কথিত আছে, রাজা যাহার কথায় উঠিতেন ও যাহার কথায় বসিতেন; যে মরিতে বলিলে তিনি মরিতেন এবং বাঁচিতে বলিলে বাঁচিতেন এমন যে স্ত্রী সেও রাজার বিপদের সময় ফিরিয়া চাহিল না। তাঁহার জরাদেহ লইতে নানারূপ ওজর আপত্তি দেখাইয়া অস্বীকার করিল। তাহার স্বামীর জরাদেহকে ঘৃণার সহিত তুচ্ছ করিয়া যৌবন বিনিময় করিতে চাহিল না। দেখ দাদা আর তোমায় কত দৃষ্টান্ত দেখাইব। অতএব জানিবে স্ত্রী কখনই আপনার হইবে না। সে তোমার অসময়ে কখনই তোমার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিবে না। সে এই সংসারে কুহকিনীস্বরূপা। মায়াজাল বিস্তার করিয়া আছে কিসে স্বামীকে ফাঁদে ফেলিতে পারে।"

"তোমার জীবনের সহায় একমাত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে স্নেহ, মমতা সকলই মনুষ্য দেহে প্রাদুর্ভূত হয়। আবার তোমার নিধনকালে কেহই তোমার সঙ্গে যাইবে না। স্ত্রী বল পুত্র বল, পিতা বল, মাতা বল, ভাই বল, বন্ধু বল, টাকা বল,

কড়ি বল সকলই পড়িয়া থাকিবে। যে পিতা মাতা তোমার জীবদ্দশায় তোমাকে এত যত্ন, এত আদর, এত স্নেহ, এত অনুরাগ দেখাইয়া তোমায় লালন পালন করেন তোমার অন্তিমকালে তাঁহারা তোমাকে স্পর্শও করিবেন না। তোমায় ঘৃণাপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিবেন। কিন্তু দেখ তোমার জীবিতাবস্থায় তুমি ধর্ম্ম আশ্রয় কর সেই ধর্ম্ম তোমার নিধন-কালেও তোমার সঙ্গে যাইবে। ধর্ম্ম তোমায় কখনই ত্যাগ করিতে পারিবে না। ধর্ম্ম আচরণ ভিন্ন জগতে পুণ্য কার্য্য আর কিছুই নাই ; আবার পুণ্য কার্য্য না হইলে তোমার মানববৃক্ষে সুফল ফলিবে না। ভাই! মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া যদি ধর্ম্ম আশ্রয় না করিলে, যদি ধর্ম্মের সার মর্ম্ম গ্রহণ না করিলে, যদি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম পথ না চিনিলে তবে ঈশ্বরের নিকট কি বলিয়া জবাব দিবে? তোমায় যে তখন নরকেও স্থান হইবে না! ধর্ম্মপথে চলিতে গেলে স্ত্রীকে কেবল মাত্র তোমার সংসারের সহায় বলিয়া ভাবিবে।"

"দাদা! তুমি কি তাই জান না যে ভাইপোরা তোমার কে? আজিও কি তুমি তাহাদের হীরকের টুক্‌রা বলিয়া চিনিতে পার নাই? আজিও কি তুমি ভাল জহরী হইয়া জহর চিনিয়া লইতে পারিলে না? তাই বলি দাদা ভাই-পোরাই তোমার ধর্ম্ম, ভাইপোরাই তোমার অর্থ, ভাইপোরাই তোমার কাম আর ভাইপোরাই তোমার মোক্ষ। পরকালে তোমার এক গণ্ডূষ জল দিবার যদি কেহ থাকে তবে তাহা-রাই আছে ; ইহকালে তোমার ধর্ম্মের পথ দেখাইতে যদি কেহ থাকে তবে তাহারাই আছে ; তোমার জীবনের যদি

কিছু সুখ থাকে তবে তাহারাই আছে। মনে করিয়াছিলে তাহাদের পৃথক্ করিয়া দিয়া তুমি সুখী হইবে কিন্তু সংসারচক্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া দেখিলে সুখ পাইলে না। অতএব জানিও এ সংসার সুখের আলয় নয়, সকলই মায়াময়। মায়াতে তুমি আমি কেবল চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া একবার সুখ ও একবার দুঃখ ইহাই অবিরত প্রত্যক্ষ করিতেছি। কেবল মায়াতেই তুমি আমার আমি তোমার, স্ত্রী আমার, পুত্র আমার, বলিয়া মানবগণ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু দাদা জানিও এ সকলই অসার, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই সার। সেই সার ধর্ম্মের আশ্রয় লও তোমার অবশ্যই মঙ্গল হইবে। আবার যদি ধর্ম্ম পাইতে ইচ্ছা কর, যদি পৃথিবীতে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা কর, যদি সংসারে থাকিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে বাসনা থাকে তবে আত্মীয়পক্ষের সাপক্ষ হও, সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ তোমার ভাইপোদের আনিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহ মমতা বিস্তার কর দেখিবে এ সংসার সুখের আলয় হয় কি, না, দেখিবে তোমার মানববৃক্ষে সুফল ফলে কি না, জানিবে তোমার স্ত্রী তোমার কি তাহারাই তোমার। তখন এই দুঃখিনী পতিপুত্রহীনা কেতকিনীকে দিনান্তে একবার মনে করিও এই আমার শেষ ভিক্ষা। তোমার স্নেহের ছোট ভগ্নী কেতকিনী তোমার নিকট আর কিছুই চায় না।"

কেতকিনী যতক্ষণ এই সকল কথা বলিয়াছিল কৃষ্ণলাল মৌনভাবে দৃঢ় মনঃসংযোগের সহিত সমস্ত কথাই শুনিয়া-

ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের চাঞ্চল্যবশতঃ এবং অধিক রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া সে দিন আর কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া পাছে মেজবউ দেখিতে পায় বা শুনিতে পায় সেইভয়ে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

অষ্টাবিংশ ধাপ।

হরলাল মুখুয্যে।

মাঘ মাসের সন্ধ্যার পর একদিন কৃষ্ণলাল বেড়াইতে বেড়াইতে একখানি গাড়ী কল্যাণপুরের রাস্তায় আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। গাড়ীখানির দরজা বন্ধ। গাড়ীর উপরে একটী বাক্স্রা, বাক্স্রাটী অনুমানে বোধ হইল বোঝাই করা। গাড়ীখানি ক্রমশঃ মৃদুমন্দ গতিতে তাঁহার বাড়ীর গলিতে প্রবেশ করিল তাহাও দেখিলেন। গাড়োয়ান মধ্যে মধ্যে গান গাইতে গাইতে এক একবার "ধীরো ধীরো" "হ্যাট্ হ্যাট্" করিয়া গানের তাল দিতেছে, আবার মধ্যে মধ্যে বেচারা নির্দ্দোষী ঘোড়ার পৃষ্ঠের উপর চা'বুকবর্ষণ করিতেছে। এইরূপ করিতে করিতে গাড়োয়ান ক্রমেই মুখুয্যে বাড়ীর দরজার সম্মুখে গিয়া পৌঁছিল। তখন গাড়োয়ানের গানও থামিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া বেচারাও বাঁচিল। কৃষ্ণলাল দেখিলেন গাড়ীখানি আসিয়া হরলাল মুখুয্যের বাড়ীর দরজায় থামিল; তিনিও তাড়াতাড়ি সেই স্থানে গিয়া গাড়ীর দরজার নিকট দাঁড়াইলেন কিন্তু হঠাৎ গাড়ীর দরজা

খুলিতে সাহস করিলেন না কারণ তিনি ভাবিলেন যে গাড়ীর ভিতর অচেনা স্ত্রীলোকও থাকিতে পারে। তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় গাড়ীর দরজা খুলিয়া একটী সাত বৎসরের বালক দুই হাতে করিয়া দুটী বড় পিয়ারা লইয়া গাড়ী হইতে নামিল। ক্রমে একটী দোহারা স্ত্রীলোক এক হাতে কাপড় দিয়া মুখবাঁধা একটী ভাঁড় ঝুলাইয়া অপর হাতে একটী বড় পাথরের বাটী লইয়া গাড়ী হইতে নামিল। পরে এক জন চাকর একটী কাপড়ের বুচ্‌কী হাতে করিয়া নামিল। সকলের শেষে একটী বৃদ্ধ একটী বৃহৎ ব্যাগহস্তে গাড়ী হইতে নামিল।

পাঠক মহাশয়! ইহারা কে চিনিয়াছেন কি? ইহারা সকলেই আপনার পরিচিত। প্রথমে যিনি পিয়ারা হস্তে গাড়ী হইতে নামিলেন তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত রুগ্ন, দুর্ব্বল সাত বৎসরবয়স্ক সেই "বসন্তবেহারী"। বসন্তবেহারী আর এখন সে বসন্তবেহারী নাই, তাহাকে দেখিলে যে একবার মাত্র দেখিয়াছে সে কখনই চিনিতে পারে না। আমরা প্রায়ই দেখিতাম তাই প্রথম গাড়ী হইতে নামিবামাত্রই চিনিয়া পাঠক মহাশয়কে বলিলাম। বসন্তবেহারীর শরীরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর সে আমাশয় রোগ নাই, শরীর সেরূপ শীর্ণ হাড় পাঁজরাময় নয়, এখন বসন্তবেহারী দিব্য হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ কান্তিবিশিষ্ট শরীর পাইয়াছে। না পাইবেই বা কেন? এখন আর সে জগদম্বা নাই যে তাহার পাপের জন্ত তাহার প্রিয়দর্শন যন্ত্রণা ভোগ করিবে। জগদম্বার সঙ্গে সঙ্গেই বসন্তবেহারীর

রোগের সকল যন্ত্রণা ফুরাইয়াছে। রাজার পাপে যে রাজ্য নষ্ট এ কথা যথার্থ নতুবা জগদম্বা মরিবার পরই বসন্ত-বেহারীর যন্ত্রণাভোগ শেষ হইবে কেন? পরে এক হাতে ভাঁড় ও এক হাতে বড় পাথর বাটী লইয়া যে একটা স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিল ইহার বিষয় পাঠক মহাশয়কে বোধ হয় আর বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না। ইনি হরলাল মুখুয্যর স্ত্রী। তৃতীয়টী বাড়ীর চাকর। সর্ব্বশেষে ব্যাগ-হস্তে হরলাল নিজে গাড়ী হইতে নামিলেন।

হরলাল গাড়ী হইতে নামিলে কৃষ্ণলাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "তার পর মুখুয্যে মহাশয়! খবর সব ভাল? বসন্তপ্রভৃতি আপনার পরিবারবর্গ সকলেই ভাল আছে? তার পর কখন্ বেরিয়েছিলেন, বরাবর ষ্টেসন থেকেই আসছেন নাকি?"

হরলালও কৃষ্ণলালকে প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন "কাল সন্ধ্যার সময় মুঙ্গের থেকে বেরিয়ে বরাবর রেলের গাড়ী-তেই ছিলাম। বেলা ৫টার সময় হাবড়া ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম। হাবড়া হইতে বরাবর ঘোড়ার গাড়ীতেই আস্ছি। তার পর আপনার বাড়ীর সব ভাল?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন "আপাততঃ সবই ভাল। তবে আমার কন্যাটী কিছুদিন হইল মারা পড়িয়াছে। আর বাড়ীতে সর্ব্বদা ব্যায়রাম পীড়া এ আর কামাই ছিল না। আজ এর্ বসন্ত, কাল ওর্ জ্বর এইরূপ ব্যায়রাম পীড়াতেই দিন কেটেছে। আমারও মাঝে অত্যন্ত অসুখ গিয়াছে" বলিয়া প্রজার নিকট যে মার খাইয়াছিলেন তাহার বিষয়ও বলিয়া

হঠাৎ কৃষ্ণলালের মনে পড়িয়া যাওয়াতে বলিলেন "এঃ বসন্ত হওয়া, ব্যায়রাম পীড়া হওয়া, আমার মেয়ে মরা এ সব ত আপনি দেখেই গিয়েছেন তবে আর বেশী ব'লে প্রয়োজন কি ?" হরলালও যাহা যাহা জানিতেন বলিলেন কিন্তু বাড়ীর চাকর জনার্দ্দনকর্ত্তৃক জগদম্বার শাস্তি, তাঁহার বাড়ী ডাকাতি, ও জনার্দ্দনের আত্মহত্যা কৃষ্ণলাল এ সমুদয় কিছুই বলিলেন না পাছে তাঁহার বাড়ীর চাকর বলিয়া হরলাল তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু তাহা কি হরলাল বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারিবেন না ? কৃষ্ণলাল তাহা জানিলেও নিজমুখ হইতে কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

এই সকল কথা হইতে হইতে হরলাল ক্রমেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কৃষ্ণলালকে আদ্যোপান্ত সমুদয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণলাল ক্রমে ক্রমে কি করেন অগত্যা ডাকাতি হইতে আরম্ভ করিয়া জনার্দ্দনের আত্মহত্যা পর্য্যন্ত সমুদয় হরলালকে বলিলেন। কিন্তু জনার্দ্দনের আত্মহত্যার বাস্তবিক কারণ গোপন রাখিয়া অন্য কারণ হরলালের নিকট প্রকাশ করিলেন। হরলাল সমস্ত শুনিয়া কৃষ্ণলালের উপর আন্তরিক কিছু চটিলেন কারণ তিনি ভাবিলেন যে তাঁহার বাড়ীর চাকর ডাকাতি করিল অথচ তিনি আমাদের বাড়ীর জিনিস পত্র কিছুই রক্ষা করিতে পারিলেন না। সেও থাক্ একটা লোক অসহায়ে মারা গেল তিনি তাহাতে কিছুই সাহায্য করিতে পারিলেন না। এই ভাবিয়া হরলাল অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কৃষ্ণলাল কিন্তু জানিতে

পারিলেন না যে হরলাল তাঁহার উপর কোনরূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কারণ হরলালের রাগ কৃষ্ণলালের উপর অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই এবং তিনি বাহ্যিক কিছুই দেখান নাই।

কৃষ্ণলাল পশ্চিমের সংবাদাদি ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। জিনিস পত্র হরলাল যাহা পশ্চিম হইতে আনিয়াছিলেন সে সমস্তই একে একে কৃষ্ণলালকে দেখাইলেন। কৃষ্ণলাল দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন হরলাল কতক কতক নূতন নূতন জিনিস পাড়ার সকলকেই বিলাইলেন। যে, যে দ্রব্য আনিতে বলিয়া দিয়াছিল তাহাকে সেই সেই দ্রব্য বুঝাইয়া দিয়া পাঠাইলেন। মেজবউ সে রাত্রিতে আর মুখুয্যে বাড়ী আইসে নাই। পরদিন মেজবউ দেখা শুনা করিয়া চলিয়া গেল। হরলাল মুখুয্যের সংসার ডাকাতেরা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গিয়াছিল। ক্রমে আবার সংসার পাতিয়া আবার সাংসারিক সমুদয় জিনিস ঠিক্ করিয়া লইতে হরলালের অনেক দিন বিলম্ব হইয়াছিল। কিছুদিন পরে মুখুয্যে সংসার আবার নূতনত্ব প্রাপ্ত হইল। কোন জিনিসের আর অনাটন রহিল না। বসন্তবেহারীর শরীরেও রোগের আর কোন চিহ্ন রহিল না। হরলাল মুখুয্যে কেবল জগদম্বাবিহীন হইয়া কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাইতে লাগিলেন।

উনত্রিংশ অধ্যায়।

জমীদারি সেরেস্তা।

নবনারায়ণ চৌধুরি কল্যাণপুরের একজন বিখ্যাত জমীদার। ইহার জমীদারি সেরেস্তায় নায়েব, গোমস্তা, কারকুন সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিয়া মাসমাহিয়ানায় চাকরী করিত। এক জন ম্যানেজার ইহাদের সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। সমস্ত সেরেস্তায় ১০।১২ জন আম্‌লা ছিল। কৃষ্ণলাল এই জমীদার সেরেস্তায় চাকরী করিতেন। তিনি মোকর্দ্দমা মাম্‌লার তদ্বির করিতেন, কোন প্রজার নিকট হইতে টাকা আদায় না হইলে তাহার নামে বাকী খাজানার মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে তিনিই করিতেন। আম্‌লাদের কার্য্যের বন্দোবস্ত করা কি তাহাদের জবাব দেওয়া কিম্বা নূতন আম্‌লা বাহাল করা অথবা তাহাদের কাজ কর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে তাহা দেখা এ সমুদয়ই কৃষ্ণলাল করিতেন। গোমস্তা প্রজাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া কৃষ্ণলালের নিকট দিত। আম্‌লারা জমীদারি কাগজ পত্র তৈয়ারি করিত আর কৃষ্ণলাল তাহাদের নিকট হইতে সন সন কাগজ বুঝিয়া লইতেন। বাবু নিজে কিছুই দেখিতেন না। হিসাব নিকাশে যদি কখন কোন গরমিল থাকিত তবে কৃষ্ণলাল তাহা বুঝিয়া লইয়া যেখানে যে ভুল থাকিত তাহা সংশোধন করিয়া লইতেন। জমীদারি কাগজ উপরওয়ালা আর কেহই দেখিত না।

অন্য সকলের অপেক্ষা কৃষ্ণলালকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইত ও কার্য্যের ঝুঁকিও অন্য সকলের অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক লইতে হইত। জমীদার সরকারে কৃষ্ণলালের কার্য্যের যেরূপ গৌরব ছিল তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগের প্রতি তাঁহার ব্যবহার তদ্রূপ ভাল ছিল না। কি প্রজাগণ কি আম্‌লাবর্গ কেহই তাঁহার উপর ততদূর সন্তুষ্ট ছিল না। তাহার পরিচয় পূর্ব্বে একবার পাঠক মহাশয় পাইয়াছেন সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ পরিচয় আর এখানে বলিলাম না। কৃষ্ণলাল অন্যায়রূপে প্রজাদিগের নামে বাকী খাজানার নালিস করিতেন, বিনা কারণে একজন আম্‌লাকে ছাড়াইয়া দিয়া তাহার স্থানে অন্য আম্‌লা নিযুক্ত করিতেন। এইরূপ নানাপ্রকার অত্যাচারে সকলেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। কেহ সাহস করিয়া উপরওয়ালাকে জানাইতে পারিত না পাছে চাক্‌রী যায় এই ভয়ে।

পূর্ব্বে একস্থানে বলা হইয়াছে যে জমীদার সরকারের কাগজ হিসাব নিকাষে পাঁচ হাজার টাকার গর্‌মিল। তাহা এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণলাল কোন মতে মিলাইতে পারেন নাই। মিলাইতে পারিবেন কি, তিনিই তাহার নায়ক। যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক। আম্‌লারা জানিত যে কাগজে গোঁজামিল দেওয়া আছে, কিন্তু চাকুরী যাইবার ভয়ে কেহ কিছু প্রকাশ করিতে পারিত না। কৃষ্ণলাল ক্রমে ক্রমে এক শত দুই শত টাকা করিয়া লইয়া জমীদার সরকারের পাঁচ হাজার টাকা ভাঙ্গিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই সেই জন্য সশঙ্কিত কখন্ কি হয়।

আজ আম্‌লাবর্গ এখনও সেরেস্তায় বসিয়া কেন? রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে তথাপি তাহারা আজ সেরেস্তা বন্ধ করে নাই কেন? একস্থানে বসিয়া সকলে কি পরামর্শ করিতেছে? কৃষ্ণলাল ত সেরেস্তায় নাই তবে তাহারা এখনও কেন বসিয়া আছে? সম্মুখে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, প্রদীপের আলোতে বসিয়া কেহ কাগজ নাড়িতেছে, কেহ হিসাব করিতেছে, আবার কেহ কেহ বা পরামর্শ আঁটিতেছে। ইহার কারণ কি পাঠক মহাশয় কি বুঝিয়াছেন? যদি না বুঝিয়া থাকেন, যদি আগাগোড়া জানিয়াও আপনি নিজে বোকা বলিয়া পরিচয় দিতে চান তবে গ্রন্থকর্ত্তা নাচার। এমন স্পষ্ট বিষয়ও যদি না বুঝিতে পারেন তবে সমস্ত রাত্রি জমীদার সেরেস্তায় বসিয়া থাকিলেও আপনি তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিবেন না, সুতরাং আপনাকে সমস্ত রাত্রি জাগরণে কষ্ট পাইতে হইবে না। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শরীর অসুস্থ করিয়া অবশেষে বলিবেন যে গ্রন্থকর্ত্তার দোষে আমার অসুখ হইল। গ্রন্থকর্ত্তারা এরূপ বৃথা কলঙ্কের ভাগ লইতে প্রস্তুত নয়। অতএব এ বিষয়ে আমরা যাহা কিছু জানি তাহাই বলিব।

আম্‌লাবর্গ কৃষ্ণলালের অসদ্ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহাদের মনে মনে এই সঙ্কল্প বদ্ধমূল হইলে কাগজ পত্র নাড়িয়া চাড়িয়া আগাগোড়া সমস্ত দেখিয়া দেখিল যে কাগজে পাঁচ হাজার টাকার গোলমাল। কৃষ্ণলাল যে একশত দুইশত করিয়া ক্রমে লইতেন তাহারা তাহাই

জানিত; কিন্তু এখন যে পাঁচ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে তাহা তাহারা কিরূপে জানিবে? কাগজে এত টাকার তফাৎ দেখিয়া তাহাদের গায়ের অর্দ্ধেক রক্ত শুকাইয়া গেল। তাহারা ভাবিল যে আমরা যদি এত টাকার তফাৎ শুদ্ধ কাগজ চাপিয়া রাখি আর বাবু যদি কখন কোন প্রকারে জানিতে পারেন তবে ত আমাদের চাক্‌রী যাবেই, কিন্তু কৃষ্ণলাল বাবুর বিরুদ্ধে যদি বাবুর নিকট বলি, তবে তিনি তাঁহাকে নিশ্চয়ই ছাড়াইয়া দিবেন। তাহাতে আমাদের লাভ ভিন্ন কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে না। কাগজ-পত্রের গোলমাল বাবু না জানিতে পারিলেও নায়েব কারকুন ইহারা জানিতে পারিবেনই সুতরাং চাপিয়া রাখিলে পরে আমাদের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া তাহারা পরদিন কৃষ্ণলালের অসচ্চরিত্রের কথা বাবুর কর্ণ-গোচর করিবে এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইল। আজ রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত সেরেস্তায় বসিয়া তাহাই ভাবিতেছে। পরদিন বাবুর কর্ণগোচর করিবে ইহাই একপ্রকার স্থির হইয়া গেলে রাত্রি ১১টার পর সেরেস্তা বন্ধ হইল।

কৃষ্ণলালের আজ শ্রাদ্ধের দিন বলিয়া রাত্রি শীঘ্রই প্রভাত হইল (কৃষ্ণলালের পক্ষে) কিন্তু আম্‌লাবর্গকে চিন্তাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিতে হইয়াছিল সুতরাং তাহাদের রাত্রি অতি কষ্টে প্রভাত হইল। আজ কৃষ্ণলালের শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত। শ্রাদ্ধের উপকরণাদি সমস্তই প্রস্তুত কেবল পুরোহিতগণের আগমন অপেক্ষা। ক্রমেই বেলা ১০টা বাজিল। পুরোহিতরূপী আম্‌লাবর্গ আসিয়া দেখা

দিল। সেরেস্তায় আসিয়া একত্র হইয়া বাবুর নিকট উপস্থিত হইল।

মদনারায়ণ বাবু তাঁহার সুসজ্জিত বৈটকখানায় তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে গুড়্গুড়িতে তামাকু সাজা আছে, বাবু কখন গুড়্গুড়ীর নল মুখে লাগাইয়া টানিতেছেন আবার কখন বা নল হস্তে করিয়াই উপস্থিত মূর্ত্তিগণের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। আশে পাশে বৈঠকের উপর দুচারিটী রূপা বাঁধান হুঁকা বৈটকখানার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। বৈটকখানাটী দিব্য সাজান। সমস্ত ঘর জুড়িয়া তক্তাপোষ পাতা। তক্তাপোষের উপর শতরঞ্জি তাহার উপর যাযিম বিছান। বিছানার উপর ৫।৬টী তাকিয়া ছড়ান। দেয়ালে মানভঞ্জন, দশাবতার, দশমহাবিদ্যা, কালীয়দমন প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিবিশিষ্ট ছবি সমুদয় দেয়াল গিরির নীচেই শোভা পাইতেছে। কড়ির সহিত কড়া লাগাইয়া তিনটী ঝাড় ঝোলান আছে। সে গুলি ব্যবহার অভাবে অতিশয় ময়লা পড়িয়াছে। ইতর লোকজন কি প্রজাবর্গ বসিবার জন্য বাবুর সম্মুখেই দুতিন খানি বেঞ্চি পাতা আছে। দেয়ালে ব্র্যাকেটের উপর কৃষ্ণনগরের শিল্পকর নির্ম্মিত ১০।১২টী মৃণ্ময় পুত্তলিকা বসান আছে। বাবু সেকেলে লোক বলিয়া তাঁহার অন্য কোন সখের জিনিস ছিল না, কেবল নব্যসম্প্রদায়ের জন্য পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে একটী বনাত মোড়া টেবিল, দুতিন খানি চেয়ার ও একধারে একটী লোহার সিন্ধুক। দুটী একটী আলমরাও ছিল তাহাতে জমীদারি কাগজ পত্র, পুস্তকাদি থাকিত।

আম্‌লারা বাবুর নিকট গিয়া এক এক প্রণাম ঠুকিয়াই নিশ্চিন্ত। বাবু এক "হুঁ" দিয়াই তামাকু টানিতেছেন আর মাঝে মাঝে খোসামুদেদের সহিত কথা কহিতেছেন। সেরেস্তার আম্‌লারা যে আসিয়াছে সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও নাই। প্রায় এক ঘণ্টা এই ভাবে কাটিল। এক ঘণ্টা পরে যখন আম্‌লারা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত তখন বাবু তামাকু টানা বন্ধ রাখিয়া বলিলেন "খবর কি?"

আম্‌লারা আশ্বাসিত হইয়া কাগজপত্র উল্টাইয়া পাল্টাইয়া হিসাবপত্র বুঝাইয়া দিয়া কৃষ্ণলালের নামে নালিশ রুজু করিয়া চলিয়া গেল।

বাবু অনেকক্ষণ চিন্তার পর, অনেক বার গুড়্‌গুড়ীর নল মুখে ও হাতে করিবার পর কৃষ্ণলালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নায়েব, কারকুন, ম্যানেজার সকলেরই ডাক হইল। সকলের সাক্ষাতে বাবু কৃষ্ণলালকে এই হুকুম দিলেন যে যত দিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণলালের স্থানে অন্য নূতন লোক না বাহাল হয় তত দিন সেরেস্তার কার্য্য বন্ধ থাকে; আর কৃষ্ণলাল কিরূপ জমীদারি শাসন করিয়াছেন অদ্য হইতে পনর দিনের মধ্যে তিনি তাহার হিসাব দিবেন।

কৃষ্ণলালের শিরে বজ্রাঘাত হইল। ভবিষ্যতে কাজ করিতে পারিবেন কি না সে বিষয়ে তাঁহার কোন চিন্তা হইল না। তাঁহাকে যে হিসাব দিতে হইবে এই তাঁহার ভয়ের প্রধান কারণ। যদি তাঁহাকে একেবারে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইত তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বড়ই ভাল হইত।

কৃষ্ণলাল ভাবিতে ভাবিতে বাটী আসিলেন। অন্যান্য দিন তাঁহার আসিবার সময় আম্‌লারা মান্যের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইত কিন্তু আজ সকলেই যেন নিজ নিজ কাজেই ব্যস্ত। তাঁহাকে কেহ গ্রাহ্যই করিল না। হেটমুখে বাটী আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

বিরজা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে? এমন ক'রে শুয়ে পড়্‌লে যে এসে?"

কৃষ্ণলাল উত্তর করিলেন "আর কি বল্‌বো আজ আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

বিরজা বলিল "কি সর্ব্বনাশ?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন "জমীদার আমার কাগজপত্রের হিসাব তলব করেছেন। হিসাবে ত পাঁচ হাজার টাকার গরমিল হয়েছে। আমার চাকরী ত যাবেই আরও ১৫ দিনের মধ্যে টাকা মিলিয়ে না দিতে পার্লে জেল পর্য্যন্তও যেতে হবে।" বিরজা শুনিয়া আর কিছু বলিল না।

কৃষ্ণলাল দিবারাত্র আম্‌লাদিগের বাটী হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিলেন। কোন মতেই কাগজ মিলাইতে পারিলেন না। আম্‌লাদিগকে ঘুষ পর্য্যন্ত দিতে চাহিলেন যদি তাহারা কোনরূপে তাঁহার অপরাধ ঢাকিয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আর কোন উপায় নাই বলিয়া তাহারা সম্মত হইল না। ক্রমেই এক দিন দুই দিন করিয়া ১৪ দিন কাটিল। তথাপি কৃষ্ণলাল কাগজ মিলাইতে পারিলেন না।

আজ ১৫ দিন। বাবু কৃষ্ণলালকে ডাকাইয়া কাগজ বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। কৃষ্ণলাল অনেক চেষ্টা করিলেন

কোন মতেই কাগজ মিলাইতে পারিলেন না। পাঁচ হাজার টাকার তফাতই রহিয়া গেল। বাবু সে দিন কৃষ্ণলালকে বিদায় দিয়া বেলা দুই প্রহরের পর বৈটকখানার সভা ভঙ্গ করিলেন।

ত্রিংশ খাপ।

চতুরের চাতুরী।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে বিদ্যাভূষণ কল্যাণপুরে বামুন-পাড়ায় আসিয়া মতিলালের নামের ক্রীত জমির অর্দ্ধেক নিজ নামে ক্রয় করিয়া তাহাতেই বাস করিয়া আছে। কৃষ্ণলাল তাহাকে বিপদের সময় বাসস্থান দিয়া অসময়ে তাহার উপকার করিয়াছিলেন কিন্তু বিদ্যাভূষণ ক্রমে ক্রমে একজন বিখ্যাত জুয়াচোর, প্রতারক এবং বেশ্যাখোর বলিয়া পাড়ার চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। বামুন-পাড়ার মধ্যে তাহার কেবল কৃষ্ণলাল ও হরলাল এই দুই ঘর যজমান রহিল আর তাহার ভদ্র যজমান কেহই রহিল না। বেশ্যার পুরোহিত বলিয়াই পাড়ার তাহার সুনাম বাহির হইয়া গেল। কৃষ্ণলাল এবং হরলাল ভিন্ন পাড়ায় অপর কোন ভদ্র লোকের বাড়ী তাহার পাত পড়িত না। বেশ্যার উপার্জ্জনেই তাহার সংসার চলিতে লাগিল। বেশ্যার বাড়ীই তাহার আশ্রয় হইল। সে সকলেরই সহিত জুয়াচুরি এবং প্রতারণা করিত। বাড়ীতে চাকরাণী রাখিয়া

বেতন দিবার সময় তাহাকে মারিয়া বিদায় করিত। তাহার বাড়ীতে কোন কার্য্য করিয়া কি ঘরামী কি মিস্ত্রী সকলেই তাহাদের পরিশ্রমের মূল্যের পরিবর্ত্তে প্রহার পাইত। বিদ্যাভূষণ এইরূপে ভদ্র লোকের পাড়ায় থাকিয়া ছোট লোকেরও অধম হইয়া পাড়ার সকলের নিকট ঘৃণিত ও অপমানিত হইত।

যে যাহার উপকার করে কালের দোষে তাহার কিসে সর্ব্বনাশ হয় সে তাহার চেষ্টা করিতে ক্রটী করে না। বিদ্যাভূষণও উপকারীর উপকার ভুলিয়া গিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইয়াছিল। মতিলালের নামে ক্রীত অপর অর্দ্ধেক জমি বিদ্যাভূষণের জমির পার্শ্বে ছিল। বিদ্যাভূষণ ক্রমেই তাহার কিছু কিছু করিয়া প্রায় দুই কাঠা জমি নিজের অধিকারে লইয়া ঘিরিয়া লইয়াছিল এবং কৃষ্ণলালের জমির উপর দিয়া যাতায়াতের রাস্তা করিয়াছিল। কৃষ্ণলাল এতদিন তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। বিদ্যাভূষণ তাঁহার জমির উপর দিয়া যে যাতায়াত করে তাহা তিনি জানিতেন কিন্তু যাতায়াতের রাস্তা বলিয়া কিছুই বলেন নাই। বিদ্যাভূষণ যে ভিতরে ভিতরে তাঁহার কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহার কিছুই তিনি এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। বিদ্যাভূষণ যে কি অসদভিপ্রায়ে তাঁহার জমির উপর দিয়া যাতায়াত করে তাহা বুঝিয়া উঠা তাঁহার সামান্য বুদ্ধিতে ঘটিল না। বিদ্যাভূষণের কূট বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করা কৃষ্ণলালের স্ত্রৈণ বুদ্ধির কর্ম্ম নয়।

শশীভূষণ নামে বিদ্যাভূষণের একজন শ্যালক বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে থাকিয়া লেখা পড়া করিত। সে বিদ্যা-

ভূষণের নিকট আত্মীয় হইলেও তাহার ভগ্নীপতির চরিত্র-গুণে ভগ্নীপতির সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল না। সে কথায় কথায় একদিন কৃষ্ণলালকে বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক তাঁহার জমি অধিকারের বিষয় সমস্তই বলিয়া দিল। তিনি এক-দিন বিদ্যাভূষণকে তাঁহার জমির চিহ্ন দেখাইয়া দিয়া বাস্তবিক যে বিদ্যাভূষণ তাঁহার জমি ফাঁকি দিয়া লইয়াছে তাহা দেখাইয়া দিলেন। বিদ্যাভূষণ তথাপি স্বীকার হইল না। দোষ করিয়াছি জানিয়াও লোকে নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য কখনই দোষ স্বীকার করে না। বিদ্যাভূষণ মনে মনে বুঝিতে পারিল যে বাস্তবিক জুয়াচুরি করিয়াছে তথাপি নিজের জেদ বজায় রাখিয়া জমিটী হস্তগত করিবার জন্য কিছুই স্বীকার করিল না। ক্রমে কথায় কথায় উভয়ের মধ্যে একটী তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। পাড়ার সকলেই জমা হইল। কেহই বিদ্যাভূষণের পক্ষ হইয়া একটী কথাও বলিল না। বিবাদ উত্তরোত্তর গুরুতর দেখিয়া পাড়ার দু চারিজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আসিয়া উভয়ের মধ্যে একটী সালিসী করিয়া দিলেন। কৃষ্ণলালও খোঁটা পুতিয়া নিজের জমির সীমানা চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণলাল ও বিদ্যা-ভূষণ পরস্পর সাপ আর নেউলের ন্যায় হইয়া রহিলেন। পরস্পর দেখা শুনা নাই কথাবার্ত্তা নাই। কেবল পাড়ায় হরলালের সহিত তাহার আজিও সদ্ভাব রহিল। কৃষ্ণলাল একপ্রকার মীমাংসা হইল দেখিয়া কোন কার্য্যবশতঃ স্থানা-ন্তরে চলিয়া গেলেন।

একত্রিংশ ধাপ।

ফৌজদারী আদালত।

বিদ্যাভূষণের সহিত সালিসী দ্বারা মীমাংসা হইল বটে কিন্তু সে সালিসীতে সন্তুষ্ট থাকিবার পাত্র নয়। আপাততঃ তখন একপ্রকার বিবাদ মিটিয়াছিল বটে কিন্তু বিদ্যাভূষণ কৃষ্ণলালের অনুপস্থিতিতে তাঁহার জমির সীমানার চিহ্ন তুলিয়া পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক জমি নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া পাকা প্রাচীর দিয়া লইল। কৃষ্ণলাল কিছুদিন পরে বাড়ী আসিয়া শশীভূষণের নিকট শুনিলেন যে এ বারে সীমানার খোঁটা তুলিয়া প্রায় তিন কাঠা জমি অধিকারভুক্ত করিয়া পাকা প্রাচীর দিয়া লইয়াছে। তিনি শুনিয়া তখন কিছুই না বলিয়া কেবল প্রাচীরটী দেখিয়া রাখিলেন। পরে একদিন কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাভূষণের সাক্ষাতে তাহার সেই পাকা প্রাচীর বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দিলেন। দুই এক কথায় ক্রমে পরস্পর মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া সে দিনের মত ঝগড়ার উপসংহার হইল।

কৃষ্ণলাল একদিন প্রাতঃকালে বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন এমন সময় ফৌজদারী আদালতের পিয়াদা আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি কাগজ দিয়া চলিয়া গেল। তিনি কাগজ খানি দেখিয়াই বুঝিলেন যে তাঁহার নামে শমন আসিয়াছে। বিদ্যাভূষণ তাঁহার নামে ফৌজদারী আদালতে সে দিনের মারামারির দরুণ নালিশ করিয়াছে। সাত দিন পরে মোকর্দ্দমা। এক দিন দুই দিন করিয়া ছয় দিন কাটিল।

কৃষ্ণলাল মোকর্দ্দমার তদ্বিরাদি ভালরূপেই করিলেন। সাক্ষীও দু চারিজন জোগাড় করিলেন। আজ সাত দিন, আজ মোকর্দ্দমা। বেলা ১০ টার সময় উভয় পক্ষ সাক্ষী-সহিত আদালতে হাজীর হইল। বেলা ১২ টার সময় ফরি-য়াদী ও আসামীর ডাক হইল। উভয় পক্ষের উকীল এজ-লাসে গিয়া সাম্‌লা মাথায় দিয়া বসিলেন। বিচারপতি ক্রমেই ফরিয়াদীর সাক্ষীদিগকে তলব করিয়া তাহাদের জোবানবন্দী লইলেন। আসামীরও সাফাই সাক্ষী লওয়া হইল। আসামীপক্ষীয় উকীল কৃষ্ণলালের পক্ষে অনেক বক্তৃতা করিলেন। সমুদয় শেষ হইয়া গেলে হাকিম রায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তীর্থের কাকের ন্যায় এজলাস-শুদ্ধ সকলেই বিচারপতির মুখের দিকে চাহিয়া আছে বিচারপতি কি রায় দেন। সকলেরই মন দুইদিকে ঝুঁকিতে লাগিল। কেহ বলিতেছে আসামী জিতিবে, কেহ বলিতেছে আসামীর জরিমানা হইবে, কেহ বলিতেছে মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইবে। এইরূপ নানাপ্রকার গোলমালে এজ্‌লাস সর্‌গরম হইয়া উঠিল। আদালত লোকে লোকারণ্য। চাপ্‌রাশীরা এক একবার "আস্তে আস্তে" করিয়া চেঁচাই-তেছে। এইবার আদালত কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইল। বিচারপতি রায় লিখিয়া এই হুকুম দিলেন যে ফরিয়াদীর পক্ষে সাক্ষীর কোন সাফাই প্রমাণ না পাইয়া আমি মোক-দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিলাম। হুকুম শুনিয়া কেহ হাসিতে হাসিতে কেহ বা দুঃখ করিতে করিতে গৃহে গমন করিল। যাহারা কৃষ্ণলালের পক্ষ হইয়া আসিয়াছিল তাহারা হাসিতে

হাসিতে আর যাহারা বিদ্যাভূষণের পক্ষ হইয়া আসিয়াছিল তাহারা যে যার দুঃখ করিতে করিতে আদালত হইতে বাহির হইল। চাপ্‌রাশীরা বক্‌সিসের জন্য কৃষ্ণলালকে ধরিল। তিনি কাহাকেও দুই আনা, কাহাকেও বা চারি আনা দিয়া বিদায় করিলেন। চাপ্‌রাশীরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চ'লয়া গেল সে দিনের মত আদালতের কার্য্য শেষ হইল। কৃষ্ণলাল বাড়ী আসিয়া দেবতাদের পূজা অ'চ্ছা দিলেন। পাড়ার সকলকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। যাহারা সাক্ষী দিতে গিয়াছিল তাহাদিগকেও সন্তুষ্ট করিলেন। বিদ্যাভূষণ মোকর্দ্দমা হারিয়া দুই দিন আর বাড়ী হইতে বাহির হইল না। কৃষ্ণলালের জমির প্রাচীর ভগ্নাবস্থায়ই রহিয়া গেল। জমির সম্বন্ধে আর কোন চূড়ান্ত মীমাংসা তখন হইল না।

দ্বাত্রিংশ ধাপ।

চূড়ান্ত মীমাংসা।

ফৌজদারী মোকর্দ্দমার পর আট দশ দিন গেল কিন্তু কৃষ্ণলালের জমির মীমাংসা আজিও কিছুই হইল না। বিদ্যাভূষণ তাঁহার উপর অগ্নিশর্ম্মা হইয়া রহিল। তাঁহার নিকট বিদ্যাভূষণও দুই চক্ষের বিষ হইল। কৃষ্ণলাল নিজের জমিটী পাঁচ জনকে ডাকিয়া তাহাদের সাক্ষাতে জরিপ করিয়া প্রাচীর দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া লইবেন মনে করিলেন

কিন্তু আজি কালি করিয়া ক্রমেই দিন কাটিতে লাগিল, তাঁহার জমির আর সীমাবদ্ধ হইয়া উঠিল না।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে প্যারিমোহন বিদ্যাভূষণের বাড়ীতেই থাকিত। বিদ্যাভূষণ রাত্রিতে বেশ্যালয়ে থাকিত আর প্যারিমোহন বিদ্যাভূষণের পরিবারের রাত্রিকালের শয্যাগুরু হইয়া থাকিত। কৃষ্ণলালের উপরে সুতরাং প্যারিমোহনেরও জাতক্রোধ জন্মিয়াছিল।

একদিন কৃষ্ণলাল রাত্রিকালে শয়ন করিয়া আছেন, রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইয়াছে। সকলেই নিস্তব্ধ। কেবল মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকারা তাহাদের স্বাভাবিক স্বরে গান করিয়া ও চৌকিদারেরা মাঝে মাঝে বাড়ীওয়ালা বাড়ীওয়ালা করিয়া গৃহস্থদিগকে জাগাইয়া নিশীথ সময়ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। সেই ঘোর অন্ধকারময় নিশীথ সময় তাঁহার শয়নঘরের দরজা সবলে খুলিয়া গেল। দরজা খোলার শব্দে মেজবউএর নিদ্রাভঙ্গ হইল, মেজবউ ভয়ে ও আতঙ্কায় তাড়াতাড়ি স্বামীকে ডাকিল। তিনি উঠিয়া প্রদীপ না জ্বালিয়াই আস্তে আস্তে মেজবউকে বাহিরে আনিয়া দরজা বাহির দিক্ হইতে বন্ধ করিলেন। সেঘরে প্রবেশ করিলে সেই একটী দরজা ভিন্ন আর বাহির হইবার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং চোর ঘরের মধ্যে আটক পড়িয়াই পলাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইল কিন্তু পলাইতে পারিল না। কৃষ্ণলাল কাণ পাতিয়া শুনিলেন যে ঘরের ভিতর হইতে পলাইবার জন্য চোর বিস্তর ধস্তাধস্তী করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে

গিয়া দুই তিন জন কনষ্টেবল সঙ্গে করিয়া আসিয়া দরজা খুলিলেন। দরজা খুলিয়া দেখিলেন চোর আর কেহই নয় বিদ্যাভূষণের বাড়ীর প্যারিমোহন! কনষ্টেবলে প্যারিমোহনকে তখন চোর বলিয়া পুলিসে লইয়া গেল। সে রাত্রির মত গোলমাল থামিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে দারগা আসিয়া এঘর ওঘর খুঁজিয়া খানাতল্লাসী করিলেন। অন্য জিনিস পত্র কিছুই যায় নাই কেবল একটী হাত বাক্স পাওয়া গেল না। সেই বাক্সে নগদ টাকা ও গহনা প্রায় এক হাজার টাকা ছিল। নগদ টাকা যাহা ছিল তাহাও আবার কৃষ্ণলালের নিজের সম্পত্তি নয় সুতরাং বাক্সটীর জন্য তাঁহার বড়ই ভাবনা হইল। চোরকে বিস্তর প্রহারাদি করা হইল। সেইখানে বিদ্যাভূষণও ছিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর চোর বলিয়া ফেলিল যে বিদ্যাভূষণের বাড়ীতেই বাক্স আছে। বিদ্যাভূষণের বাড়ীও খানাতল্লাসী করা হইল। বাক্স বিদ্যাভূষণের বাড়ী হইতেই বাহির হইল। বিদ্যাভূষণকে ও প্যারিমোহনকে আসামীভুক্ত করিয়া আদালতে হাজীর করা হইল। মোকর্দ্দমার দিন দুই দিন পরে ধার্য্য হইল।

মোকর্দ্দমার তদ্বিরাদিতে কৃষ্ণলালের দুই দিন যে কিরূপে কাটিল তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। আজ কৃষ্ণলালের বাড়ীর চুরির মোকর্দ্দমা। একটী ফৌজদারী পড়িলে উকীল মোক্তারদিগের উদর পূরণ করিতেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। কিশোরীমোহন যদিও আজ কাল একজন বিখ্যাত উকীল হইয়াছেন বটে কিন্তু তিনি ফৌজদারীর

উকীল নন সুতরাং এ মোকর্দ্দমায় তিনি খুড়ার কিছুই সাহায্য করিতে পারিলেন না। পূর্ব্ব মোকর্দ্দমায় কৃষ্ণলালের যথেষ্ট ব্যয় হইয়া গিয়াছে আবার দ্বিতীয় বার মোকর্দ্দমা। সাক্ষী, উকীল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে তাঁহার অনেক টাকা ব্যয় হইল।

বেলা দেখিতে দেখিতে ১০টা বাজিল। কৃষ্ণলাল সাক্ষী-সহ আদালতে হাজীর হইলেন। ফৌজদারী মোকদ্দমা হইলেই পুলিসের গৌরব কিছু বৃদ্ধি হয়। পুলিসের প্রণামীও তাঁহাকে কিছু দিতে হইল নতুবা পুলিস তাহার হইয়া সাফাই সাক্ষী দিবে কেন? বেলা ১টার সময় মোকর্দ্দমা উঠিল। ফরিয়াদীর সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেল। পুলিস ফরিয়াদীর পক্ষে সাফাই সাক্ষী দিল। বিদ্যাভূষণের বাড়ী হইতে বাক্স বাহির হইয়াছে বলিয়া তাহার এক সপ্তাহ ও প্যারিমোহনের চুরি অপরাধের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর কারাবাসের হুকুম দিয়া বিচারপতি সে দিনের মত আদালতের কার্য্য বন্ধ করিলেন। ফরিয়াদীও মানে মানে তাঁহার গহনা ও টাকাকড়ি বুঝিয়া পাইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে আদালত হইতে বাহির হইলেন।

এক দুই করিয়া ক্রমে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এক সপ্তাহ পরে বিদ্যাভূষণ কারাবাস হইতে মুক্তি পাইয়া বাড়ী আসিল। বিদ্যাভূষণের ক্রোধ কৃষ্ণলালের উপর এবার আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। বিদ্যাভূষণ জানিত যে সে যে জমিতে থাকিত তাহার সমুদয় অংশ ও তাহার পার্শ্বের

অপরার্দ্ধ সমুদয়ই কৃষ্ণলালের ছোট ভাই মতিলালের নামে খরিদ করা। মতিলালের স্ত্রী এখন বাপের বাড়ীতে আছে তাহাও সে শুনিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাপের বাড়ী যে কোথায় তাহা সে জানিত না। এক দিন বিদ্যাভূষণ হরলাল মুখুয্যের বাড়ী বসিয়া আছে কথায় কথায় মতিলালের স্ত্রীর কথা উঠিল। কৃষ্ণলালের সহিত মুখ দেখাদেখি বন্ধ হওয়া অবধি বিদ্যাভূষণ হরলাল মুখুয্যের বাড়ীতেই সর্ব্বদা যাতায়াত করিত ও বসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিত। ক্রমে বিদ্যাভূষণ মুখুয্যে বাড়ী হইতেই ছোট বউএর বাপের বাড়ীর ঠিকানার সন্ধান লইয়া ফেলিল। বিদ্যাভূষণ অবিলম্বে তাহার পরদিন সুগন্ধায় গিয়া ছোট বউকে বিস্তর বলিয়া কহিয়া তাহার ভাইএর সহিত একযোগ হইয়া অপরার্দ্ধ জমি নিজ নামে কবুলতি লিখিয়া আদালত হইতে রেজেষ্টারী করিয়া লইল। কবুলতি রেজেষ্টারী করিবার জন্য বিদ্যাভূষণ যে ছোট বউকে কল্যাণপুরে আনিয়াছিল আবার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তাহাকে আবার তাহার বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিল তাহা কৃষ্ণলাল তখন কিছুই জানিতে পারেন নাই কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছিলেন। জমির ন্যায্য দাম যাহা হইল তাহার অর্দ্ধেক তখন দিয়া বাকী পরে দিব বলিয়া বিদ্যাভূষণ স্বীকার হইল এবং কবুলতিতে যাহা লেখা আছে তাহাই দিলাম ও ছোটবউও তাহাই বুঝিয়া পাইলাম বলিয়া আদালতে কবুলতি সই হইয়া গেল। কিন্তু বাকী টাকা ছোট বউ বিদ্যাভূষণের নিকট হইতে আর পাইল না। বিদ্যাভূষণ আজ মেয়েমানুষ পাইয়া ছোট

বউকে খুব ঠকাইল। ছোট বউ কি তবে এত নির্ব্বোধ যে বিদ্যাভূষণ তাহাকে এরূপে ঠকাইল সে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না? সেটী নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ নয়। লোকে যখন যে বিষয়েই প্রতারিত হয় তখন যদি জানিতেই পারিবে তবে ঠকিবে কেন? কত কত বুদ্ধিমান লোক যখন কত জুয়াচোরের নিকট এইরূপে প্রতারিত হইয়া থাকে তখন ছোট বউ স্ত্রীলোক হইয়া যে বিদ্যাভূষণের নিকট ঠকিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ছোট বউ জমি বিক্রয় করিবার সময় ভাবিয়াছিল যে মেজঠাকুরের এ জমি থাকিয়া আমার কি লাভ হইবে? তিনি আমাদের পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন সুতরাং আমার জীবিকানির্ব্বাহ হয় না বলিয়া বিক্রয় করিলাম এই প্রমাণে নালিশ করিলেও কিছু হইবে না ভাবিয়া তাহার ভাইএর সহিত পরামর্শ করিয়া জমিটীর অর্দ্ধেক বিদ্যাভূষণের নিকট বিক্রয় করিল।

কৃষ্ণলাল শুনিলেন যে বিদ্যাভূষণ জমিটী সমস্তই ফাঁকি দিয়া সুগন্ধায় গিয়া ছোট বউএর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। তখন তিনি আদালতে নালিশ করিলেন। দেওয়ানী মোকর্দ্দমা গদাইনস্করী চালে চলিতে লাগিল। ক্রমশঃই মোকর্দ্দমার দিন পড়িতে লাগিল। কৃষ্ণলালও খরচান্ত হইতে লাগিলেন। কিশোরীমোহন এবারে তাহার খুড়ার হইয়া বিনা পয়সায় মোকর্দ্দমার অনেক তদ্বির করিয়াছিল। অবশেষে মোকর্দ্দমায় এই স্থির হইল যে জমি ছোট বউএর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত বিদ্যাভূষণের দখলেই থাকিবে। ছোট বউএর মৃত্যুর পর কৃষ্ণলাল পাইবেন

আর যদি ছোট বউএর মৃত্যুর পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ কোথাও উঠিয়া যায় কি মরিয়া যায় তবে ছোট বউএর মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি নালিশী জমির দখলিকার হইতে পারিবেন। বিদ্যাভূষণ তখন জমিতে প্রজা বসাইয়া জমির বিশেষ তদ্বির করিতে লাগিল। এইপ্রকারে বিদ্যাভূষণের সহিত কৃষ্ণলালের এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গেল। কিন্তু পরস্পরের সহিত যে বিদ্বেষভাব তাহা চিরকাল স্থায়ীভাবেই রহিল। তিনি বিদ্যাভূষণের যে উপকার করিয়াছিলেন তাহার সমুচিত প্রতিফল আজ হাতে হাতেই পাইলেন। বিদ্যাভূষণকে যে দয়া করিয়া তিনি তখন বাসস্থান দিয়াছিলেন তাঁহারই সেই উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ তিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া দরিদ্রতাই তাহার নিকট হইতে পুরস্কার পাইলেন। কৃষ্ণলাল উপর্য্যুপরি মোকর্দ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলেন। নগদ টাকা তিনি যাহা এ পর্য্যন্ত জমাইয়াছিলেন তাহার সমস্তই মোকর্দ্দমায় ব্যয় হইল, জমিটীও আপাততঃ হাত ছাড়া হইল। স্ত্রীর দুই এক খানা গহনাও বাঁধা পড়িল। তিনি এখন নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িলেন কেবল সম্পত্তির মধ্যে তাঁহার স্ত্রীর গহনা কয় খানি রহিল। সে সমুদয় তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকটেই রাখিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ ধাপ।

কালীঘাট।

বিদ্যাভূষণের সহিত মোকর্দ্দমার একপ্রকার মীমাংসা হইবার পর এক দিন বিরজা কৃষ্ণলালকে বলিল "দেখ মোকর্দ্দমা ত একপ্রকার চুকে গেল। ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় জিত্ হইল, দেওয়ানী মোকর্দ্দমায়ও মা কালী একরকম মুখ তুলে চাইলেন। তাই বল্‌ছিলাম কি যে একবার কালীঘাটে যাবার কি হবে? তোমার ব্যায়রামের সময়ও মা কালীর কাছে যোব আর পাঁটা পূজো দেবো ব'লে মেনে রেখিছি আর হাতে হাতে মোকর্দ্দমায়ও ত জিত্ হ'লো তাতেও মা কালীর কাছে অনেক পূজো আচ্ছা মানা আছে আবার এই একটা বিপদ আস্‌ছে। এমন ভয়ানক বিপদের সময় দেবতার শরণাগত হ'লে বিপদের অনেক শান্তি হ'তে পারে। এখানেও অনেকের কাছে শুন্‌তে পাই যে কালীঘাটে গিয়ে মা কালীর কাছে পূজো আচ্ছা দিয়ে তাঁর কাছে কেঁদে পড়্‌লে নাকি লোকের বিপদ আপদ কিছুই থাকে না। আমরাও চল না তাই করি; সে ত আর হাতী ঘোড়া কিছু নয়, কেবল শরীরের কষ্ট ক'রে গিয়ে কিছু পয়সা খরচ করা। আমি ত এই বুঝি যে পয়সা খরচ ক'ল্লে কিম্বা শরীরের কষ্ট ক'ল্লে যদি এত বড় একটা বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া যায় তবে তাই বা না করি কেন?"

কৃষ্ণলাল বিরজার কথা শুনিয়া বলিলেন "দেখ বিরজা যা বল্‌ছো তা সবই সত্য বটে, পয়সার জন্য কিম্বা শরীরের কোন কষ্ট করিবার জন্যও আমি ভাবি না কারণ পয়সা না থাকিলেও এসব কার্য্যে যে রূপেই হউক পয়সা মা কালীই জুটাইয়া দেন তবে কি জান আমি কখন সেখানে যাই নাই, শুনেছি অন্য স্থানের লোক সেখানে গেলে নাকি নানা প্রকারে যাত্রীদের নিকট হইতে পয়সা আদায় করে। শুনেছি কালীঘাট আজ কাল নাকি একটা জুয়াচুরির স্থান হইয়াছে, মাতাল আর বেশ্যারাই কেবল সেখানে গিয়া নাকি অত্যাচার করে। আমি আমার বয়সে কখন যেখানে যাই নাই সেখানে আমি একাকী কিরূপে যাইব ? যে সর্ব্বদাই সেখানে যায়, সেখানকার কায়দা কানুন সমুদয় যে জানে এরূপ একজন কাহাকেও সঙ্গে করিয়া না লইয়া গেলে ত সেস্থানে একাকী যাইতে আমার সাহস হয় না।"

বিরজা বলিল "আমাদের আর তাতে ভয় কি ? আমরা যাব আর মায়ের পূজো দিয়ে চলে আস্‌বো বৈত নয় আমাদের আর কে কি কর্‌বে? আর কালীঘাট মায়ের স্থান সেখানে কি এ সকল কিছু হ'তে পারে? তোমার ওসব শোনা কথা রেখে দেও।"

কৃষ্ণলাল কি করেন বিরজার আজ্ঞা, স্ত্রীর হুকুম পালন ক'ত্তেই হবে, সুতরাং বলিলেন "আচ্ছা, কালই যাওয়া যাবে ?"

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া মেজবউ, কেতকিনী, বিষয়া আর হরলাল মুখুয্যের

পরিবার ও বসন্তবেহারী ইহাদের সকলকে একত্র করিয়া দুই বাড়ীর তদারকের ভার হরলালের উপর দিয়া কৃষ্ণলাল কালীঘাট যাত্রা করিলেন। বেলা ১১টার সময় নৌকা মায়ের বাড়ীর ঘাটে গিয়া লাগিল। নৌকা হইতে সকলে নামিয়া মায়ের বাড়ীর ঘাটে স্নানাদি সমাপন করিয়া ক্রমেই মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে দিন শনিবার, অমাবস্যা, পৌষ মাস সুতরাং কালী বাড়ী সে দিন যাত্রীর ভিঁড় অত্যন্ত অধিক। মায়ের বাড়ীর ঘাটের ভিঁড় ঠেলিয়া যাইতে কৃষ্ণলাল প্রভৃতির গলদঘর্ম্ম হইল। শীতকালেও ভয়ানক গ্রীষ্ম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তত ভিঁড় ঠেলিয়াও, তত গলদঘর্ম্ম হইয়াও মন্দিরাভিমুখে যাইতেছেন আর দোধারি দোকানপসার ও উড়িয়া পাণ্ডাদিগের কোকিল কণ্ঠের স্বর শুনিতেছেন এমন সময় জন দুই লোক কোমরে চাদর বাঁধা বগলে ছাতি আসিয়া বলিল "আপনাদের কি কালী বাড়ী যাওয়া হবে? আমাদের দোকান আছে সেই-খানে বসিবেন, মায়ের পূজা আচ্ছা যা দিতে হয় সমস্তই সেই-খান থেকেই হবে আপনাদের কোন কষ্ট ক'র্ত্তে হবে না।"

ইহারা কে? ইহারা কালীঘাটের ডালার দোকানের দালাল। ছেলে ধরা বলিলেও হয়। দালালি করিয়া দোকানের খরিদ্দার জুটাইতে পারিলেই ইহাদের দুপয়সা লাভ আছে, সেই জন্য ইহারা ছেলে ধরার ন্যায় যাত্রী ধরিয়া বেড়ায়। কেবল কালীঘাট বলিয়া নয় যাত্রীর অন্বেষণে দু-পয়সা লাভের জন্য কলিকাতার সর্ব্বস্থানে গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্য্যন্তও ইহাদিগকে ছুটিয়া যাত্রী ধরিতে দেখা

গিয়াছে। পূর্ব্বে ছোট বেলায় যদি কেহ দৌরাত্ম্য করিত তবে মা তাহাকে ছেলে ধরার ভয় দেখাইত। ইহারাও সেই ছেলে ধরা জাতীয়। কৃষ্ণলালকে আজ কালীঘাটে ছেলে ধরায় ধরিয়াছে ছাড়ায় কাহার সাধ্য। কৃষ্ণলাল তাহার মিষ্ট কথা শুনিয়া মনে করিলেন যে তবে ত ভালই হয়েছে, এদের সঙ্গে গেলে ত আমাদের আর কোন কষ্ট ক'তে হবে না, এরাই পূজো আচ্ছা সবই দিয়ে দেবে বলছে। মা কালীই আমাদের এমন সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, এই মনে করিয়া কৃষ্ণলাল তাহাদের সেই স্তোকবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সকলকে লইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন। কালীঘাটে যে একবার আসিয়াছে সে ইহাদের স্তোক-বাক্যে দ্বিতীয়বার আর বিশ্বাস করে না। কৃষ্ণলাল নাকি কখন কালীঘাটে আসেন নাই সুতরাং তাহাদের ছলনায় ভুলিলেন বৈ কি? যাহাহউক কৃষ্ণলাল তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন, যাইতে যাইতে উভয় পার্শ্বে উড়িষ্যাবাসী পাণ্ডাদিগের চীৎকারে তাঁহাদের কর্ণে তালি লাগিতে লাগিল। কেহ বলিতেছে "মায়ি অমার দকানে বছো, মায়ি কঁউটী যিব?" কোথায় কেহ হাঁকিতেছে "মায়ি আসুন জবাফুলের মালা দি।" কেহ বলিতেছে "পয়সায় জোড়া রসগোল্লা, বড় সস্তা বড় সস্তা।" আবার রাস্তার ধারে দেখিলেন কাণা, অন্ধ, খঞ্জ ইহারা একটী পয়সার জন্য প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে "মা কাণাকে একটী পয়সা দিয়া যাও, বাবা এই খোঁড়াকে একটী পয়সা দিয়ে যাও আমার খেটে

খাবার শক্তি নাই।” বড় বড় ভুঁড়িওয়ালা বাবুরা বেশ্যা এবং মদে বিস্তর খরচ করিতে পারিতেছেন কিন্তু তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া একবার তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছেন না, মা তোমার কি অপার মহিমা! যাহাদের পয়সা আছে তাহাদের উপর কি তোমার এত দয়া আর যাহারা এক পয়সার জন্য রৌদ্রে পুড়িয়া হা হা করিতেছে তাহাদের দিনান্তেও এক মুষ্টি অন্ন জোটে কিনা সন্দেহ। এইরূপ কালীঘাটের অবস্থা দেখিতে দেখিতে তাঁহারা সকলে তাহাদের সহিত একটী দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দোকানটী ঠিক বড় রাস্তার উপরেই। দোকানে গিয়া সকলেই বিশ্রাম করিলেন। কৃষ্ণলাল যাহা শুনিয়াছিলেন চাক্ষুষ তাহার প্রমাণ ক্রমেই পাইতে লাগিলেন। দোকানের ভিতর গিয়া দেখিলেন অধিকাংশই মাতাল ও বেশ্যা কিন্তু সকলেরই গরদ, তসর কিম্বা চেলির কাপড় পরিধান। বাহ্যাড়ম্বর দেখিলেন বিলক্ষণ আছে কিন্তু ভিতরে সকলেই মদের পিপে খালি করিয়া বসিয়া আছে। কৃষ্ণলাল কিছুক্ষণ পরে চাহিয়া দেখেন যে যাহাদের সঙ্গে তাঁহারা দোকানে আসিয়াছিলেন তাহারা আর সেখানে নাই। তাহারা কোথায় গেল এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিলেন কিন্তু তিনি জানেন না যে যদি সমস্ত দিন কালীঘাটময় তাহাদের খুঁজিয়া বেড়ান তথাপি তাহাদের খুঁজিয়া পাইবেন না। কৃষ্ণলাল! তাহারা আবার তোমার মত শিকার ধরিতে বাহির হইয়াছে, তাহাদের কেবল একটী শিকার পাইলে ত আর সমস্ত দিন চলিবে না, তাহা-

দের হ'লো ঐ ব্যবসা। তাহাদের স্তোকবাক্যে বিশ্বাস করা তোমার বড়ই অন্যায় হইয়াছে। কৃষ্ণলাল দোকানের মাতাল ও বেশ্যা যাত্রীদিগকে দেখিতেছেন ও সঙ্গী দুই জনকে খুঁজিতেছেন এমন সময় এক জন ব্রাহ্মণ সর্ব্বগাত্রে চন্দনের ফোঁটা, গায়ে নামাবলী, এক গোছা পৈতা গলায়, পৈতাটী অতি পরিষ্কার, গলায় হরিনামের মালা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল "মহাশয় আপনাদের কি চাই বলুন; আমি সমুদয় আনিয়া আপনাদের মন্দিরের ভিতর লইয়া মায়ের দর্শন করাইয়া দিব আপনাদের আর কোন কষ্ট করিতে হইবে না।"

ইনি আবার কে? ইহাদের কালীঘাটের ডালাধরা বামুন বলে। যাত্রীদের ফাঁকি দিয়া লইতে, জুয়াচুরি করিতে যাত্রীদের ঠকাইতে ইহারা যেমন পারে কালীঘাটের মধ্যে তেমন আর কেহই পারে না। কালীঘাটের মধ্যে ইহারা ভক্ত বিটেল বলিয়া বিখ্যাত। কৃষ্ণলাল আজ ভক্ত বিটেলের হাতে পড়িয়াছেন আর তাঁহার পরিত্রাণ নাই। ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত শুদ্ধাচারী দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণও তাঁহাদের নিকট বাহ্যিক অমায়িক ভাব দেখাইল। ব্রাহ্মণের সেরূপ ভাবে কৃষ্ণলালের ব্রাহ্মণের উপর অবিশ্বাসের কোন কারণ হইল না সুতরাং অবিশ্বাসও করিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন "আমাদের দুইটা বড় বড় ছাগল চাই আর একটা মহিষ চাই। আর আর যা কিছু সে সমুদয় এই দোকান হইতেই লইব।" তাঁহার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল "মহিষ ত কালীঘাটে পাওয়া যায় না

অতএব তাহার দরুণ মূল্য ধরিয়া দিলেই চলিবে। আর আমার সঙ্গে আসুন ছাগল কিনিয়া লইয়া আপনাদের মন্দিরের ভিতর লইয়া গিয়া দর্শন করাইয়া দিব।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া ছাগলের দোকানে গেল। দুইটী অতি ক্ষুদ্র ছাগল আনিয়া বলিল "আজ বড় যাত্রীর ভিড় আজ ইহা অপেক্ষা বড় ছাগল পাওয়া যায় না।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন "দাম কত?"

ব্রাহ্মণ বলিল "আজ এ দুইটীর দাম আট টাকা!"

কৃষ্ণলাল কখন ছাগল ক্রয় করেন নাই সুতরাং তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া তাহার হাতে আটটী টাকা দিলেন কিন্তু তিনি যে ব্রাহ্মণের নিকট প্রতারিত হইলেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ যে ছাগল দুইটী আড়াই টাকায় কিনিয়া তাঁহার নিকট হইতে আট টাকা আদায় করিল তাহা তিনি কালীঘাটে যতক্ষণ থাকিবেন ততক্ষণ বুঝিতে পারিবেন না, কল্যাণপুরে গেলে যদি বুঝিতে পারেন। যাহাহউক পাঁটা দুটী লইয়া দোকান হইতে কিছু ডালা ও এক টাকার সন্দেশ কিনিয়া লইয়া ক্রমেই মায়ের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করলেন। ভিতরে গিয়া দেখিলেন কেহ "মা ব্রহ্মময়ী, মা দয়াময়ী মাগো" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে নাটমন্দিরে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, কেহ কেহ বা নাটমন্দিরে বসিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া হোম করিতেছে, কোথাও বা বাগদীরা ছাগল বিক্রয় করিতেছে, কোথাও বা বাগদীনীরা পাঁটার মাথা কুটিতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমেই কৃষ্ণলাল মন্দিরের ভিতর

প্রবেশ করিবেন বলিয়া যেমন দরজা পর্য্যন্ত গিয়াছেন অমনি একজন দরজায় পা দিয়া বলিল "পয়সা।" তিনি ভাবিলেন কি সর্ব্বনাশ, এত কষ্ট করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যদিও দরজা পর্য্যন্ত আসিলাম আবার এখানে আসিয়াও প্রতিবন্ধক? কি করেন অন্য দিকে গেলেন ; সে দিকেও ঐরূপ। সুতরাং পরিবার সঙ্গে করিয়া আর কত ঘুরিবেন প্রত্যেকে এক একটী পয়সা দিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া কালী দর্শন করিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে এখনও আছে। ব্রাহ্মণ তাহাদের যত্ন করিয়া কালী দর্শন করাইয়া দিল। সন্দেশ যাহা কিনিয়াছিলেন তাহাও সেখানকার পূজারী ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন। কিন্তু সেই এক টাকার সন্দেশের পরিবর্ত্তে প্রত্যেকেই কপালে এক একটী সিন্দুরের ফোঁটা ও একটু একটু করিয়া চরণামৃত প্রসাদস্বরূপ পাইয়া তাঁহাদিগকে মন্দির হইতে বাহিরে আসিতে হইল ; কিন্তু সেই সিন্দুর ও চরণামৃতের জন্য আবার তাহাদিগকে পয়সাও দিতে হইয়াছিল। শুনিলেন সন্দেশ সমুদয় সেখানকার পালাদারদের প্রাপ্য।

এইবার পাঁটা কাটার স্থানে গেলেন। পাঁটা কাটার স্থানে গিয়া শুনিলেন যে যাহাদের পালা তাঁহাদিগকে পাঁটা কাটার জন্য প্রত্যেক পাঁটায় পাঁচ আনা করিয়া দিতে হইবে ও যে কাটিবে সেই কামারকে এক পয়সা, সর্ব্বশুদ্ধ দুটী পাঁটা কাটাইতে গেলে সাড়ে দশ আনা দিতে হইবে তবে দুটী পাঁটা কাটা হইবে। আর মহিষের মূল্য স্বরূপ চল্লিশ টাকা

দিতে হইবে। কি করেন অগত্যা কৃষ্ণলাল তাহাই করিলেন। সমুদয় কার্য্য শেষ হইলে বাহিরে যাইবেন এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ বলিল "আমার দক্ষিণা ?" তিনি তাহাকে চারি আনা দিলেন। সে যাইতে না যাইতে অমনি আর একজন পাণ্ডা আসিয়া বলিল "আমার কৈ ?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন "আবার তোমার কিসের পয়সা ? ঐ যে পয়সা দিলাম।"

পাণ্ডা বলিল "ও ত পূজার দক্ষিণা। আর আমি যে সঙ্গে করিয়া দর্শন করাইয়া দিলাম তাহার দক্ষিণা কৈ ?"

কৃষ্ণলাল তাহাকেও চারি আনা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। কোথায় ছিল ফুলের মালাওয়ালারা তাহারা আসিয়া তাঁহাদিগকে চারিদিক হইতে ঘেরিয়া ফেলিল। কৃষ্ণলাল সকলকেই এক এক পয়সা দিয়া এক এক ছড়া ফুলের মালা লইয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

কালীঘাটে যদি কেহ দেখিতে পায় যে কোন যাত্রী আসিয়া বিস্তর পয়সা ব্যয় করিতেছে তবে সেখানকার কি মেয়ে কি পুরুষ সকলেই যাত্রীর নিকট হইতে পয়সা ভিক্ষা করে। যেমন দেখিয়াছে কৃষ্ণলাল অনেক পয়সা ব্যয় করিতেছেন অমনি ১০।১২ জন মেয়ে মানুষ, তাহাদের মধ্যে কাহারও বয়স ৮ বৎসর, কাহারও বয়স ১০ বৎসর আবার কাহারও বয়স ১৫ বৎসর, কাহারও বা বয়স ৩০।৩৫ বৎসর হইবে "বাবু একটী পয়সা, বাবু তোমার ছেলেপুলে সুখে থাক্, বাবু তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হ'ক, মা লক্ষ্মী তোমার শীঘ্র বেটা হ'ক" ইত্যাদি আশীর্ব্বাদজনক বাক্য

প্রয়োগ করিয়া কৃষ্ণলাল প্রভৃতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তিনি দেখিয়া একেবারে অবাক্। মনে করিলেন "কি আশ্চর্য্য কালীঘাটে কি মেয়ে পুরুষে উপার্জ্জন করে নাকি?" তিনি শুনিয়াছিলেন যে হালদারদের বাড়ীর মেয়েরাই এইরূপে পয়সা ভিক্ষা করে এখন প্রত্যক্ষেও তাহাই দেখিয়া মনে মনে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে ইহারাই হালদারদের বাড়ীর স্ত্রীলোক। যাহাহউক তিনি কিছু কিছু দিয়া তাঁহাদের বিদায় করিলেন।

পরে অনেক কষ্টে সকলে নৌকায় আসিয়া উঠিলেন। আসিবার সময় পথে শুনিলেন যে আজিকার ভিড়ে মায়ের বাড়ীর ভিতর একজন লোক একটী ছেলেকে অজ্ঞান করিয়া তাহার গায়ের সমস্ত গহনা কাড়িয়া লইয়াছে। আবার শুনিলেন যে কে একজন একটী গৃহস্থ যুবতী স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। এই সমুদয় শুনিয়া কৃষ্ণলাল কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া সেস্থান হইতে একেবারে নৌকায় আসিয়া উঠিলেন।

নৌকায় আসিয়া ভাবিলেন "কালীঘাট আর এখন তীর্থ স্থান নাই এখন অতি জঘন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নতুবা মায়ের সম্মুখে থাকিয়া কতলোকে জুয়াচুরি করিতেছে, কতলোকে কত ফাঁকি দিতেছে, কত গৃহস্থ স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিতেছে আর মা সম্মুখে থাকিয়া তাহা সমুদয়ই স্বচক্ষে দেখিতেছেন।"

নৌকা ছাড়িবার সময় মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া কৃষ্ণলাল একটী প্রণাম করিয়া বলিলেন "মা কালী, তুমি আমার

মাথায় থাক মা, কল্যাণপুরে থাকিয়া তোমায় ডাকিব তথাপি তোমার নিকটে আর আসিব না।"

কৃষ্ণলাল যাইতে যাইতে এইবার মেজবউকে বলিলেন "মেজবউ দেখ্‌লে আমি যা বলিছিলুম সব ঠিক হ'লো ত! স্বচক্ষে সবই ত দেখ্‌লে?"

মেজবউ তাঁহার কথা শুনিয়া হাঁ কি না কিছুই বলিল না। মায়ের বাড়ীর ঘাট হইতে নৌকা ছাড়িয়া নৌকাতেই আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার সময় সকলে কল্যাণপুরে আসিয়া পৌঁছিল। কল্যাণপুরে আসিয়া পাড়ার অনেকের নিকট গল্প করাতে সকলেই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে তিনি প্রতি হাতে কত ঠকিয়াছেন। কৃষ্ণলালও তখন বুঝিলেন যে তিনি কালীঘাটে বিস্তর ঠকিয়া আসিয়াছেন। যাহাহউক আর কখন কালীঘাটে যাইব না, যাহা হইয়াছে তাহার ত কোন উপায় নাই এই ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন।

চতুস্ত্রিংশ খাপ।

অপূর্ব্ব প্রতিদান।

কৃষ্ণলাল জমীদার সরকারের পাঁচ হাজার টাকা কোন মতেই মিটাইতে পারেন নাই। জমীদার শ্রীযুক্ত নবনারায়ণ চৌধুরী ভিতরে ভিতরে তাঁহার নামে এক মস্ত্রে এক গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করিয়াছে যে যদি কৃষ্ণলাল

পুলিস হস্তে পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারেন তবে তিনি নিস্কৃতি পাইবেন নতুবা পুলিসকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আদালতে তাঁহার ওজর আপত্তি দেখাইবেন। পুলিস সর্ব্বদাই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

কৃষ্ণলাল কালীঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া একদিন বাহিরে বসিয়া ভাবিতেছেন "আমি কি স্ত্রৈণ! কেতকিনী যাহা বলিয়াছে সমুদয়ই আমার হৃদয়ে আজিও স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে।' আমি যদি স্ত্রীর বশই না হইব তবে সে দিন স্ত্রীর পরামর্শে কালীঘাটে গিয়া আমার এই দরিদ্রতার সময়ও কেন অনর্থক কতকগুলি টাকা নষ্ট করিয়া আসিব? আবার ইহার উপর জমীদার সরকারের টাকা ভাঙ্গিয়াছি তাহার যে কখন কি হয় তাহাও বলিতে পারি না। মা! তোমার নিকট গিয়া তোমার নিকট অনেক কাঁদিয়া আসিলাম তাহার ফল কি কিছু পাইব না? জমীদার সরকারের এই বিপদ হইতে কি উদ্ধার হইতে পারিব না? মা! তুমি কি মুখ তুলিয়া আমার প্রতি চাহিয়া দেখিবে না?" এই সকল ভাবিতেছেন আর মনে করিতেছেন যে অনেক দিন ত হইল জমীদার সরকারের কোন খবরই নাই তবে বুঝি তাহারা আমাকে পদচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত হইল; মা কালী বুঝি আমায় দয়া করিলেন; কৃষ্ণলালের মনের এইরূপ অবস্থার সময় অকস্মাৎ পুলিস কনষ্টেবল আসিয়া চারিদিক হইতে তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। তিনি হঠাৎ পুলিস দেখিয়া প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরের সহিত অন্য অন্য জমীদার কর্ম্মচারীকে দেখিয়া তিনি সকলই

বুঝিতে পারিলেন। হরলাল মুখুয্যেও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিছুই না বুঝিতে পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন "কৃষ্ণলাল বাবু জমীদার সরকারের পাঁচ হাজার টাকা ভাঙ্গিয়াছেন। হিসাব নিকাসে কাগজ মিলাইতে পারেন নাই। কাগজ পত্র দৃষ্টে কৃষ্ণলাল বাবুই টাকা ভাঙ্গিয়াছেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেই অপরাধে তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়াণা বাহির হইয়াছে" বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর একখানি কাগজ কৃষ্ণলালের হাতে দিয়া বলিলেন যে যদি আপনি পাঁচ হাজার টাকা এখন কোনরূপে আমাদের নিকট কিম্বা জমীদারি সেরেস্তায় জমা দিতে পারেন তবে আমরা আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি নতুবা আমরা আদালতের হুকুম অনুসারে আপনাকে এখনি গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইব এক সেকেণ্ডও বিলম্ব করিতে পারিব না। কৃষ্ণলাল সেই মুহূর্ত্তে কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ মাথা হেট করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ইন্‌স্পেক্টর ততই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণলাল তখন অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন "আমি বাড়ীর মধ্যে দেখিয়া আসিতে পারি কি? যদি টাকা কাহারও নিকট হইতে যোগাড় করিতে পারি।"

তখন ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন "আচ্ছা শীঘ্র দেখিয়া আসুন; আমরা আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না।"

কৃষ্ণলাল বাড়ীর মধ্যে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "মেজবউ আমাকে ত এখন জেলে যাইতে হইতেছে। যদি তুমি অনুগ্রহ কর তবেই জেলের হাত হইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইতে পারি। তোমার নিকট যে গহনা আছে আর নগদ টাকা যা কিছু আছে সমুদয়ে পাঁচ হাজার টাকা যথেষ্ট হবে। আমি দায় বিদায়ের জন্যই সেগুলি তোমার নিকট রাখিয়া দিয়াছি। আমার খরচের হাত, আমার হাতে থাকিলেই খরচ হয়ে যায়। এত দরিদ্র অবস্থা হয়েছে, মোকর্দ্দমায় সবই খরচ হ'য়ে গেছে, এই সেদিন তোমারই পরামর্শে কালীঘাটে গিয়াও বিস্তর খরচ হইয়া গেল বটে কিন্তু তথাপি আমি সেগুলি হইতে এক পয়সাও খরচ করি নাই। কিন্তু এখন আমার এই বিপদের সময় সেগুলি না খরচ করিলে এমন সম্মুখ বিপদ হইতে কোন মতেই উদ্ধার হইতে পারিব না। অতএব তোমার গহনাগুলি দেও বিক্রয় করিয়া এখন জেলের হস্ত হইতে কোনরূপে রক্ষা পাই নতুবা আর কোন উপায় ত দেখি না। শীঘ্র দেও আর সময় নাই। ইন্‌স্পেক্টর বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। বিলম্ব হইলে আর উপায় থাকিবে না।"

মেজবউ কৃষ্ণলালের এইরূপ বিনয়গর্ভ বাক্য শুনিয়াও বিরক্তস্বরে বলিল "কেন, তোমায় হঠাৎ জেলে যেতে হবে কেন?"

কৃষ্ণলাল ব্যগ্রভাবে বলিলেন "কেন তাহা বলিবার সময় নাই। জমীদার সরকারের কাগজ হিসাব নিকাষে যে পাঁচ হাজার টাকায় তফাৎ ছিল সেই জন্য আমার গ্রেপ্তারী

পরওয়াণা বাহির হইয়াছে। শীঘ্র দেও আর সময় নাই।”
ক্রমেই বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর ডাকিলেন
“কৃষ্ণবাবু কৈ শীঘ্র আসুন, আর বিলম্ব কচ্ছেন কেন?
আমরা আর অপেক্ষা করিতে পারি না।”

তখন কৃষ্ণলাল কিছু বিরক্তস্বরে মেজবউকে বলিলেন
“দেবে কি না বল, আর মিছামিছি দেরি কচ্ছো কেন?
শুনতে পাচ্ছো ইন্‌স্পেক্টর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি কচ্ছেন?”

মেজবউ তখন আরও রাগিয়া বলিল “ডাকাডাকি কচ্ছে
তা আমার কি? আমায় ত আর ডাক্‌ছেনা যে আমার
বেশী তাড়া হবে? তোমায় ডাক্‌ছে তুমিই তাড়াতাড়ি
কর। জমীদারের টাকা ভেঙ্গে খেয়েছ, দোষ করেছ এখন
জেলে যেতে হবে ব'লে ভয় ক'ল্লে কি হবে? আর তার
জন্যে আমার গহনাই বা আমি দেব কেন? তবে নগদ
টাকা যা আছে তা সচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পার, তোমার
পরিশ্রমের ধন আমি রাখ্‌তে চাই না। আমার কাছে
ত আর পাঁচ হাজার টাকা মজুত রাখনি যে হাত
পাত্‌লিই অমনি আমি তোমায় দেব, আমি ত আর
ব্যাঙ্ক নই যে তোমার অগাধ টাকা আমার কাছে জমা
আছে, চাইলিই অমনি তখনি পাবে? তুমি ত জেলে যাবে
ব'লে এখন আমার গহনাগুলি বিক্রী ক'রে জেল থেকে
খালাস পাও, আর আমি তার পর খালি গায়ে গরিব দুঃখীর
মত ব'সে থাকি আর কি? বিবেচনাটা খুব যা হ'ক। গহনা
একবার গেলে কি আর হবে? তুমি জেলে গেলে বরং এক
বৎসরে হ'ক্‌ দু বৎসরে হ'ক্‌ কি পাঁচ বৎসরেই হ'ক

আবার খালাস হয়ে আস্‌বিই কিন্তু মনে কর দেখি আমার গহনা একবার গেলে কি আর হবে? এখন যে রকম সংসারের দশা, চাল আছে ত ডাল নেই, ডাল আছে ত তেল নেই. এখন এই অবস্থার সময় আমার গহনা গুলি একবার খোয়ালে কি আর হবে? আমার এখন বরং আরও দুখানা হলে হয়। মোকর্দ্দমার সময় আমার যে গহনা দুখানা বন্ধক দিয়েছ সেই দুখানা যাবার সময় আমার খালাস ক'রে দিয়ে তবে যেও যেন মনে থাকে। তুমি গেলে ত আর বোধ হয় এখন শীগ্‌গীর আস্‌ছো না, লাভে হ'তে আমার গহনা দুখানাই যাবে। সে দুখানা ত এক রকম জলাঞ্জলি দিয়েছ আবার চাইতে এয়েছ লজ্জা করে না?

পাঁচ হাজার টাকা জমীদারের ফাঁকি দিযেছ, আমার কি তার এক পয়সাও দিয়েছিলে? না সেই টাকায় আমার নুতন দুখানা গহনা গড়িয়ে দিয়েছিলে? তা যখন দেওনি তবে আমি এ সময় আমার গহনা দেব কেন? গহনা থাক্‌লে আমার নিজের অসময়ে অনেক উপকারে আস্‌বে, আমারও ত সময় আছে, অসময় আছে, দায় আছে বিদায় আছে, আপদ আছে বিপদ আছে, সে সময় আমি আর তোমার কাছে ভিক্ষে ক'ত্তে যেতে পার্‌বো না। তবু গহনা গুলি থাক্‌লে আমার অনেক ভরসা থাক্‌বে। গহনা গুলি খুইয়ে আমি কালীঘাটের কাঙ্গাল হয়ে ব'সে থাকি আর কি? জমীদারের টাকা ভেঙ্গেছ, তুমি যেখান থেকে পার টাকা এনে শোধ কর, না পার জেলে যাবে। দোষ করেছ শাস্তি

ভোগ করবে তার জন্যে ভাব্‌ছো কেন আর আমার কাছে এসেই বা ভিক্ষে কচ্ছো কেন? এ দোষের জন্য আমার গহনা আমি তোমায় দিতে পারি না, তাতে আমায় চাই ভাল বাস আর চাই নাই বাস। গহনায় তোমার অধিকার কি যে তাড়াতাড়ি নিতে এসেছ?"

কৃষ্ণলাল মেজ বউএর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্। কিছুক্ষণ আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া পরে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন "মেজবউ, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আর কেন দেও! এমন বিপদের সময় বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে কি তোমার মনে একটু কষ্ট হ'লো না? স্বামী ব'লে কি এমন অসময়েও তোমার দয়া হবে না? মুটে মজুর হ'লেও তাহার অসময়ে লোকে প্রাণ পর্যান্ত দিয়াও উপকার করে কিন্তু আমি তোমার স্বামী হয়ে তোমার নিকট অসময়ে মুটে মজুর অপেক্ষাও কি নীচ হইলাম? ছার গহনার জন্য কি তুমি আমার কেউ হ'লে না, বিপদের সময়েও আমার দিকে একবার তাকালে না, স্বামী ব'লে, অধম কৃষ্ণলাল ব'লে একবার মনে ক'ল্লে না? আমি জেলে যাব তুমি কি তাই দেখে সুখী হবে? গহনা কি আমিই তোমায় দিই নাই, তবে আবার বল্‌ছো যে আমার গহনায় অধিকার নাই? তোমার পায়ে পড়ি শীঘ্র দেও। মেজবউ, আমায় রক্ষা কর, তুমি না রক্ষা করলে আমি আর কার কাছে যাব, আর কার কাছেই বা গিয়ে কাঁদ্‌বো আমার তুমি ভিন্ন আর সংসারে কে আছে?"

কৃষ্ণলালের বিনয়গর্ভ বচনে মেজবউএর দয়া হওয়া দূরে থাক্ বরং আরও রাগিয়া বলিল “অধিকার থাকুক্ আর নাই থাকুক্, তুমি দিয়ে থাক আর নাই থাক, আমি না দিলে তুমি কি ক'ত্তে পার? আমি কখনই দিব না। তুমি জেলে যাও আমার তাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি তোমার স্ত্রী বই আর কিছুই নয়, যাও বলিলেই যাইব আর থাক বলিলেই থাকিব। এমন সম্বন্ধ যার সঙ্গে তার বিপদে আমার হাতের লক্ষ্মী ছেড়ে দিয়ে আমি পথে পথে কেঁদে বেড়াই আর কি? পিতা মাতা যে কি দেখে আমায় এমন লোকের হাতে দিয়েছিলেন তাও জানিনে। অবশেষে আমায় পথের কাঙ্গালিনী হ'তে হ'লো? আমার এত সাধের জীবনটা কি চিরকাল দুঃখে দুঃখেই কাট্‌লো?”

মেজবউএর কথা শুনিয়া কৃষ্ণলালের তখন হঠাৎ কেতকিনীর সেই অপূর্ব্ব উপদেশপূর্ণ কথাগুলি মনে পড়িতে লাগিল। তিনি আপনার মনেই তখন ভাবিতে লাগিলেন “কেতকিনী! তুমি এ জগতে দেবী কি মানবী তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। বাস্তবিকই তোমাকে আমার এখন দেবী বলিয়া জ্ঞান হইতেছে নতুবা তুমি যা বলিলে তাই কি হাতে হাতেই ফলিল। তুমি যদি দেবী না হবে তবে তুমি আমায় তেমন পবিত্র দুর্লভ উপদেশ কি করিয়া দিলে? প্রিয় ভগিনি, আমি তোমার উপদেশেই বুঝিয়াছিলাম যে স্ত্রী এ জগতে সংসারের শোভার দ্রব্য বৈ আর কিছুই নয়; কিন্তু তখন আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝি নাই। এখন স্বচক্ষে দেখিলাম তোমার সেই সকল অনির্ব্বচনীয়

অতুলনীয় বাক্য স্বর্গীয়, নতুবা যাহার কুহকে ভুলিয়া আমি আমার দেবতুল্য ভাইপোদের পৃথক্ করিয়া দিয়াছি, এ পর্য্যন্ত তাহাদের বিনা দোষে কত কষ্ট দিয়াছি, যার ছলনায় পড়িয়া তেমন সোণার সংসার ছাই ভস্ম করিয়াছি, সে আজ কিনা আমায় ইচ্ছা করিয়া জেলে পাঠাইতে একটুও কাতর হইল না। কেতকিনী, প্রিয় ভগিনি, তুমিই ধন্যা, তোমার নিঃস্বার্থ উপদেশই আমার যথার্থ শিক্ষা দিয়াছে। তুমি বিধবা বটে কিন্তু তুমি দেবতাদের নিকট আদরণীয়া, তুমি জগতে পূজ্যা। তুমি আমায় আজ সত্য সত্যই ধর্ম্মের পথ দেখাইয়াছ, সত্য সত্যই তুমি আমার মন পবিত্র করিয়াছ, সত্য সত্যই তুমি আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছ। আমি অজ্ঞান, মূর্খ, পাপী, আমার নরকেও স্থান হইবে না।"

ক্রমেই বিলম্ব দেখিয়া ইন্স্পেক্টর রাগিয়া বলিলেন "কৃষ্ণবাবু, আমরা আপনার জন্য আর অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইব না, বাটীর মধ্যে গিয়া আপনাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিব। আইনানুসারে আমাদের ততদূর ক্ষমতাও আছে।"

কৃষ্ণলাল কি করিবেন তখন অগত্যা বাহিরে আসিলেন। যাইবার সময় কেবল মেজবউকে শেষ এই কয়টী কথা বলিয়া গেলেন :—

"মেজবউ! ভালবাসার অপূর্ব্ব প্রতিদান আজ তোমার নিকট হইতে এই প্রথম শিখিলাম। তোমার এই স্বর্গীয় প্রতিদান আমার হৃদয়ে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা

থাকিবে। তুমি আজ স্ত্রী হইয়া বেশ্যার ন্যায় কার্য্য করিলে, মনুষ্য হইয়া পশুর ন্যায় ব্যবহার করিলে, ভদ্র হইয়া ইতরের অপেক্ষাও অসদভিপ্রায় প্রকাশ করিলে। আমাকে কেন, আজ তুমি সমস্ত জগৎকে শিক্ষা দিলে যে স্ত্রৈণ হইলে, স্ত্রীকে একমাত্র মস্তকের মণি করিলে, সংসারে স্ত্রীর কুহকজালে ভুলিলে তাহার অবস্থার শেষ অভিনয় এইরূপেই অভিনীত হইয়া থাকে। আমি ব'লে নয় আজ সকলে দেখুক্ সকলে শিখুক্ যে স্ত্রৈণ পুরুষদিগের ভালবাসার দক্ষিণান্ত এইরূপ চ'কের জলেই হইয়া থাকে।"

মেজবউকে এই কয়েকটী কথা বলিয়া কৃষ্ণলাল বাহিরে আসিলে পুলিস তাঁহার হাতে হাতকড়ি দিয়া থানায় লইয়া গেল। কৃষ্ণলাল আজ পুলিসহস্তে বন্দী হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ ধাপ।

কর্ত্তব্য সাধন।

কৃষ্ণলালকে বন্দীভাবে অধিক দিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। বন্দী হইবার ৪।৫ দিন পরে এক দিন পথে কৃষ্ণলালের দাসী বিবয়ার সহিত হেমের দেখা হইল। হেম তাহারই নিকট শুনিল যে তাহার খুড়া পাঁচ হাজার টাকার জন্য পুলিসহস্তে বন্দী হইয়াছেন। মেজ খুড়িমা পাঁচ হাজার টাকার জন্য তাঁহার গহনা ছাড়েন নাই তাহাও শুনিয়া হেম অত্যন্ত দুঃখিত হইল।

হেম তখন মনে করিল " কি আশ্চর্য্য ! আমরা জীবিত থাকিতে কাকা জেলে কষ্ট পাইবেন আর আমরা উপযুক্ত ভাইপো হইয়া কাকার কষ্ট স্বচক্ষে দেখিব।" এই ভাবিয়া হেম তাহার সৎপরামর্শ দাতা প্রাণের বন্ধু শ্যামের নিকট গিয়া শ্যামকে আদ্যোপান্ত সমুদয় বলিল।

সৎগুণের আধার শ্যাম, বন্ধুর এই কথা শুনিয়া বলিল " পাঁচ হাজার টাকার জন্য তোমার খুড়া জেলে থাকিবেন আর তোমরা তাঁহার উপযুক্ত ভাইপো হইয়া সম্মুখে থাকিয়া কাকার কষ্ট স্বচক্ষে দেখিবে তাহা ত কখনই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া আমার নিকট বোধ হয় না। তোমাদের যতক্ষণ এক পয়সার সঙ্গতি থাকিবে ততক্ষণ প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও তোমাদের কাকার কষ্ট নিবারণ করা তোমাদের সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য।"

শ্যামের এই কথা শুনিয়া হেম তাহার মাতার নিকট গিয়া সমুদয় বলিল। হেমের মাতা তাঁহার পুত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন " দেখ, তিনি তোমাদের যাহাই করুন, তাই বলিয়া তোমরা উপযুক্ত ভাইপো থাকিতে খুড়ার কষ্ট স্বচক্ষে দেখিবে এটা কি ভাল দেখায় ; ইহাতে তোমাদের অপমান বৈ আর কিছুই নয়। খুড়াকে টাকা দিয়া মুক্ত করিয়া আনিতে পারিলে তাহাতে তোমাদের অপমান হইবে না বরং জগতে সকলের নিকট পূজ্য হইতে পারিবে, সকলকে কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিবে।"

এই কথা বলিতে বলিতে হেমের মাতা মেজবউএর চরিত্রের বিষয় আগাগোড়া ভাবিয়া মেজবউএর উদ্দেশে বলিলেন "মেজবউ ! এখন একবার দেখ, যে রঘুদের কৃষ্ণ-

লাল তোমারই জন্য, তোমারই সুখের জন্য পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন, তাহারা বাস্তবিক মহামূল্য রত্ন। তুমি যাহা ভাবিয়া তাহাদিগকে ফেলিয়া দিয়াছিলে তাহারা তাহা নয়। তাহাদের মন তোমার ন্যায় কুটিল নয়। কত জন্ম জন্মিলে, কত তপস্যা করিলে যে তোমার মন এতদূর উন্নত হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। যদি ধর্ম্মের জীবন্ত প্রতি-মূর্ত্তি দেখিতে চাও তবে এখনও একবার আসিয়া দেখ কৃষ্ণলালের তুমি আপনার কি তাহার ভাইপোরা আপনার। তুমি তাহার স্ত্রী নও, তুমি তাহার পক্ষে সাক্ষাৎ কৃতান্ত-স্বরূপ, তুমি তাহার সংসারক্ষেত্রের পঙ্গপাল স্বরূপ। তুমি তাহার সর্ব্বনাশ করিতে এই সংসারক্ষেত্রে আসিয়া পড়ি-য়াছ নতুবা স্ত্রী হয়ে স্বামীকে সচ্ছন্দে পুলিসহস্তে দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্তা থাকিতে পারিলে ? তুমি হয়ে তাহা পারিলে কিন্তু তাহার ভাইপোরা, যাহাদিগকে তুমি পর ভাবিয়া তাড়াইয়া দিলে তাহারা আজ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কৈ ? খুড়ার বিপদের কথা শুনিয়া তাহাদের প্রাণ তুষের আগুনের ন্যায় দগ্ধ হইতেছে কেন ? তাহাদের প্রাণের ভিতর যেন কেমন কি করিতেছে কেন ? তাহাদের চক্ষের জলে আজ হৃদয় ভাসিতেছে কেন ? তাহাদের কাকার বিপদ তাহাদের শেলসম বিঁধিতেছে কেন ? তাহারা পৃথিবী শূন্যময়, জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছে কেন ? তাহাদের খুড়ার কষ্ট তাহাদের নিকট এত অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে কেন ?"

যাহাহউক হেম শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান লইয়া শুনিল যে সপ্তাহ পরে মোকর্দ্দমা

হইবে, সুতরাং এই সময়ের মধ্যে পুলিসের হস্তে টাকা দিয়া খুড়াকে খালাস করিয়া আনিবে অবশেষে তাহাই স্থির করিল। টাকা সংগ্রহ করিতে আরও তিন চারি দিন গেল। নিজের নিকট যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, বাকী যাহা অকুলান পড়িল তাহা শ্যামের নিকট হইতেই সংগ্রহ করা হইল। বন্দীভাবে আট নয় দিন থাকিবার পর হেম ও শ্যাম এবং কিশোরী তিন জনে পুলিসে গিয়া পুলিসের ইন্‌স্পেক্টরের নিকট পাঁচ হাজার টাকা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে রসিদ লইয়া খুড়াকে মুক্ত করিয়া আনিল।

ঈশ্বর হেমকে তাহার কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ দেখিয়াই যেন অল্প আয়াসেই তাহার খুড়ার মুক্তিলাভের পথ দেখাইয়া দিলেন। কৃষ্ণলাল বাড়ী আসিয়া তখন আর তাঁহার স্ত্রীকে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু কৃষ্ণলাল মেজবউকে সেই দিন হইতে শক্রর ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন, তাহার পরামর্শে এখন আর কোন কাজই করেন না। মেজবউও তাহার ভাসুরপোরা টাকা দিয়া তাহার স্বামীকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছে শুনিয়া মরমে মরিয়া রহিল। কেতকিনীকে আগাগোড়া সমুদয় কার্য্যের নায়িকা জানিয়া মেজবউ তাহারও সর্ব্বনাশের পথ সেই দিন হইতে পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্তা হইল। কেতকিনী তাহার ভাইপোদের সৎকার্য্যের বিষয় ভাবিয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাদের উদ্দেশে নানা প্রকারের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিল আর কৃষ্ণলাল কেতকিনীর সেই অপূর্ব্ব স্বর্গীয়ভাব মনে মনে চিন্তা করিয়াই দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ ধাপ।

বিজয়া দশমী।

পুলিশ হইতে মুক্ত হইবার পর দুঃখে ও চিন্তায় কৃষ্ণলালের চারি দিন কাটিল। চারি দিন পরে এক দিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণলাল বসিয়া ভাবিতেছেন এমন সময় মেজবউ আসিল। কৃষ্ণলাল মেজবউকে দেখিতে পাইয়াও যেন দেখিতে পান নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া নিজের মনেই কত কি ভাবিতে লাগিলেন। মেজবউ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া অবশেষে সাহসে ভর করিয়া তাহার স্বামীকে বলিল "দেখ, কেতকিনীর আমার সংসারে থাকা হবে না। সে আমার খেয়ে আমারই সর্ব্বনাশ করিয়া বেড়ায় আমার সংসারে থেকে হেমের সংসারের দিকেই অধিক টানে। এটা কি ভাল? সে থাকিলে আমি এখানে থাকিব না।"

কৃষ্ণলালের স্নেহ মেজবউএর প্রতি পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে এইরূপ মনে করিয়াই মেজবউ আজ কেতকিনীকে স্থানান্তরে পাঠাইবার জন্য তাহার স্বামীর নিকট পরামর্শ আঁটিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণলাল যে আর এখন সে কৃষ্ণলাল নাই, কেতকিনীর মহামন্ত্র যে তাঁহার গুরুমন্ত্রের কার্য্য করিয়াছে তাহা মেজবউ আজিও জানিতে পারে নাই।

মেজবউ কৃষ্ণলালকে ঐকথা বলিবামাত্রই মেজবউএর অনুকূলে বলা দূরে থাক্ বরং স্বভাবের অতিরিক্ত রাগিয়া দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কৃষ্ণলাল বলিলেন "কেতকিনী

থাকিলে তুমি না থাকিতে পার তোমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার আমার তাহাতে কোন দুঃখ বা কষ্ট নাই। কেতকিনী সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপা, ধর্ম্মের আদর্শ রূপিণী, সতীর উপমা স্থানীয়া, সে তোর অসন্তোষের বস্তু কখনই হইতে পারে না। তুই পাপীয়সী, তুই রাক্ষসী, তুই সংসার নাশিনী তাই তুই তাহার চরিত্রে পর্য্যন্ত দোষারোপ করিতে সাহস করিতেছিস্, তুই তাহার নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র দেহকে অকারণে কলুষিত করিতে উদ্যতা হইয়াছিস্, তুই তাহার অনুচ্ছিষ্ট আত্মাকে উচ্ছিষ্ট করিতে অগ্রসর হইতেছিস্। তুই তাহার গুণ জানিস্ না তুই তাহার অন্তর জানিস্ না, তুই তাহাকে আজিও ভাল রূপে চিনিতে পারিস্ নাই। তোর ন্যায় কপটী, তোর ন্যায় নৃশংসহৃদয়া, তোর ন্যায় পতিঘাতিনী তাহাকে চিনিতে, তাহার গুণ জানিতে, তাহার চরিত্রের ভিতর প্রবেশ করিতে এ জনমে কখন পার্‌বি না, কত জন্মে যে পার্‌বি তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাহার নির্দ্দোষ, নিরহঙ্কারী, নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে আঘাত করিলে তোর নরকেও স্থান হইবে না।

আমার সোণার চাঁদ তিন ভাইপো, তুইই তাদের পৃথক করেছিস্ তুইই তাদের পথের ভিখারী করেছিস্? তোরই জন্যে তারা আমার এতদূর অসন্তোষের পাত্র হইয়াছে। তুইই আমার তেমন পুণ্যের সংসার পাপে পরিপূর্ণ করিয়াছিস্, অন্যায়রূপে ছারেখারে দিয়াছিস্। তোরই জন্যে আমার কুললক্ষ্মী চিরকালের জন্য বিদায় লইয়াছে। আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর, একান্তই স্ত্রৈণ তাই তোর ন্যায় কুহকী স্ত্রীকে

প্রাণের অধিক ভাল বাসিয়াছি, হৃদয়ের একমাত্র দেবী জ্ঞানে পূজা করিয়াছি; অমৃতে গরল আছে তখন আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। স্ত্রীলোকের মুখে অমৃত আর অন্তর যে তাহার চতুর্গুণ গরলের আধার তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিয়াও বুঝি নাই। তোরা না করিতে পারিস্ এমন কার্য্য এ নশ্বর জগতে নাই। তোদের কুহকে যাহারা ভোলে, তোদের স্নেহ-পিঞ্জরে যাহারা আবদ্ধ হয়, তোদের আপন বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদের ইহকাল পরকাল সকলই নষ্ট হয়, তাহারা ধর্ম্মে পতিত হয়, তাহাদের ইহজন্মের সুখের আশা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহাদের দুঃখে শৃগাল কুকুরও কাঁদে না। তোর ন্যায় স্ত্রীলোকদের অপরের স্নেহ, অপরের অনুরাগ, অপরের প্রণয়স্থানীয় হইতে চেষ্টা করা কেবল বেণা বনে মুক্তা ফেলার ন্যায় হয়, অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রে বীজ রোপণের ন্যায় সকলই বিফল হয়। তোরা তোদের নিজের চক্ষের কড়িকাঠ না দেখিয়া অপরের কুটা বাছিতে চেষ্টা করিস্, তোরা তোদের নিজের অন্তর জানিস্ না কিন্তু অন্যের হৃদয়ে ডুবুরি নামাইতে চাস্।

তোরা সংসারের মাকাল ফল স্বরূপ, সংসারের শোভা বর্দ্ধন করিবার জনাই ঈশ্বর তোদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তোদের দ্বারা সংসারের কোন উপকার হয় না, বরং তোদের হ'তেই সংসার ছিন্নভিন্ন হয়। মেজবউ, তুই নিশ্চয় জানিস্ যে কেতকিনী আর তুই অনেক অন্তর। স্বর্গ আর নরক, পুণ্য আর পাপ, ঘৃণা আর দয়া, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, সমুদ্র ও খাল এ সমুদায়ে যত অন্তর কেতকিনীতে

আর তোতে তাহা অপেক্ষাও অধিক অন্তর। তোকে আর অধিক কি বলিব তোর গহনাগুলি লইয়া তোর যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিস্। প্রাতঃকালে উঠিয়া তোর ন্যায় স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করিলে দেহে পাপের সঞ্চার হয়। তুই আমার হৃদয়ে পাপ সঞ্চারিণী মন্ত্রস্বরূপ। তুইই ত আমার দুঃখের পথ পরিষ্কার ক'রেছিস্, আমার সুখের পথে কন্টক রোপণ ক'রেছিস্, নতুবা মহামূল্য রত্নের ন্যায় তিন ভাইপো যার তার এ সংসারে দুঃখ কি? আমি জানিয়াছি স্ত্রী বিপদের বন্ধু নয় কিন্তু সম্পদের শত্রু, স্ত্রীলোকেই সংসার নাশের একমাত্র মূলীভূত কারণ। আমি তোর নিকট হইতেই সংসারের সুখ, দুঃখ, আপদ, বিপদ, মঙ্গল, অমঙ্গল সকলই দেখিয়াছি, সকলই শিখিয়াছি, সকলই জানিয়াছি, তখন না ভাবিয়া যাহা করিয়াছি তাহার জন্য এখন আর অনুতাপ করিলে ফল কি? যাহাহউক আমায় আর অধিক বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট হইয়াছে।"

কৃষ্ণলাল যখন মেজবউকে এই সকল কথা বলেন তখন তিনি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন সুতরাং কি বলিতে কি বলিয়াছেন তাহার কিছুই বিবেচনা করেন নাই। অভি-মানিনী মেজবউ কৃষ্ণলালের নিকট হইতে সেইরূপ অনভ্যস্ত তিরস্কার পাইয়া কিছুই উত্তর না করিয়া হেট মুখে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। কৃষ্ণলালের তিরস্কার স্বামীসোহাগ-প্রাপ্তা মেজবউএর হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিল। মেজবউ কি করিবে তখন তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে অভিমানে, দুঃখে, মনের কষ্টে আত্মহত্যাই স্থির-

সঙ্কল্প করিল। মেজবউ আজ আত্মহত্যার অনুগামিনী হইল।

কেতকিনীর নিকট যে কৃষ্ণলাল সর্ব্বদা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন তাহা মেজবউ কোন সূত্রে জানিতে পারিয়াছিল এবং কৃষ্ণলাল ও কেতকিনী সম্বন্ধে ক্রমেই একটী কুপ্রবৃত্তি হৃদয়ে স্থান দিতে লাগিল। মেজবউ কেতকিনীর চরিত্র কৃষ্ণলালের সহিত দূষিত বলিয়া স্থির করিল এবং প্রায়ই নানাপ্রকার ছলে কেতকিনীকে স্থানান্তরিত করিতে কৃষ্ণ-লালকে পীড়াপীড়ি করিত, কিন্তু কৃষ্ণলাল তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। ক্রমেই সন্দিগ্ধ-হৃদয়া মেজবউ স্বামীর তদ্বিষয়ে প্রতিকূলতা দেখিয়া বিষ প্রয়োগের দ্বারা কেতকিনীর প্রাণ নাশের সঙ্কল্প করিয়াছিল। বিষ সংগ্রহ করিয়া সুবিধার প্রতীক্ষায় এতদিন বসিয়াছিল। আজ স্বামীকে একবার শেষ অনুরোধ করিয়া তাহার কার্য্যসিদ্ধি করিবে ভাবিয়াছিল; কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে আশাতীত ফল লাভ করিয়া অভিমানিনী পতিসোহাগিনী মেজবউ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া স্বামীর তিরস্কারকে তুচ্ছ করিবার জন্য, অনুতপ্ত হৃদয়কে জুড়াইবার জন্য, অন্তরের অসহ্য যন্ত্রণা, মনের দুর্নিবার বেদনাকে নিবারণ করিবার জন্য, কেতকিনীর প্রাণ-নাশের ঔষধ নিজেই সেবন করিল। মেজবউ আজ মনের দুঃখে বেলা তিনটার সময় বিষপানে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা, সমুদয় মনের বেদনা তাহার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গেল, কেবল তাহার অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিল।

কৃষ্ণলাল বেলা চারিটার সময় বাড়ী আসিয়া শুনিলেন যে মেজবউ বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তিনি প্রথমে আসিয়া দেখিলেন তখন দেহে প্রাণ নাই, সর্ব্বাঙ্গ অবশ ও শীতল। মেজবউএর দেহ হইতে প্রাণ জনমের মত অবসর লইয়াছে। কৃষ্ণলাল আজ তাঁহার এত সাধের স্বর্ণপ্রতিমা চিরকালের মত জলে বিসর্জ্জন দিলেন। আজ তাঁহার বিজয়া দশমী হইল। ডাক্তার আসিয়া দেহ পরীক্ষা করিলেন। সন্ধ্যার সময় মেজবউএর দেহ সৎকার হইয়া গেল। মেজ-বউ এ জগত হইতে জনমের মত বিদায় লইল। তাহার সংসারের খেলা এতদিনে ফুরাইল, তাহার সংসার নাট্য-শালার এইখানেই যবনিকা পতন হইল। মেজবউ আজ চুপি চুপি কৃষ্ণলালকে ফাঁকি দিয়া পলাইল, কৃষ্ণলালের সংসারপিঞ্জর হইতে তাঁহার প্রাণপাখী পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া জনমের মত উড়িয়া গেল কৃষ্ণলাল আর তাহাকে ধরিতে পারিলেন না।

সপ্তত্রিংশ খাপ।

দুটো এক ঠাঁই।

মেজবউএর মৃত্যুর পর কৃষ্ণলালের সংসার ছিন্নভিন্ন হইল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় যেথানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সংসারের দিকে তাঁহার আর সেরূপ টান ছিল না। তিনি যে কখন্ কোথায় থাকিতেন তাহার কিছুই

ঠিক্ ছিল না। কখন হরলাল মুখুয্যের বাড়ী, কখন বা পাড়ার অন্য কাহারও বাড়ী, কখন বা রাস্তায় কখন বা ঘাটে, কখন বা বনে, কখন বা মাঠে, আবার কখন বা নিজের বাড়ী এই রূপে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বাড়ীতে তাঁহার আর একদণ্ডও মন টেঁকিত না, সংসারের প্রতিও তাঁহার এখন আর তেমন আয়িত্তি যত্ন ছিল না। মেজবউ তাঁহারই উপর রাগ করিয়া তাঁহাকে জন্মের মত ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে এই চিন্তাই তাঁহার প্রণয়াসক্ত হৃদয়কে সময়ে সময়ে বড়ই কষ্ট দিত। তিনি কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণলালের এইরূপ অবস্থার সময় গৃহলক্ষ্মী দরিদ্রতার উপর রাজ্যভার দিয়া কিছু দিনের জন্য কৃষ্ণলালের যথেচ্ছাচারী সংসাররাজত্ব হইতে অবসর লইলেন। বাড়ী ঘরের অবস্থাও কৃষ্ণলালের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ হইল। তাঁহার বহির্বাটী ইষ্টকনির্ম্মিত কিন্তু অনেক স্থলে ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। সদর দরজার দুই ধারে যে দুইটী বৈঠকখানা ছিল তাহা এখন মনুষ্যের আবাস-যোগ্য বলিয়া বোধ হইত না; ইন্দুর মূষিক প্রভৃতি জীব জন্তুগণ এখন দিবারাত্র তথায় নির্ব্বিবাদে বিহার করিত। চারিধারে যে চক্‌মিলান ছিল তাহার সমস্ত খিলানই প্রায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, সম্মুখেই পূজার দালান। এখন এই দালানে চড়ুই ও পায়রার লীলাভূমি হইয়াছে। দেয়ালে অশ্বত্থ, বট্ প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। উঠান জঙ্গালে পরিপূর্ণ, এখন বাঁড়ুয্যে বাড়ীর যে দিকে চাও সেই দিকেই যেন মূর্ত্তিমান্ দরিদ্রতা বিরাজমান।

কেতকিনীই এখন কৃষ্ণলালের সংসার চালাইত আর বিষয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম করিত। জমীদার সরকারের চাক্রীও জবাব হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহার সংসার অতি কষ্টে স্বষ্টে চলে কেতকিনী তাহার মেজদার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণলালের শোকের চিহ্ন ক্রমেই বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইল। কৃষ্ণলাল ক্রমেই মেজবউএর কথা ভুলিতে লাগিলেন।

মেজবউএর মৃত্যুর পর এইভাবে আরও এক মাস কাটিল। এক মাস পরে একদিন কৃষ্ণলাল কেতকিনীকে বলিলেন "দেখ কেতকিনী, মেজবউ ত ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, আমারও চাক্রী বাক্রীর দশা এই হ'লো, পয়সা কড়ি ত কিছুই দেখি না, সংসার চলে কিসে, আর সংসার চালায়ই বা কে? তুমি একলা মেয়েমানুষ সুতরাং তুমিই বা কি করবে, সংসারেও ত এক দিনের জন্য মঙ্গল দেখ্তে পাই না; আজ এ বিপদ, কাল সে বিপদ, রোগ ত সংসারে লেগেই আছে, লক্ষ্মী সংসার থেকে এক প্রকার বিদায় নিয়েছেন দেখ্তে পাচ্ছি। সম্পত্তির মধ্যে যা কখানা গহনা মেজবউএর ছিল তাই আছে; পেটের জন্য সে কখানাও খোয়াতে নিজের একটু ক্ষমতা থাক্তে ত ইচ্ছা হয় না। কিন্তু নিজের ক্ষমতা আর কত কাল থাকিবে? বয়স ক্রমেই বাড়্ছে বৈ ত আর কম্ছে না? তাই আমি বলছিলুম কি যে হেমেদের এইখানে আনি। সংসারটাও দেখ্তে শ্মশানের মত হয়েছে, জন প্রাণীও নাই, তবু তারা এলে সংসারটা

অন্ধকাল দেখাবে। তারা বাড়ী থেকে গিয়ে অবধিই আমার সংসারের দশা এই প্রকার হয়েছে। তারা আমার ঘরের লক্ষ্মী ছিল। কেবল স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে পড়ে তখন ঘরের লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেলেছি। তুমিও বাস্তবিক সংসারের পক্ষে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা, তুমিই আমার ধর্ম্মের পথ প্রদর্শিকা, তোমার কথাতেই আমার চক্ষু ফুটিয়াছে। যাহাহউক তুমিই তাদের ব'লে ক'য়ে এইখানে নিয়ে এস। আমি তাদের প্রতি অনেক অত্যাচার করেছি, আমি তাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি আমি তাদের কোন্ মুখে আবার এখানে আস্‌তে বল্‌বো। আমিই তাদের পথের ভিখারী করেছি, আমি তাদের কাকা হয়ে তাদের উপর এ পর্য্যন্ত অনেক শত্রুতা সাধন করেছি।"

কৃষ্ণলাল এখন নানাপ্রকারে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, মেজ-বউও তাঁহার মায়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এই সকল কারণে তিনি তাঁহার ভাইপোদের উপর এতদূর স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন, কি কেতকিনীর কথায় বাস্তবিক তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কেতকিনী তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তথাপি কেতকিনী তাহার মনের স্বাভাবিক সরলভাব কিছুই গোপন না করিয়া বলিল "দাদা, তুমি তাদের যেরূপ মনে ভাব তারা সেরূপ নয়। তুমি তাদের বিষাক্ত সর্প মনে করিয়া এখন তাদের নিকটে যাইতে সাহস করিতেছ না বটে কিন্তু তুমি জান না যে তারা বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া হইয়াছে। তুমি আজিও জানিতে পার নাই যে তোমাকে হারাইয়া তাহারা এখনও কিরূপ ঢোঁড়ার ন্যায় নম্রভাবে আছে। তুমি তাহাদের বিষবৃক্ষ মনে করিয়া তাহাদের আশ্রয়ে

যাইতে ভয় পাইতেছ বটে কিন্তু তাহারা তা নয়। তাহারা বাস্তবিক চন্দনতরু, তাহাদের ছায়া অতি শীতল, অতি সুগন্ধ। তাহাদের আশ্রয়ে গেলে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। তুমি কি এখনও বুঝিতে পার নাই যে তারা কি, তারা কাকে চায়, তারা কার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। তাদের ঐশ্বরিক ক্ষমতায় তারা জানিয়াছে যে তুমিই তাদের একমাত্র রক্ষক, তুমিই তাদের আজীবন অভিভাবক, তুমিই তাদের সর্ব্বস্ব? তুমি তাদের অনিষ্টের জন্য অনেক চেষ্টা পাইয়াছ বটে কিন্তু তাহাতে তাদের কি কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিতে পার বরং তোমারই পদে পদে অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তুমি তাদের যতই অনিষ্ট কর তবু তারা জানে যে তুমি তাদের কাকা, তুমি তাদের পিতার ভাই নতুবা সম্প্রতি তোমার উদ্ধারের জন্য ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইবে কেন? না খাওয়া, না দাওয়া কেবল তোমাকে জেল হইতে মুক্ত করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইয়াছে; তথাপি কি তুমি বুঝিতে পার নাই যে তুমি তাদের যে কাকা সেই কাকাই আছ, তাদের নিকট তোমার মানের কিছুই লাঘব হয় নাই, তোমার প্রতি তাদের স্নেহ, ভক্তি এক কণামাত্রও নষ্ট হয় নাই। তুমি তাদের অনিষ্ট করিবার জন্য অনেক উপায় অনুসন্ধান করিয়াছ বটে কিন্তু তারা কি কখন তোমার কোন প্রকারে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছে? ইহাতেই বোধ হইতেছে যে তুমি তাদের মন জান না, তুমি তাদের চরিত্র জান না, তুমি তাদের স্নেহ মমতা কিছুই জান না; কেবল এতদিন মেজবউএর কুহক জালে

পড়িয়া সংসারচক্রে ঘুরিয়াছ বলিয়া এখন তুমি বল্‌ছো যে আমি তাদের কিরূপে আস্‌তে বল্‌বো। কেন তুমি কি তাদের কাকা নও, তুমি কি তাদের তোমার সহোদর অথচ বড় ভাইয়ের সন্তান বলিয়া ভাব না, তুমি কি তাদের উপর আজিও কোন ক্ষমতা চালাইতে পার না? পার সবই, জান সবই, ভাব সবই, কিন্তু এ সংসারের মানুষ তুমি ছিলে না বলিয়া কিছুই জানিতে না, কিছুই করিতে না, ইচ্ছা করিয়া তাদের সম্বন্ধে কিছুই ভাবিতে না।

লোকের অসময়ে সকলকেই আত্মীয় বলিয়া মনে হয়, তোমার এখন সে দিন গিয়াছে, তুমি এখন ঠেকিয়া শিখিয়াছ বলিয়া বুঝি তাদের প্রতি এত মায়া জানাইতেছ? তাহা না হইলে তুমি তাদের একবার মুখে বলিলে যখন তারা দৌড়িয়া আসিতে পথ পাইবে না, একবার ডাকিলে যখন ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিবে না তৎক্ষণাৎ তুমি ডাকিয়াছ বলিয়া যেখানে যে অবস্থায় থাকিবে আসিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, যখন বলপূর্ব্বক তুমি তাদের এখানে আনিতে পার তখন তাদের উদ্দেশে এত লজ্জিত হইতেছ কেন?

কৃষ্ণলাল কেতকিনীর উপদেশপূর্ণ বাক্য শুনিয়া আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ নীরবে সেই স্থানে হেটমুখে বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে হেমকে ডাকিবার জন্য বিষয়াকে পাঠাইয়া দিলেন। হেম আসিলে কৃষ্ণলাল নিজেই তাহাকে সমুদয় খুলিয়া বলিলেন। হেম কাকার প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। হেম মাতার

নিকট আসিয়া সমুদয় বলিল, শ্যামের সৎপরামর্শ লইল এবং হরলাল মুখুয্যে প্রভৃতি অন্য অন্য সকলের নিকট হইতে যথাযোগ্য পরামর্শ লইল। কেতকিনীর নিকটও সৎ-পরামর্শ লইতে ত্রুটি করিল না। সকলেরই নিকট পরামর্শ লইয়া, সকলেরই মতের পার্থক্য না দেখিয়া হেম কাকার নিকট আসিয়া সমুদয়ই বিবৃত করিল। কৃষ্ণলাল তখন যত্ন করিয়া নিজে সঙ্গে করিয়া সকলকেই নিজ বাড়ীতে আনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। আবার দুই সংসার এক হইল। পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেইরূপই আবার হইল। কেবল ছোট-বউ বাপের বাড়ীতেই রহিল। তাহার মাতার মৃত্যুতে সংসারে কেহ ছিল না বলিয়া সে আর কল্যাণপুরে আসিতে পারিল না। বাঁড়ুয্যে সংসার এখন কেবল মেজবউ ও ছোট-বউ আর সখের চাকর জনার্দ্দন বিহীন হইয়া দুটো আবার এক ঠাঁই হইল। শ্যাম যে বাড়ীটী হেমকে থাকিবার জন্য তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিল সে বাড়ীটী হেমের অধিকারেই রহিল। হেম সে বাড়ীটী আপাততঃ খালি রাখিয়াই আসিয়াছিল।

অষ্টত্রিংশ ধাপ।

আর অধিক বিলম্ব নাই।

পাঠক মহাশয়! আপনি পাছে বিরক্ত হন সেই ভয়ে আপনার নিকট বিনীতভাবে বলিতেছি যে আমাদের আর

অধিক বিলম্ব নাই। যদি বিরক্ত না হন, যদি আরও পড়িবার আপনার ইচ্ছা থাকে, বিশেষ আগ্রহসহকারে আপনি এই উপন্যাস পড়িতে চাহিলেও তথাপি আমরা বলিতেছি যে আমাদের আর অধিক বিলম্ব নাই। আপনি হয় ত মনে করিতে পারেন যে এই খানেই উপন্যাসের শেষ হইল না কেন, দুই সংসার একত্র করিয়া উপন্যাসের শেষ করিলেই ত ভাল হইত। কিন্তু আমরা কি করিব? আমাদের ত ইচ্ছা যে যত শীঘ্র শেষ করিতে পারি ততই ভাল। তাহা পারি কৈ? আমাদের এ উপন্যাস যদি কাল্পনিক হইত, যদি আমরা আমাদের মনগড়া যাহা ইচ্ছা একটা করিতাম তবে এখানে কেন আরও পূর্ব্বে শেষ করিতে পারিতাম; কিন্তু আমরা সত্যের খাতিরে পড়িয়া, সত্য ঘটনার দিকে চাহিয়া একটী সংসারে যখন যাহা ঘটিয়াছে সেই সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া উপন্যাসাকারে পাঠক মহাশয়কে জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যদি তাহাতে আপনি আমাদের কোন বিষয়ে দোষী করেন তবে সে দোষ কাজে কাজেই আমাদিগকে ঘাড় পাতিয়া লইতে হইবে। যাহা হউক সেই সত্যের খাতিরে পড়িয়াই আমরা এখন বলিতেছি যে আমাদের আর অধিক বিলম্ব নাই

দুই সংসার একত্র করিয়া আজ কৃষ্ণলালের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, বাঁড়ুয্যে সংসার আজ সুখে ও স্বচ্ছন্দতায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। না হবেই বা কেন? "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ এ কথা কখনই মিথ্যা হইবার নয়। এই শ্লোকের অনুগামী হইয়া, এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়া, এই মহামন্ত্রকে

হৃদয়ে ধারণ করিয়া কার্য্য করিতে পারে এই পৃথিবীতে কেরূপ লোক কয়জন আছে? যে পারে সে ঋষিতুল্য, সে মানব হইয়াও দেবসদৃশ, সে পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গসুখ উপভোগ করে। এই অসার জগতে নশ্বর মানবদেহ ধারণ করিয়া জীবমাত্রই যদি এই অমূল্য, স্বর্গীয় মহাবাক্যকে সার ভাবিয়া তাহার অনুগামী হইত, একদিনের জন্যও যদি "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" এ কথা মনে করিয়া কার্য্য করিত তবে ভঙ্গপ্রবণ মানবদেহে এত দুঃখ, এত কষ্ট নারিকেল ফলাম্বুবৎ প্রবেশ করিবে কেন? আমরা আর কাহাকেও চাই না, আর কাহারও কথা বলিব না, আর কাহারও চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিবার আমাদের বিশেষ প্রয়োজনও নাই, আমরা কেবল একমাত্র কৃষ্ণলালের চরিত্রে তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ পাইয়াছি। যাহা পাইয়াছি পাঠক মহাশয়কে দেখাইয়াছি। বাকীটুকু দেখাইব বলিয়াই বলিলাম আমাদের আর অধিক বিলম্ব নাই।

কল্যাণপুরে বাঁড়ুয্যে সংসারে আর এখন সুখের সীমা রহিল না। কুচক্রী মেজবউএর মৃত্যুর পর দুই সংসার একত্র হইলে স্বয়ং লক্ষ্মী যেন ক্ষেম প্রভৃতির পথ প্রদর্শিকা হইয়া সর্ব্বাগ্রে বাঁড়ুয্যে সংসারে প্রবেশ করিলেন। এখন তাঁহার সংসারে আর কোন বিষয়ের অনাটন রহিল না। বিপদ, আপদ, রোগ, পীড়া, দুঃখ, কষ্ট একেবারেই তাঁহার সংসার হইতে বিদায় লইল; কৃষ্ণলাল আর এখন দরিদ্রতার দারুণ মুখব্যাদান চক্ষে দেখিতে পাইতেন না। কৃষ্ণলাল এতদিনে আবার সুখের মুখ দেখিলেন। আজ উপযুক্ত

তিন ভাইপো তাঁহার আজ্ঞাবহ, সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপা ছোট ভগ্নী কেতকিনী তাঁহার সংসারের উন্নতিসাধিকা, গৃহলক্ষ্মী বড় বউ তাঁহার সংসারের গৃহিণী, হেম নিকটবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট আফিসে ৮০৲ টাকা বেতনে চাক্‌রী করিতেছে, কিশোরী একজন বিখ্যাত উকীল হইয়াছে আর ললিত আজিও স্কুলে পড়িতেছে। বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া কৃষ্ণলাল ঘরে বসিয়াই থাকিতেন। যে যার উপার্জ্জনের টাকা তাহার মাতার নিকট আনিয়া দিত, বড় বউ বুঝিয়া সংসার চালাইতেন। যে দিন দুই সংসার একত্র হইল সেই দিন হইতে কিন্তু বাঁড়ুযো সংসারে আর কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। বাড়ীতে স্বর্ণময়ী ও বিষয়া এই দুই জন চাক্‌রাণীই রহিল। চাকরও এক জন রাখা হইয়াছিল। কৃষ্ণলাল সকলের অভিভাবক হইলেন।

এত সুখেও কিন্তু কৃষ্ণলাল আন্তরিক সুখী ছিলেন না। মেজবউএর মৃত্যু হইতে সময়ে সময়ে তাঁহার মন প্রায়ই অন্য দিকে থাকিত। যখন মেজবউএর কথা মনে হইত তখন তিনি কিছুতেই সুখ পাইতেন না। কাহারও সহিত কথা কহিতে গেলে মাঝে মাঝে প্রায়ই অন্যমনস্ক হইতেন। এক স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ ভিন্ন স্ত্রৈণ পুরুষের মনে কোন মতেই শান্তি লাভ হয় না। কৃষ্ণলালও মনের এই-রূপ অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধ বয়স হইলেও আবার বিবাহ করি-বেন ইচ্ছা করিলেন। ক্রমে সকলেই জানিল যে কৃষ্ণলাল বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করিবেন। সকলে নিষেধ করিলেও তিনি বলিতেন যে আমার কন্যাটী মারা গিয়া পর্য্যন্ত আর সন্তানাদি ত কিছুই হইল না অতএব আবার বিবাহ না

করিলে কিরূপে চলিবে? কেতকিনীও শুনিয়া প্রথমে নিষেধ করিল বটে কিন্তু দাদার অবস্থা দেখিয়া পাছে দাদা উন্মত্ত হইয়া উঠেন এই ভয়ে কৃষ্ণলালের মতেই মত দিতে বাধ্য হইল। অবশেষে স্ত্রৈণ কৃষ্ণলাল বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করিলেন। আমাদের আবার একটী নূতন মেজবউ হইল। নূতন মেজবউএর প্রকৃতি কিরূপ হইল? মৃত মেজবউএর প্রকৃতির ন্যায়ই কি হইয়াছিল? আমরা তাহা এ ক্ষেত্রে বলিতে পারিলাম না। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন সংসারের সকলেই নূতন মেজবউকে পাইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল। পরে কিরূপ প্রকৃতি পাইবে তাহা আমরা এখন কিরূপে বলিব? সুতরাং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আমরা আমাদের বর্ত্তমান ঘটনা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের এ উপন্যাস কাল্পনিক নহে সেই জন্য আমরা যত দূর দেখিলাম সত্যের অনুরোধে আমাদের নূতন মেজবউকে ততদূর আমরা ভাল বৈ মন্দ বলিতে পারিলাম না।

যাহাহউক কৃষ্ণলালের এখন দরিদ্রতা ঘুচিয়া গিয়া সময় খুব ভাল হইল। ভাইপোদের উপর তাঁহার স্নেহ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধনীয় হইল। কেতকিনীর উপর ভক্তি ও স্নেহ অধিকতর বৃদ্ধি হইল। বড় বউ তাঁহার নিকট বিশেষ মান্যের পাত্রী হইলেন। কৃষ্ণলাল পূর্ব্বের ন্যায় কেতকিনীর নিকট বসিয়া প্রায়ই গল্প করিতেন।

এক দিন কৃষ্ণলাল কেতকিনীর নিকট বসিয়া আছেন আর সংসারের সুখ দুঃখের বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে-

ছেন, এমন সময় হঠাৎ কেতকিনী বলিল "দাদা, দেখ সংসারে ত সকল সুখই দেখিলাম, তোমার ভাইপোদের একত্র করিয়া সকল সুখই হইল বটে কিন্তু এখনও একটী দেখিতে বাকী আছে।"

কৃষ্ণলাল তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রভাবে বলিলেন "কি সুখ বাকী রহিল কেতকিনী ?"

তখন কেতকিনী বলিল "কুমারী আর ললিতের বিবাহ। কুমারীর বয়সও অনেক হয়েছে সুতরাং আর ত রাখা যায় না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দশ বৎসরের মেয়ে হ'ল, আর এখন ত বিবাহ না দিলেই নয়। আর ললিতেরও বয়স বড় কম হয় নি। তুমিও ত বুড়ো হয়েছ কবে ম'রে যাবে, আর আমিও কবে ম'রে যাব তা ত বলতে পারি না অতএব তাদের বিবাহটা দেখেও যদি ম'ত্তে পারি তবুও আমাদের অনেক সুখ।"

কৃষ্ণলাল এই কথা শুনিয়া সেই দিন হইতে তাহাদের বিবাহের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে হরলাল মুখুয্যের পুত্র বসন্তবেহারীর সহিত হেমের কন্যা কুমারীর এবং ললিতের সহিত শ্যামের এগার বৎসরের ভগ্নী কুণ্ডলিনীর বিবাহ স্থির হইয়া গেল। ১৪ই ফাল্গুণ শুক্রবার দুই বিবাহই একেবারে হইবে অবশেষে ইহাই স্থির হইয়া গেল।

উনচত্বারিংশ ধাপ

এই শেষ।

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। আর পনর দিন পরে বিবাহ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বাঁড়ুযো সংসারের বাড়ী ঘর বেমেরামতে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়াছিল, সুতরাং এখন বিবাহ উপলক্ষে মেরামতের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কৃষ্ণলাল এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন সুতরাং হেম, কিশোরী ইহারাই বাড়ী মেরামতের ভার লইল। ইট, চূণ, সুরকি আনিয়া ফেলা হইল। রাজমিস্ত্রী আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে দশ দিন কাটিয়া গেল। বাড়ী মেরামতের কার্য্যও শেষ হইয়া আসিল। হেম, কিশোরী একালের যুবা পুরুষ সুতরাং তাহাদের মনোনীত করিয়া বাঁড়ুযো বাড়ীর অবয়ব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করা হইল। বাড়ী চকমিলান ছিল তাহাকে নূতনের ন্যায় করা হইল। পূর্ব্বে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি ছিল না; এখন একটী নূতন সিঁড়ি করা হইল। তাহাতে ৩৯টী ধাপ হইল। তাহার প্রথম ধাপের প্রস্তরের উপরে হীরকের অক্ষরে লেখা হইল;—

"বসন্ত।"

শেষ ধাপে অর্থাৎ প্রথম হইতে ৩৮টী ধাপ অতিক্রম করিয়া উনচত্বারিংশ ধাপে ঐরূপ প্রস্তরের উপর হীরকের অক্ষরে লেখা হইল;—

"কুমারী।"

১৯টী ধাপ পার হইয়া ছাদে উঠিবার দরজায় প্রস্তরের যুগল প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইল। সেই যুগল প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তির উপরিভাগে লেখা হইল ;—

"বসন্ত-কুমারী।"

হরলাল মুখুয্যের বাড়ী হইতে কৃষ্ণলালের বাড়ী পর্য্যন্ত মধ্যস্থানের গাছপালা কাটিয়া ছাদ গাঁথিয়া জোড়াবাড়ী করা হইল। সেই ছাদের যে দিক হরলাল মুখুয্যের বাড়ীর দিকে পড়িল সেই দিকে বসন্ত-কুমারীর যুগল প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত হইল এবং বড় বড় অক্ষরে লেখা হইল ;—

"বসন্ত-কুমারী।"

আর ছাদের যে দিক কৃষ্ণলালের বাড়ীর দিকে পড়িল সেই দিকে কাকা ও খুড়ীর যুগল প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত হইল ও বড় বড় অক্ষরে লেখা হইল ;—

"বিরজা-কৃষ্ণ।"

বাড়ীর ফটকের উপরিভাগে নানারঙ্গে রঞ্জিত করিয়া লেখা হইল ;—

"মডেল কাকা।"

বা

"বসন্ত-কুমারী।"

ফটকের লেখা অনেক উচ্চে বলিয়া কৃষ্ণলাল বৃদ্ধাবস্থাবশতঃ দেখিতে পাইতেন না ও পড়িতেও পারিতেন না।

বাঁড়ুয্যে বাড়ীর ছাদে উঠিবার প্রথম ও ঊনচত্বারিংশ ধাপ বাদে অন্য অন্য ধাপে প্রায়ই বসন্ত ও কুমারী এবং ললিত ও কুণ্ডলিনীর নাম প্রস্তরের উপর খোদিত হইয়াছিল।

শ্যাম ললিতের উপহারের জন্য যে অঙ্গুরী গড়াইলেন তাহাতে খোদিত হইল ;—

"মডেল কাকা।"

হেম বসন্তের জন্য যে অঙ্গুরী গড়াইলেন তাহাতে খোদিত হইল ;—

"বসন্ত-কুমারী।"

এইরূপে বাঁড়ুয্যে বাড়ীর অবয়ব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। আজ ১৪ই ফাল্গুণ শুক্রবার। আজ কল্যাণপুরের বাঁড়য্যে বাড়ী উৎসবে পরিপূর্ণ। গরিব, দুঃখী, ভিক্ষুকগণ বাঁড়ুয্যে, মুখুয্যে, চাড়ুয্যে পরিবারকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, বাবুদিগের জয় গাইতে গাইতে, গৃহস্থদের ধনে পুত্রে পূর্ণ করিতে করিতে কল্যাণপুরের রাস্তা দিয়া আনন্দধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিয়া চলিয়াছে, চারিদিকেই আনন্দ। চারি দিকে সকলেই নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত। কল্যাণপুরের তিন বাড়ীতেই আজ বিবাহ। আজ আনন্দের আর সীমা নাই। আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে খেলিতে বসন্ত-কুমারী এবং ললিত-কুণ্ডলিনীর শুভবিবাহ শেষ হইয়া গেল। কৃষ্ণলাল নূতন বধূ, নূতন জামাতা পাইয়া, নূতন কুটুম্বিনী লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাভূষণের এক পুত্রের মৃত্যু এবং নানা প্রকার অমঙ্গলে সংসার ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে বিদ্যাভূষণ তাহার ক্রীত জমি ...মের নিকট বিক্রয় করিয়া সপরিবারে কাশীধামে গিয়া বাস করিল। কৃষ্ণলালের অর্দ্ধ জমি আদালতের হুকুম অনুসারে কৃষ্ণলালের অধিকারেই হইল; সুতরাং মতি-লালের নামে ক্রীত জমি পুনরায় বাঁড়ুয্যেদের সম্পূর্ণ অধি-কারে আসিল। কল্যাণপুরে বাঁড়ুয্যে বাড়ী সম্পূর্ণ নূতনত্ব প্রাপ্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ছোট বউ তাহার মার মৃত্যু হওয়াতে বাপের বাড়ীতেই রহিল আর আসিল না।

পাড়ায় সকলেই কৃষ্ণলালকে "মড়েল কাকা" বৈ অন্য কিছু বলিয়া ডাকিত না। তাহার সেই নামানুযায়ী তাহার যাবতীয় বস্তুকে মড়েল কাকার বস্তুই বলা হইত। তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতেন কি অসন্তুষ্ট হইতেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরাও সুতরাং অন্য কিছু না বলিয়া কেবল "মড়েল কাকা" এই নাম দিয়া বাঁড়ুয্যে বাড়ীর শেষ ধাপে অথবা উনচত্বারিংশ ধাপে উঠিলাম।